

সীতা ।

২/১২৭

মহর্ষি বান্দীকি-প্রণীত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের চরিত্র-সমালোচনা

সমেত, জগৎপূজ্যা সীতাদেবীর অলৌ-

কিক জীবনের ধারাবাহিক বিবরণ,

চরিত্র সমালোচন ও

মাহাত্ম্য-কীর্তন ।



“ধুরি হিতা তং পতিদেবতানাম্” ।

রঘুবংশ ।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস, এম্ এ প্রণীত ।

কলিকাতা ।

১২২৭

কাশ্মিন ।

CP. 229
Acc 22083
02/2/03

PRINTED BY K. C. DATTA, AT THE BRAHMO MISSION PRESS,

211, CORNWALLIS STREET.

ভূমিকা ।



“সীতা” প্রচারিত হইল। কোথায় বাস্তবিক-প্রতিভা, কোথায় অলৌকিক সীতাচরিত্র, আর কোথায় মদ্বিধ ক্ষুদ্র ব্যক্তি ! আমার এই হৃঃসাহস কোনমতেই মার্জনীয় নহে ; কিন্তু সীতাচরিত্রের প্রাণমুগ্ধকর মাহাত্ম্যই আমার এই হৃঃসাহসের একমাত্র কারণ।

সীতাচরিত্রের সৌন্দর্য্য যে কিছুমাত্রও পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা মনে হয় না ; তবে যত্ন ও চেষ্টার কিছু ক্রটি করি নাই। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে কবিকুলগুরু বাস্তবিকরই পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি ; ইহাই আমার একমাত্র সাহস ! “সীতা” পাঠ করিয়া কেহ যদি প্রীত হন, তবে তাহা বাস্তবিকর গুণে, আর কেহ যদি অপ্রীত হন, তবে তাহা গ্রন্থকারের দোষে। ফলতঃ, জগৎপূজ্যা সীতাদেবী যে এই গ্রন্থ-নিবদ্ধ সীতা অপেক্ষাও মহীয়সী, ইহাই স্মরণ রাখিতে আমি সকলকে প্রার্থনা করি।

যে রূপ রাম ব্যতীত রামায়ণ অসম্ভব, সেইরূপ রাম ব্যতীত সীতাও অসম্ভব ; সুতরাং “সীতা” লিখিতে লিখিতে আমাকে প্রায় সমগ্র রামায়ণখানি সংক্ষেপে বর্ণিত করিতে হইয়াছে। আজকাল যে শ্রেণীর পাঠকপাঠিকা ছুর্ভাগ্যক্রমে নানাকারণে রামায়ণ পাঠ করেন না, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা তাঁহাদের কিঞ্চিৎ উপকার হইবে এইরূপ আশা করা যায়। আর যাহারা নিয়তই রামায়ণ পাঠ করেন, বা পবিত্র রামকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের ত ইহাতে অরুচি না হইবারই কথা।

আশা করি, এই উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার রাজত্বকালে, পতিব্রততার অগ্রগণ্যা সীতাদেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্যকীর্তনকে কেহ অসাময়িক প্রসঙ্গ বা অসংলগ্ন প্রলাপ বলিবেন

না। জ্ঞানশিক্ষা ও লোকশিক্ষা প্রয়োজন কি না, সে বিচারের দিন বহুকাল গত হইয়াছে; কাহারও ইচ্ছা থাক বা নাই থাক, জ্ঞানশিক্ষা এদেশে প্রায় সর্বশ্রেণীর মধ্যেই প্রবেশ লাভ করিতেছে। সকলে যাহাতে প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হন, এক্ষণে তাহারই চেষ্টা করা বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। “সীতা” জ্ঞানশিক্ষা ও লোকশিক্ষার সহায় হইবে কি না, তাহা সাধারণে বিচার করিবেন। এক্ষণে, আমরা যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি সর্ব সমক্ষে উপস্থিত করিলাম, সে উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণেও সফল হইলে, সকল শ্রম মার্থক মনে করিব।

এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই গ্রন্থপ্রণয়নে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃত বাল্মীকি-রামায়ণের বঙ্গানুবাদ হইতে স্থলে স্থলে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। যে সকল শ্রদ্ধেয় বন্ধু এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। বহু চেষ্টা করিয়াও গ্রন্থ খানিকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য করিতে সমর্থ হই নাই; সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ সে দোষ মার্জনা করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

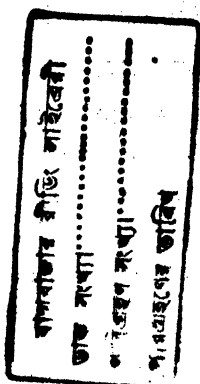
কলিকাতা।

১লা ফাল্গুন, ১২৯৭।

}

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।

বাল্মীকির রামায়ণ হইতে যে স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার শেষে ত্র্যাকেটের মধ্যে প্রথম সংখ্যা কাণ্ডবাচক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা সর্গবাচক।



সীতা । ^৭/_{১২৭}

প্রথম অধ্যায় ।

(পূর্বকালে মিথিলা নামে এক বৃহৎ জনপদ ছিল। বর্তমান সময়ে, বিহারের উত্তর-পূর্ব কোণে এবং গঙ্গার উত্তর দিকে জিহত নামে যে প্রদেশ দোঁখতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন তাহাই অতিশয় প্রাচীনকালে মিথিলা নামে অভিহিত হইত। বাম্বীকির রামায়ণে মিথিলার অবস্থানসম্বন্ধে যে প্রমাণাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উক্ত অনুমানকে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। বাহা হউক, পুরাকালে এই মিথিলা দেশে এক সুবিখ্যাত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন; মহাযশা নিম্নে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আদি রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মিথি, এবং মিথির পুত্র জনক। ইহঁদেরই নামানুসারে মিথিলার রাজগণ বংশপরম্পরা জনকশব্দে আহুত হইতেন।)

অযোধ্যাপতি মহাত্মা দশরথ যে সময়ে প্রাহুভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে যে মহাভাগ মিথিলার রাজসিংহাসনে সমারুঢ় ছিলেন, তিনিই জনক নামে জগতে সুপরিচিত আছেন। এই মহীপাল ক্রিতে স্ত্রিয় ও পরমধার্মিক ছিলেন; তিনি নিরন্ত ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া যে সমস্ত অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত ঋষিসমাজ তাঁহাকে রাজর্ষি-উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, ধর্মরাজ্যে তাঁহার এমনই প্রতিপত্তি ছিল যে, তিনি স্বয়ং কনিষ্ঠ এবং রাজা হইলেও

ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ তিনি সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুদ্বারা নিরন্তর পরিবেষ্টিত থাকিয়াও একদিকে তৎসমুদারে যেমন একেবারে স্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন, তেমনই অপরদিকে প্রজাপালন ও রাজকার্য্য-পরিদর্শনেও কিছুমাত্র পরাভুত ছিলেন না। এইজন্য জগতে তাঁহার মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক গুণে আকৃষ্ট হইয়াই নানাদিগেশ হইতে ব্রহ্মপরায়ণ ঋষি ও সাধু মহাত্মাগণ সর্বদা তদীয় রাজসভায় লমাগত হইতেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া পরম প্রীতিলভ করিতেন।

যে জগৎ-পূজ্য অসামান্য নারীর জীবন চরিত লিখিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই নারীকুলভূষণ সীতাদেবীই এই মহাহতভব রাজর্ষি জনকের দুহিতা ছিলেন। (সীতার জন্মসম্বন্ধে রামায়ণে যে প্রসঙ্গটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার জন্ম একটি অলৌকিক ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ কথিত আছে যে, একদিন রাজর্ষি হলদ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলেন, এমন সময়ে লাজলপঙ্কতি হইতে একটি কন্যা উদ্ভূত হইল। নবদুর্বাদলমধ্যে গুল্ল পুষ্পরাশি যেমন পড়িয়া থাকে, সেইরূপ সেই সদ্যকর্ষিত মৃত্তিকার উপর রাজর্ষি রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন স্নলক্ষণা সেই কন্যাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোড়ে উত্তোলন পূর্বক গৃহে প্রভ্যাগমন করিলেন এবং সঙ্গেহে আপনার আশ্রমভার ভার তাহার লালনপালন করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রশোধন কালে কন্যা হলমুখ হইতে উদ্ভূত হইরাছিল বলিয়া জনক তাহার নাম “সীতা” রাখিলেন।

এইরূপে রাজর্ষির স্নেহ ও কাৰুণ্যে প্রতিপালিত হইয়া সীতা শিশুকলার ভার দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সীতা জনককে আপনার পিতা ও তৎপত্নীকে আপনার জননী বলিয়াই

জানিতেন ; তাঁহারাও তাঁহাকে আপনাদের কল্পা অপেক্ষা সমধিক
স্নেহ করিতেন । সুন্দর মেঘজাল ভেদ করিয়া যেমন শুভ্র শশাঙ্ক-
জ্যোতি প্রকাশিত হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে
সীতার সুকুমার দেহেও দিব্য রূপলাবণ্য প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল ।
সীতা বাল্যসুলভ ভীকৃত্য ও চপলতাবশতঃ কখনও চঞ্চল মৃগশিঙুর
জ্ঞায় প্রতীতমান হইতেন ; কখনও বা স্নিগ্ধোজ্জল অচঞ্চল সৌন্দর্য্য-
রাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্যোতির্ময়ী দেবকন্ডার জ্ঞায় লক্ষিত
হইতেন । তখন লোকে সত্যসত্যই তাঁহাকে মানবকন্ডাবেশে সাক্ষাৎ
কোন অমরহুহিতা মনে করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে আগ্রত হইত ! বিশেষতঃ
সীতার জন্মসম্বন্ধীয় ঘটনার সহিত তাঁহার অলৌকিক রূপ, শাস্ত্র-
স্বভাব, কোমলতা, সরলতা প্রভৃতি গুণাবলীর আলোচনা করিয়া
সকলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, সীতা অবশ্যই অবোদিসম্ভবা
হইবেন, যেহেতু কোন নারীগর্ভসমুৎপত্তা বালার মধ্যে উল্লিখিত গুণরাশি
একাধারে কোথাও কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় না ।

বালিকা সীতার স্বভাব এমনই মধুর ছিল, দেখিয়া বোধ হইত
যেন স্বর্গ হইতে একবিন্দু স্নেহা জনকের গৃহে পতিত হইয়াছে ! রাজ-
বীর সভাতে যে সকল ভূপোদন মহর্ষি আগমন করিতেন, তাঁহারা
সীতার সৌন্দর্য্যপ্রভা ও পবিত্রতা দেখিয়া তৎসম্বন্ধে নানারূপ অভিমত
প্রকাশ করিতেন । সরল সীতা ঋষিগণের নিকট তাঁহাদের আশ্রমের
বর্ণনা শুনিতে সান্তিশর কোতুহল প্রকাশ করিতেন, এবং পবিত্রস্বভাব
ঋষিকন্ডাগণের সহিত বাস ও বিচরণ করিতে একান্ত অভিলাষিণী
হইতেন ; তাহা দেখিয়া দূরদর্শী মহর্ষিগণ বলিতেন এই কল্পা ভবিষ্যতে
স্বামীসহিত অরণ্যচারিণী হইবেন । বাস্তবিক, সীতা বাল্যকাল
হইতেই প্রাকৃতিক মৃদু ও সৌন্দর্য্যে এমনই বিস্ময় হইতেন, এবং
পবিত্র আশ্রমভূমির চরমলাভের তাঁহার মনে এতই বলবতী ছিল যে,

তিনি স্বামীর সহিত প্রায় চতুর্দশবর্ষকাল অরণ্যবাস ও নানাস্থানে মনোহর আশ্রমপদসকল পর্য্যটন করিয়াও হৃদয় মধ্যে যেন কিছুমাত্রও ভৃগুলাভ করেন নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার সরল পবিত্র হৃদয়ে পতিত হইয়া স্বর্ণের শোভায় পরিণত হইয়াছিল। নিবিড় অরণ্যানী, ভীষণ গিরিশৃঙ্গ, ভয়াবহ নদনদী প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক সীতা কখনও সম্মানিত না হইয়া বরং ভীতিমিশ্রিত এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন। সীতা কাননমধ্যে নির্ভীকচিত্তে হরিণীর স্তায় বিচরণ করিতে এবং মনোহর পুষ্পসকল চয়ন করিয়া বনদেবীর স্তায় পুষ্পভূষণে ভূষিত হইতে সান্তিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের প্রতি অমুরাগবিষয়ে সীতা জগতে অতুলনীয়। এই জন্তই বৃক্ষি তিনি পৃথিবীর প্রিয়তমা হুহিতা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন !

বাস্তবিক, সীতার সমগ্র জীবনের ঘটনাপরম্পরা আলোচনা করিয়া এক একবার মনে হয়, বিধাতা বৃক্ষি সংসারের কাঠিন্ত ও কর্কশতার জন্য সীতাকে সৃজন করেন নাই ; পরন্তু ফলপুষ্পশোভিত মনোহর কানন সমূহে মৃগীগণের সহিত ক্রীড়া ও সরলহৃদয় তাপসকস্তাগণের সহিত বনে বনে বিচরণ ও পুষ্পাদিচয়নের জন্যই তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন ! বৃক্ষি সীতার ভাগ্য রত্নৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ মধ্যে নিক্ষিপ্ত না হইয়া যদি বৃক্ষদলশোভিত সুগন্ধিসেবিত কোন নির্জন আশ্রম মধ্যে পতিত হইত, তাহা হইলেই যেন সীতার জীবনের কৃতার্থতা-সম্পাদন হইত ! কিন্তু পরমেশ্বর কুসুমকোমলপ্রাণী সীতাকে সংসারের ভীষণ অগ্নিপরীকার নিমিত্ত অভিপ্রোক্ত করিয়াছিলেন ; আর সীতাও অন্তর্নিহিত অলৌকিক তেজোবলে আপনায় ধর্ম্ম ও সুস্থ স্বাস্থ্য করিয়া চিরকালের জন্য সমগ্র জীবান্তির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি নারীকুলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া জগতে যশুভিত হইতেছেন।

সে যাহা হউক, রাজর্ষি জনক লোকমুখে প্রাণসমা দুহিতার প্রশংসা ও ধ্বিগণের নিকট তাঁহার শুভলক্ষণাদির কথা শ্রবণ করিয় মনে মনে অতিশয় পুলকিত হইতেন। সীতাও পিতার আদর ও যশে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। মলয়সমীরস্পর্শে পুষ্পমুকুল যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, সেইরূপ পিতার ধর্মপ্রধান রাজসংসারে সীতার সুকোমল মনও ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নিশাবসানে আলোক এবং অন্ধকার মিশ্রিত হইয়া যেমন বিশ্বমোহিনী উষার সৃজন করে, সেইরূপ শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে নগ্নারমান হইয়া সীতাও স্বর্গের সুবমার সুশোভিত হইতে লাগিলেন। আর ক্ষুণ্ণপুষ্পের দলে দলে সৌন্দর্য্য যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ বিকাশমান সীতা-চরিত্রও কোমলতা ও মাধুর্য্যগুণে ভূষিত হইতে লাগিল। রাজর্ষি জনক এহেন দুহিতার দ্ব্য কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন এই চিন্তার মধ্যে মধ্যে আকুল হইতে লাগিলেন।

(পূর্বকালে এতদেবীর রাজগণ উপযুক্ত পাত্রাভাবে কন্তার বিবাহের নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তাঁহার কখন কখন কন্তাকে স্বয়ং পাত্রনির্বাচন করিতে অহুমতি প্রদান করিতেন; কখনও বা বলবীৰ্য্যের পরীক্ষা করিয়া আপনাই পাত্র মনোনীত করিয়া দিতেন। তৎকালে শারীরিক বলবীৰ্য্যের অতিশয় সমাদর ছিল, এমন কি রমণীগণও বীৰ্য্যহীন কাপুরুষকে বারপরনাই ঘৃণা করিতেন। কন্তালাভবাসনার ও বলবীৰ্য্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার আশায়, নানাদেশ হইতে নরপতিগণ উপস্থিত হইয়া বীৰ্য্য-পরীক্ষার যোগদান করিতেন। যিনি সেই পরীক্ষার সমুত্তীর্ণ হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠতম হইতেন, তাঁহাকেই পুরস্কারস্বরূপ সেই দুর্লভ কন্তার সম্ভ্রম করিয়া হইত। বীৰ্য্যই তৎকালে কন্তার পাণি-গ্রহণের একমাত্র ঠিক ছিল। রাজর্ষি জনক উদ্ভিন্নমোহন সীতার

নিমিত্ত বিশেষ অহুসন্ধান করিয়াও উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া বীৰ্য্য-পরীক্ষাধারাই কত্কা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন ।

একদা মহাবল শূলপাণি দক্ষযজ্ঞবিনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এক বৃহৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোবতরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, “সুরগণ, আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু তোমরা আমার লভ্যাংশদানে সন্মত হইতেছ না । অতএব এই শরাসনদ্বারা আমি তোমাদিগকে এক্ষণেই বিনাশ করিব ।” মহাদেবের এই কথা শুনিয়া দেবগণ স্ততিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন । তখন রুদ্র ক্রোধসম্বরণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন । দেবতারা হরধনু গ্রহণ করিয়া জনকের পূৰ্ব্বপুরুষ মহারাজ নিমির পুত্র দেবরাতের নিকট উহা ন্যাসস্বরূপ রাখিয়া দিলেন । রাজর্ষি জনক এক্ষণে উক্ত ধনুর কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি সেই হরকার্ম্মকে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহারই হস্তে তিনি সীতাকে সম্প্রদান করিবেন । অনন্তর সীতা বয়ঃপ্রাপ্তা ও বিবাহযোগ্যা হইলে অনেকানেক রাজা আসিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সীতা বীৰ্য্যশূন্য ছিলেন বলিয়া জনক কাহারও প্রার্থনার সন্মত হইলেন না ।

কিরাদিবসमध्ये সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও গুণাবলীর কথা দেশবিদেশে প্রচারিত হইল, এবং তৎসঙ্গে সৃজে জনকের পণ্ড সকলে বিদিত হইলেন । কত দেশ হইতে কত নরপতি আসিয়া সীতালভ-বাসনার সেই হরকার্ম্মকে জ্যারোপণ করিতে বদ্ধ করিলেন, কিন্তু কেহুই তাহা গ্রহণ বা উত্তোলন করিতে পারিলেন না, সুতরাং সীতা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন । এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরেই সাংকাজা হইতে সুধবা নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি আসিয়া বিধিলারাজ্য অবরোধ করিলেন, এবং দূতদ্বারা

জনকের নিকট সীতা ও -হরধরু প্রার্থনা করিলেন। জনক তাঁহার প্রার্থনার কিছুতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বহুদিনব্যাপী যুদ্ধের পর রাজর্ষি সুধমাকে সমরে নিহত করিলেন এবং তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া তাহা নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা মহাত্মা কুশধ্বজকে অর্পণ করিলেন।

এদিকে ভূগালগণও বীর্য্যশক্তে ক্রতকার্য্য হওয়া সংশয়হীন বুদ্ধিতে পারিয়া অত্যন্ত জুঁক হইলেন; তাঁহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বৃষ্টি মিথিলাধিপতি তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে অবমানিত করিবার জন্তই এইরূপ কঠিন পণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারাও সম্ভবত হইয়া বলপূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে মিথিলানগরী আক্রমণ করিলেন। আবার ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রায় সপ্তসরকাল রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া জনক অবশেষে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। জনক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ক্রিয়াক্রমে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে এই চিন্তার একান্ত বিমনামান হইলেন।

এইরূপে ক্রিয়াকাল অতিবাহিত হইলে, রাজর্ষি জনক এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি নানাদেশস্থ ঋষি তপস্বী ও ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। যথাসময়ে সকলে উপস্থিত হইলে, যজ্ঞক্ষেত্র এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কোথাও ঋষিনিবাস সকল অভ্যাগত ঋষিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ; কোথাও ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বেদধ্বনি করিতেছেন, এবং কোথাও বা বহুবর্শনার্থী প্রজাপুত্র সমবেত হইয়া বিনিতকন্দরে অগ্নিকর ঋষিগণকে সন্দর্শনপূর্ব্বক নয়নমন সার্থক করিতেছে। বিমলদ্ব্যভাব রাজর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠানে ও অভ্যাগত মহাজনগণের সংকারে ব্যাপ্ত আছেন, এমন সময়ে তিনি প্রবণ করিলেন যে, সহচর ঋষিবর্গের সহিত মহর্ষি

বিশ্বামিত্র যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি পুরোহিত-গণকে আশ্রয় লইয়া অর্ঘ্যহস্তে মহর্ষির প্রত্যাগমন পূর্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং তাঁহার আগমনে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও যথাক্রমে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আশ্লাদসহকারে সহচরবর্গের সহিত জনকপ্রদত্ত আসনে স্থখে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি জনক সেই সহচরগণের মধ্যে অসিতুণ্ড ও শরাসনধারী দুইটি বীর যুবককে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। শর্দূলের ভ্রাতা তাঁহাদের বিক্রম, মন্তমাতঙ্গের ভ্রাতা তাঁহাদের গতি এবং দেবতার ভ্রাতা তাঁহাদের রূপ। তাঁহাদের স্নকোমল অঙ্গে যৌবনশোভার আবির্ভাব হইয়াছে, দেখিয়া বোধ হইল যেন দ্ব্যলোক হইতে দুইটি দেবতা বদ্রচ্ছাক্রমে ভুলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন গগনতলকে স্নশোভিত করেন, সেইরূপ কুমারদ্বয়ও সেই প্রদেশকে যারপরনাই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উভয়ের আকার ইঙ্গিত ও চেষ্টার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখিয়া রাজর্ষি বিনীতভাবে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তপোধন, আপনার সহচরবর্গের মধ্যে যে এই দুইটি কুমারকে দেখিতেছি, ইহারা কাহার পুত্র? কি জন্তুই বা ইহারা এই দুর্গমপথে পাদচায়ে আগমন করিলেন? আপনি স বিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতুহল হইতেছে।”

তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকের প্রার্থনায় সন্মত হইয়া বৃহন্নথুর বাক্যে তাঁহাদের বিবরণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি জনক সকলের সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, “রাজন্, আপনি যে এই কুমারদ্বয়কে দেখিতেছেন, ইহারা অবোধ্যাপতি মহাত্মা দশরথের পুত্র । আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে, রাজা দশরথ বৃদ্ধবয়সে পুত্রোষ্টি অমুষ্ঠান করিয়া চারিটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন । জ্যেষ্ঠা মহিষী কোশল্যার গর্ভে এই চুর্কাদলশ্রাম কমললোচন রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে শুলীল ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে তুল্যরূপ যমজ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন ; তদন্থো এই কনককাস্তি বীর কুমারের নামই লক্ষ্মণ । ইহারা সকলেই প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাবী, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মুবিদ্যাবিশারদ । ইহাদের পরম্পরের সৌভ্রাতৃ জগতে অতুলনীয় ; কিন্তু তাহা হইলেও লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের নিকটেই থাকিতে ভাল বাসেন । ইহারা যেমন শাস্ত্র ও শুলীল, তেমনই অতিশয় পরাক্রমশালী । কিয়দিবস হইল আমি এক যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছিলাম ; কিন্তু মারীচাদি চুর্কাস্ত্র রাক্ষসগণ পাছে তাহার বিঘ্ন সমুৎপাদন করে, এই আশঙ্কায় আমি মহারাজ দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার এই সিংহপরাক্রম পুত্র রামচন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করিলাম । রামের বয়ঃক্রম বোধশ বর্ষ রাজ ; ইহাকে রাক্ষসবৃদ্ধে অসমর্থ ভাবিয়া দশরথ অতিশয় চিন্তা-কুল হইলেন । বৃদ্ধ দশরথ পুত্রস্নেহে বিকোহিত হইয়া প্রথমে আমার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না ; কিন্তু তিনি আমার নিকট প্রতিক্ষাঘট ছিলেন, এই নিমিত্ত ধর্ম্মলোপভয়ে ভীত হইতে লাগিলেন ; পরিশেষে কুলপুরুষোচিত মহর্ষি বলিষ্ঠের অনুরোধবাক্যে রামসদ্বন্ধে আশঙ্কিত ও নিশ্চিন্ত হইয়া, তিনি লক্ষ্মণের সহিত রামকে আমার হস্তে

সমর্পণ করিলেন । লোকাভিরাম কুমারদ্বয় আপনাদের শাস্ত্রস্বভাব ও অনুপম সৌন্দর্য্যদ্বারা সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে করিতে পাদচায়েই আমার সহিত গমন করিতে লাগিলেন । পশ্চিমধ্যে কোথাও মনোহর কানন, কোথাও পুণ্যসলিলা নদী, কোথাও বা রমণীয় আশ্রম দর্শন পূর্ব্বক রাম তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত কোতূহল প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমিও স্তম্ভুর বাক্যে তাহাদের পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিতে করিতে কুমারদ্বয়ের পথশ্রাস্তি দূর করিতে লাগিলাম । কিন্তু পত্রদলশোভিত নবীন কদলীবৃক্ষ দারুণ আতপ-তাপে যেমন পরিম্লান হয়, সেইরূপ পথশ্রম ও ক্ষুৎপিপাসায় পাছে ইঁহারা অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন, এই নিমিত্ত আমি সরযুতীরে ইঁহাদিগকে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটি বিদ্যা প্রদান করিলাম । তাহাদের প্রভাবে ইঁহারা ক্ষুৎপিপাসাবিরহিত হইয়া স্থখে বিচরণ করিতে পারিবেন ।

“অনন্তর পবিত্রসলিলা জাহ্নবী সমুত্তীর্ণ হইয়া আমরা জনসঙ্কার-শূন্ত এক ভীষণ অরণ্য দেখিতে পাইলাম । সেই বন নিরন্তর ঞ্জিলী-রবে পরিপূর্ণ এবং ভয়াবহ স্থাপদকূলে সমাকীর্ণ । তাহার মধ্যে কোথাও নানাপ্রকার বিহঙ্গ ভয়ঙ্করস্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে, কোথাও বা সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ও হস্তী সকল ইত্যন্ততঃ ধাবমান হইতেছে । ভাড়কানারী ঘোরদর্শনা এক রাক্ষসী সেই অরণ্যে বাস করিত । তাহার দেহে সহস্র মাতঙ্গের বল ছিল এবং সে মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে দারুণ রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহারই মনোরম আশ্রম ধ্বংস করিয়াছিল । তাহার ভয়ে পথ জনশূন্ত ও তাহার উৎপীড়নে প্রাণিকুল অর্জ্জরিত হইয়াছিল । আমি সেই রাক্ষসীর সর্বিশেষ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া তাহার বিনাশের নিমিত্ত রামকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলাম । রামও লোকহিতার্থ তাহার বিনাশসাধনে

কৃতসঙ্কর হইয়া ধর্মকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন । রাক্ষসী সেই টঙ্কার লক্ষ্য করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল এবং ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল । অবশেষে রামচন্দ্র এক স্ত্রীক্লম শরদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন ; রাক্ষসীও সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল । রাক্ষসী বিনষ্ট হইলে আমি প্রীতমনে রামকে মন্ত্রসহ কতকগুলি দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলাম ।

“অনন্তর কিয়দিবস মধ্যে আমরা সিদ্ধাশ্রম নামে আমাদের রমণীয় আশ্রমে উপনীত হইলাম । রাম ও লক্ষ্মণের বাক্যে আমি সেই দিবসেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম । আমি যথাবিধি যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিতেছি, এমন সময়ে রাক্ষসেরা নানারূপ উৎপাত আরম্ভ করিল । আকাশমণ্ডল সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইল ; চতুর্দিক্ হইতে ডরঙ্কর শব্দসকল উদ্ভিত এবং বেদির উপর জ্বাপুষ্পের স্তায় ঘনীভূত রক্তবিশু সকল পতিত হইতে লাগিল । এই সকল উৎপাত দেখিয়া রাম বুদ্ধিতে পারিলেন যে রাক্ষসেরা নিকটস্থ হইয়াছে । তিনি তৎক্ষণাৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । মারীচকে অজ্ঞাবাগে তিনি বহুদূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন এবং অপরপর রাক্ষসগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিনষ্ট করিলেন । অনন্তর নির্ঝিষে যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমি রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিলাম । তাঁহারাও বিনীত ভাবে প্রণাম করিয়া আমার অস্ত্র আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

“রাজর্ষে, যজ্ঞসমাপন করিয়া আমি সহচর ঋষিবর্গের সহিত আপনাদের এই স্নবৃহৎ যজ্ঞ দর্শনার্থ সমুৎসুক হইলাম । আপনার গৃহে সুরক্ষিত সেই বিচিত্র হরধর্ম্মর বিষয় স্মরণপূর্ব্বক আমি তাহার বিবরণ রাম ও লক্ষ্মণকে জ্ঞাপন করিলাম । ইহারাও তাহা দর্শন করিতে একান্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলে, আমি ইহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই আপনার রাজ্যে আসিয়াছি । পশ্চিমধ্যে বিক্সালা নগরীতে

আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম, এবং রামচন্দ্র মিথিলার অনতিদূরে গৌতমাত্রমে প্রবেশ পূর্বক দেবক্লগিণী অহল্যাকে শাপযুক্তা করিয়াছেন। গৌতমী মহর্ষি গৌতমের অতিশাপে রামের দর্শনকাল পর্য্যন্ত ত্রিলোকের হুণিরীক্ষা হইয়া ভস্মাবলোপিতদেহে কঠোর তপস্তা করিতেছিলেন, এক্ষণে শাপের অবসান হওয়াতে পবিত্র হইয়া স্বামীর সহিত তপশ্চরণ করিতে বনগমন করিয়াছেন। রাজন, দশরথের এই তনয়গুণ বিচিত্র হরধনু দর্শন করিতে আপনার গৃহে আগমন করিয়াছেন; আপনি ইহাদের অভিলাষ পরিতৃপ্ত করিলে আমিও চরিতার্থ হইব।”

বিশ্বামিত্রের নিকট রাজকুমারদ্বয়ের এই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি জনক অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং তাঁহাদের বিলক্ষণ প্রশংসা ও সমাদর করিলেন। পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে জনক অমুচরবর্গকে হরধনু আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। যথাসময়ে ধনুক আনীত হইলে, বিশ্বামিত্র রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “বৎস, তুমি এক্ষণে এই হরশরাসন নিম্নীকণ কর।” রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুবা উদ্ঘাটন ও ধনু অবলোকন করিয়া কহিলেন, “আমি এই দিব্য শরাসন পাণিতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন আমাকে কি ইহা উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে?” বিশ্বামিত্র ও জনক সম্মতি প্রদান করিলে, রাম সেই ধনু গ্রহণ ও সকলের সম্মুখে অনারাসেই তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া আকর্ষণ ও আক্ষালন করিতে লাগিলেন। শরাসন তদ্রূপেই স্থিতি হইয়া গেল। ঐ সময়ে বজ্রনির্ঘোষের ভাৱ একটা ভীষণ শব্দ সমুদিত হইল; তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিচৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন।

রাজা জনক ধনু স্থিতি হইতে দেখিয়াই জানকীর পরিণয় সম্বন্ধে দমস্ত সংশয় অপনীত করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিশ্বাসের

আবির্ভাব হইল ।* অগ্নিস্কুলে যেমন দাহিকাশক্তি আছে, সেইরূপ
সুকুমার রামচন্দ্রের সুকোমল দেহেও সিংহের পরাক্রম দর্শন করিয়া
তিনি তাঁহার ভয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ভগবৎরূপার তাঁহার
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে এবং প্রিয়তমা জানকীও রামের সহিত পরি-
ণীতা হইয়া পিতৃকুলে কীর্তিস্থাপন করিবেন এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয়
আনন্দে উৎফুল্ল হইল । তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতি গ্রহণ-
পূর্বক মহারাজ দশরথকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন ও তাঁহাকে অনতি-
বিলম্বে মিথিলায় আনয়ন করিতে শীঘ্রগামী রথে দূত সকল প্রেরণ
করিলেন । দূতেরাও যথাসময়ে অবোধ্যায় উপনীত হইয়া মহারাজকে
ধনুর্ভঙ্গব্যাপার ও রামলক্ষণের কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিল ।

এদিকে ধনুর্ভঙ্গসংবাদ মিথিলা নগরীর মধ্যে প্রচারিত হইবামাত্র
হর্ষ-বিস্ময়-সম্বলিত এক মহান কোলাহল সমুখিত হইল । সকলে এক
বাক্যে রাজকুমার রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিল । বিবাহের
দিন সন্নিহিত দেখিয়া প্রশস্ত রাজপথসকল পরিষ্কৃত, উন্নতানত স্থান
সমূহ সমতল, এবং স্থলে স্থলে মনোহর তোরণসমূহ সুসজ্জিত হইতে
লাগিল । পুরবাসিগণ আপনাদের গৃহদ্বার পুষ্পমালা ও লতাজালে
বেষ্টন করিল এবং নগরীর মধ্যে নিরন্তর মঙ্গলময় বাদ্যধ্বনি হইতে
লাগিল । জনকের অন্তঃপুরও বিবাহোচিত মাজল্যোৎসবে অপূর্ব
শোভা ধারণ করিল ।

সীতার বয়ঃক্রম এ সময়ে কেবলমাত্র দশম বা একাদশ বর্ষ হইয়াছিল
বটে, কিন্তু রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়া পিতাকে প্রতিজ্ঞাপাশ ও চিন্তাজাল
হইতে নির্মুক্ত করিয়াছেন ইহা শুনিয়া তিনি রামের প্রতি অত্যাশঙ্কিত
হইলেন, এবং লোকমুখে ভাবী ভর্তার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও
অসামান্য পৌরুষের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতিশয় পুলকিত
হইতে লাগিলেন । ফলতঃ, যে বয়সে সীতার বিবাহ হইয়াছিল, সে

বয়সে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অমুরাগ ব্যতীত তাঁহার নিকট আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ? সত্য বটে, সীতা এ পর্য্যন্ত রামকে একটাবারও নয়নগোচর করেন নাই, কিন্তু তাঁহার বিবাহবিষয়ে যে কঠিন পণ করিয়া মিথিলাধিপতি অত্যন্ত বিমর্ষ হইতেন, সেই কঠিন পণ হইতে পিতাকে যিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি কুরূপ আর সুরূপই হউন, গুণবান্ আর নিগুণই হউন, তিনিই যে ধর্ম্মতঃ সীতার পতি, এবং তিনিই যে সীতার বিশেষ শ্রদ্ধা ও অমুরাগের পাত্র তদ্বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সীতা এই বয়সে আর কিছু বুঝিতে অক্ষম হইলেও উক্ত সত্যটি যে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। পরে, তিনি স্বামীর রূপলাবণ্য, পৌরুষ ও পরাক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া, ধনবানের অধিকতর ধন লাভের জ্ঞান, আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলেন মাত্র। ফলতঃ স্বামীর গুণাগুণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকেই আপনার একমাত্র দেবতা মনে করা জীজ্ঞাসিতর পক্ষে যে পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম, ইহা সীতা আপনার জীবনে পরে যে রূপ পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন, সামান্য নারীর পক্ষে সেরূপ করা অতিশয় ছকর কার্য্য। স্বাভাবিক পতিপরায়ণতাই সীতার মাহাত্ম্য, এবং সেই মাহাত্ম্যবলেই তিনি অন্যাপি অগতে প্রাণত্যাগ করিয়া হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

বাল্মীকি সীতার এ সময়ের মনোগত ভাব সমূহ বর্ণিত না করিলেও, তাঁহার চরিত্র পূর্ক্সাপর আলোচনা করিয়া আমরা মানসচক্ষে তাঁহাকে যেন সন্মুখেই দেখিতে পাইতেছি। সীতার বালিকাসুলভ চপলতা কিঞ্চিৎ অপনীত হইরাছে; মনোবৃত্তিসকল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রিত হইতেছে, এবং তজ্জন্ত গান্ধার্য্যও মধ্যে মধ্যে তাঁহার অন্তঃস্বামী চরিত্রকে স্পর্শ করিয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে। সরলতা ও পবিত্রতাই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান উপাদান, কিন্তু তাহা

হইলেও উবারাগরঞ্জিত প্রভাত যেমন সকলের মনোহর হয়, সেইরূপ স্বর্গীর লজ্জার কোমলস্পর্শে তাঁহার সৌন্দর্য্যোৎ দেবরাজ্যের ছায়া পরি-
লক্ষিত হইতেছে। বুদ্ধিবৃত্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়াতে, প্রতিভার
দ্বিবা জ্যোতি মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত করিতেছে, এবং পবিত্রতা স্নান নরন
যুগল হইতে কোমল দীপ্তরূপেই যেন উদ্ভাসিত হইতেছে। শুভ্র
আলোক যেমন শুভ্র আলোকে মিশিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার নির্মল
মনোবৃত্তিনিচয় স্বভাবতই ধর্ম্মমুখীন হইয়াছে। পলিতকেশ, বালকের
ভ্রায় সরলস্বভাব, পবিত্রচেতা ঋষিগণের মুখে সীতা সর্বদা মনোহর ধর্ম্ম
ও নীতিবিষয়ক উপাখ্যান শুনিয়া দিন দিন আপনার ধর্ম্মবৃত্তি সমৃদ্ধ
করিতেছেন, এবং জগতে যাহা কিছু স্নান ও পবিত্র, তাহারই প্রতি
শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি পিতামাতা ও গুরুজনের
প্রতি সর্বদাই ভক্তিমতী, দাসদাসীগণের প্রতি সদয়া ও মধুরভাষিণী,
সখীগণের হিতকারিণী, এবং গৃহপালিত পশুপক্ষিগণের একমাত্র
স্নেহময়ী জননী। জ্যোৎস্নালোকে একটা শুভ্র পুষ্প যেন জনকের
গৃহদ্বারে প্রক্ষুটিত হইয়াছে, অথবা স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ
করিয়া কোন দেবকন্তা যেন কি এক মহত্বদেবপ্রসাধনের নিমিত্ত এই
ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন! সীতার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবরূপিণী
বালিকামূর্ত্তি সহসা ধ্যানপথে সমুদিত হইয়া আমাদের কাছে কোন্ এক
দেবরাজ্যে লইয়া যাইতেছে, এবং কণকালের অন্তর এই শোকভাগবত
অনিত্য সংসারকে আমাদের পাপকলুবিহীন মন হইতে ধীরে ধীরে
অপসারিত করিতেছে। আমরা প্রকৃতমনে সীতার এই কুমারীমূর্ত্তিকে
শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত অভিবাদন করি, এবং তাঁহার আলৌকিক গুণ-
বলী আলোচনা করিতে করিতে হৃদয়মন পবিত্র করি।

সে যাহা হউক, স্বর্ঘ্য যেমন চন্দ্রকে শুভ্র জ্যোতি প্রদান করেন,
সেইরূপ রাজর্ষি জনক শান্তস্বভাব পবিত্রচরিত্র রামচন্দ্রের হস্তে

প্রাণতুলা এই ছহিতারত্নকে সমর্পণ করিতে যত্ববান হইলেন। কির-
দ্বিবস মধ্যে ভরতশত্রুঘ্ন, কুলোপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং অসংখ্য
অমুচরের সহিত রাজা দশরথ মিথিলার উপস্থিত হইলেন। জনক
দশরথের আগমনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার সমুচিত সংকার
করিলেন এবং যজ্ঞসমাপনান্তে সীতার সহিত রামের ও তাঁহার
অপর্য তনয়া উর্ধ্বিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন।
চতুর্দিকে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও
বিশ্বামিত্র একত্রে পরামর্শ করিয়া জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মশীল কুশ-
ধ্বজের রূপবতী হুইটি কন্তাকে ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্ত প্রার্থনা করি-
লেন। রাজর্ষি জনক তাঁহাদের এই সুসঙ্গত প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ
সম্মত হইলেন। রাজা দশরথ ও পুত্রগণের একই সময়ে এবং একই
স্থলে বিবাহ হইবে শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে, রাজকুমারগণ স্নানর বেশভূষায়
সুসজ্জিত হইয়া বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের সহিত বিবাহস্থলে উপনীত হই-
লেন। রাজকন্তারাও নানাবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া জনকের
সঙ্গে তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বেদিনিন্দ্রাণ পূর্বক
তত্পরি বহ্নিস্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিলে, রাজা জনক
লজ্জাবনতমুখী সীতাকে রামের অভিমুখে ও অধির সমক্ষে সংস্থাপন
করিয়া কহিলেন “রাম, এই সীতা আমার ছহিতা; ইনি তোমার
সইধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি পাণি দ্বারা ইহার পাণি গ্রহণ কর, তোমার
মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিব্রতা হউন, এবং ছারার জ্ঞায়
নিরন্ত তোমার অমুগত থাকুন।” (১।৭৩) রাজর্ষি এই বলিয়া রামের
হস্তে মন্ত্রপুত জল নিক্ষেপ করিলেন। সভাস্থ সকলে সাধুবাদ
প্রদান করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দিক্ হইতে হুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি
হইতে লাগিল।

রাজা জনক রামচন্দ্রকে এইরূপে সীতা সম্ভাদান করিয়া আনন্ডিত মনে লক্ষ্মণের হস্তে উর্দ্ধিলাকে, ভরতের হস্তে মাণ্ডবীকে এবং শত্রুঘ্নের হস্তে ঐশ্বকীর্ষিকে সমর্পণ করিলেন । রাজকুমারেরাও ভগবান্ বশিষ্ঠের মতামুসারে ঐ চারিটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন । তখন চতুর্দিকে ছন্দুভিধ্বনি সঙ্গীত ও বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল এবং লোকের এক মহান্ আনন্দকোলাহল ভিন্ন আর কিছুই প্রতিগোচর হইল না । রাজা দশরথ শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া নববরবধুসমাগমে প্রকল্পচিত্তে নানাবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ।

সীতা ভর্তার সহিত সমাগত হইয়া এই প্রথম তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করিলেন । বাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বালিকাহৃদয় উষ্মলিত হইয়া উঠিল । সীতা দেখিলেন যে, রামচন্দ্র নবযৌবনে এই পদার্পণ করিতেছেন ; দেবতার সৌন্দর্য্য তাঁহার দেহে ফুটিয়া উঠিতেছে ; সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল অতুল শক্তির আধারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে ; স্বন্দর জুগলে মানসিক তেজ ও চরিত্রের দৃঢ়তা যেন সঞ্চিত রহিয়াছে ; সুচারু নয়নযুগল হইতে প্রতিভা প্রদীপ্ত হইতেছে এবং এক দিব্য জ্যোতি মুখমণ্ডলে জ্বীড়া করিতেছে । মূর্তি সৌম্য ও প্রসন্ন, দেখিলেই নিরানন্দমনে আনন্দের সঞ্চার হয়, অপবিত্র ভাবসমূহ লঙ্ঘিত হয় ও সাধুভাব জাগ্রত হয় ; যতবার দেখা যায়, কিছুতেই নয়ন পরিভৃপ্ত হয় না এবং দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিতেই ইচ্ছা হয় । সীতা তাঁহার দেবরূপী স্বামীকে সম্বর্ধন করিয়াই ভাস্করসে আগ্নুত হইলেন এবং আপনাকে চিরকালের জন্ত তাঁহার চরণতলে সমর্পণ করিলেন ।

রামও নবগরিষ্ঠতা সীতাকে একটীবার মাত্র নয়নগোচর করিয়া হৃদয়মধ্যে এক অভূতপূর্ব ভাব অনুভব করিলেন । সীতার সরল পরিভ্র

মূর্তি রামের নির্মল হৃদয়গটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গেল। রাম এই মূর্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিলেন; ইহা আর কণকালের অন্তও কখন তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

বিবাহের পরদিন বয়সবধূর বিদায়ের আয়োজন হইতে লাগিল। জনক কণ্ঠাগণকে কণ্ঠাধনস্বরূপ অসংখ্য গো, অশ্ব, হস্তী, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রজত, মানাবিধ রত্ন, উৎকৃষ্ট কঙ্কণ, কোশের বসন, বহুমূল্য বস্ত্র, রথ, পদাতি এবং প্রত্যেককে শতসংখ্য সখী ও দাসদাসী প্রদান করিলেন। তিনি দশরথের সহিত কিয়দূর গমন করিয়া আনন্দের প্রতিমা প্রিয়তমা হৃহিতাকে অশ্রুজলের সহিত বিসর্জন পূর্বক স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। চন্দ্রশূভা হইয়া পৃথিবী যেমন অমানিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ জনকের রাজসংসারও একমাত্র সীতার অভাবে নিরানন্দ হইল। তৎক্ষণাৎ রাজর্ষি শোকাবেগে রুদ্ধ করিয়া নির্গি-
ণ্ডের স্থায় পূর্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাজ দশরথ পুত্র ও বধূগণের সহিত মহানন্দে রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ভীমদর্শন পরশুরাম রামচন্দ্রের বলবিক্রমে জঁর্ধাবিত হইয়া তাঁহার বিনাশসাধনে বদ্ধবান্ হইলেন, কিন্তু তিনিই পরিশেষে দশরথতনয়ের বলে পরাস্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সে যাহা হউক, রাজকুমারগণের আগমনসংবাদে অযোধ্যানগরী আনন্দোৎসবে পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিল। রাজমহিষীরা পুত্র ও পুত্রবধূগণের চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া বারমর্মানি পুলকিত হইলেন। রাজা দশরথ এইরূপে পুত্রগণের শুভপরিণয়কার্য সম্পন্ন করিয়া অন্যান্য গুরুতর কর্তব্যকর্মসম্পাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায় ।

একটা ক্ষুদ্র তটিনী পর্বতের নিভৃতদেশে অন্য়গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল । ক্ষটিকের ন্যায় নির্ঝল জলরাশি প্রস্তর হইতে প্রস্তরাস্তরে পতিত হইয়া কোথাও যেত ফেনপুঞ্জ উৎসারণ করিতেছে, কোথাও ক্ষুদ্র আবর্তসকল উৎপন্ন করিয়া চঞ্চলস্বভাবা অভিমানিনী বালিকার ছায় প্রতীয়মান হইতেছে, কোথাও শ্রামলতৃণদলশোভিত প্রশস্ত ক্ষেত্র মধ্যে উপস্থিত হইয়া স্থির ও গভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছে, আর কোথাও বা নিবিড়বনরাজিপরিশূর্ণ তটযুগলের মধ্যে বনজাত সুরভি কুসুমের পরাগ মাখিয়া কুলুকুলুতানে আনন্দে যেন নৃত্য করিতে করিতেই ছুটিয়াছে । পর্বততৃহিতা এই ক্ষুদ্রকারা তটিনী কি মনোহারিণী । দেখিতে দেখিতে তাহার নির্ঝল জলরাশি এক বৃহৎ নদবক্ষে মিলিত হইল । নদ প্রীতমনে তটিনীর আবেগময় জলোচ্ছ্বাস স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিল; কিন্তু তাহা ধারণ করিতে গিয়া তাহার বিশাল হৃদয় যেন বিকোষিত হইয়া উঠিল । উভয়ের জলরাশি একত্রে সম্মিলিত হইয়া ভীমকার ধারণ করিল বটে, কিন্তু তটিনীর ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বিশাল নদবক্ষে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল ! অনন্তর মহানদ কুশাগী তটিনীর নব-বলে বলীয়ান হইয়া মহোৎসাহে কত শ্রামল ক্ষেত্র প্লাবিত করিল, কত গ্রাম নগর ও জনপদের পদপ্রান্ত বিধৌত করিয়া গম্ভব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং পরিশেষে মহিমাময় অনন্তসাগরের সহিত আপনাদের অস্তিত্ব মিশাইয়া জীবন যেন সার্থক করিল ।

এই নদ ও তটিনীর মিলনপ্রসঙ্গ কি মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ ! পবিত্রস্বভাবা বালিকা জীবনের মধুর প্রভাতকালে কুল কুড়াইয়া,

পক্ষীর কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, হরিণশিশুর ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া কখনও চঞ্চল এবং কখনও গভীরভাবে ধারণ করিতে থাকে । এই বিশাল সংসারমধ্যে পরমেশ্বর তাহার ক্ষুদ্র জীবনের যে কর্তব্যটুকু নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার পালনের জন্য সেই বালিকাজীবন দিন দিন প্রস্তুত হয় । যথাসময়ে বালা আপনার অনুরূপ এক মুখকের হস্তে প্রদত্ত হইয়া তাঁহাকেই জীবনমন অর্পণ করে; বালিকা আপনার স্বাতন্ত্র্য সেই পতিরূপিণী প্রত্যক্ষ দেবতার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া ধস্তা হয় । অনন্তর উভয়ে পরস্পরের প্রীতি ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যথাসাধ্য সংসারধর্ম্য পালন করে । পরে সংসারের কার্য শেষ করিয়া দম্পতীবৃগল আপনাদের অস্তিত্ব মহান পরমেশ্বরের মহাসঙ্গে নিমজ্জিত করিয়া চরিতার্থ হয় ।

আমাদের সীতাদেবীর নির্মল জীবনশ্রোত পবিত্রহৃদয় রামচন্দ্রের জীবনশ্রোতে ধীরে ধীরে মিলিত হইল । তরঙ্গে তরঙ্গে আলিঙ্গন করিল; জলরাশি জলরাশির সহিত মিলিত হইয়া সমতাব প্রাপ্ত হইল, এবং যেদিকে স্বামীর জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল সেইদিকে সীতাও আপনাকে ভাসমান করিলেন । সীতার আর স্বাতন্ত্র্য নাই; সীতা যখন একবার স্বামীর সহিত মনে মনে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইলেন, তখন কি আর তিনি ইহজীবনে বা পরজীবনে কখনও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন ? বিচ্ছেদ অসম্ভব, এবং পরমেশ্বরেরও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত । গঙ্গাবমুনায় সন্মিলনের পর গঙ্গাজল হইতে কি বমুনাজল কখনও পৃথক্ করা যায় ? পুণ্যসলিলা এই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল যেমন পবিত্র, দুইটি মানবের জীবনের সঙ্গমও সেইরূপ বা ততোধিক পবিত্র ! এই পবিত্র সঙ্গমের নাম বিবাহ । ধাহারা বিবাহরূপ এই অভিনব পুণ্যভীর্ষের সাহায্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা বিচ্ছেদ বা অন্য কোন প্রকার মিলনের কথা একেবারে অসম্ভব

ভাসবাজার রাস্তা
 তৃতীয় পর্ব
 পত্রিকার নাম
 প্রিন্টারের নাম
 প্রিন্টারের ঠিকানা

মনে করেন, স্মৃত্তাং তৎসবকে স্মৃত্তি দিয়াই তাঁহার স্মরণ করিয়া থাকেন।

স্বামীর জীবননদী প্রবাহিত হইতে হইতে বালুকাময়ী মল্লভূমির মধ্যেই বিস্তৃত হউক, অথবা নবতেজে ও নবোৎসাহে নানা দেশ ও নগর প্রাবিত করিতে করিতে মহাসাগরের দিকেই প্রবাহিত হউক, সহস্রাব্দী চিরকালই তাঁহার সহচারিণী। (স্বামী স্মৃতিই থাকুন আর দুঃখেই থাকুন, পত্নী চিরকালই তাঁহার অমুগামিনী। স্বামী সদয় হউন আর নির্দয় হউন, অমুকুল হউন আর প্রতিকূল হউন, তিনিই পত্নীর একমাত্র দেবতা। স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপালন না করেন, স্ত্রী কি আপনার কর্তব্য কখনও ভুলিতে পারেন? পতিব্রতা প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া স্বামীর প্রতি তাঁহার কর্তব্য কার্যমনোবাক্যে পালন করিয়া থাকেন; পতিপরায়ণতাই তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম; স্মৃত্তাং সে ধর্ম তিনি নিজ জীবনে সাধন করিতে বদ্ধ করেন, এবং মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহাকে যে অবস্থাতে রাখিয়া দেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া জগতে কীর্ত্তিহাপন করেন।) আমাদের সীতাদেবী স্বামীর সহিত সজ্ঞত হইলেন; অতঃপর তিনি পাতিব্রত্যধর্ম কিরূপে পালন করেন তাহা দেখা বাউক।

একটা ক্ষুদ্র পুষ্পমুকুলের দলগুলি ভিন্ন হইতে হইতে যেমন তরুণ্যে ধীরে ধীরে স্তবাস সঞ্চিত হয়, সেইরূপ বিবাহের পর সীতাদেবী বিকাশমান হৃদয়গুপ্তে এক দিব্য সৌরভ অনুভব করিলেন। সে সৌরভে তাঁহার প্রাণ আধোদিত হইল; তিনি যেন কি একটা আশ্চর্য্যভাবের প্রবল উচ্ছ্বাস হৃদয়মধ্যে অনুভব করিলেন। ইতঃপূর্বে কখন যে তিনি এরূপ ভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে হইল না; ইহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অভিনব বলিয়াই বোধ হইল! সীতা সে ভাব সকলের কাছে গোপন

করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা যেরূপে কিছুতেই কৃতকাৰ্য্য হইলেন না। সীতার অসামান্য প্রকৃতি, কুর্ভি ও উৎসাহদ্বারা তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল ; রামের বিষয় মনোমধ্যে ধ্যান করিতে করিতে সীতা যে অকল্পিত হইয়া পড়িতেন, তদ্বারা সে তাব অপরিষ্কৃত রহিল না ; লখীগণের নিকট রামের কথা বলিতে তিনি বেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, এবং রামের প্রশংসা বেরূপ অবিভূষিতাবে শ্রবণ করিতেন, তদ্বারাও তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সীতা রামের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সহসা যে চক্ষুর্ধর স্বপদে নিহিত করিতেন, এবং কখন কখন নরনবুগল হইতে যে এক মদিরামর আলোক নিঃসৃত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত করিত, তদ্বারাও রাম তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন। সীতা কোন মতেই এই অভিনব মনোভাব লুকায়িত করিতে সমর্থ হইলেন না। সীতা ধীরে ধীরে কৈশোর ত্যাগ করিয়া যেমন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে লাগিলেন, অমনই তাঁহার হৃদয়েও পবিত্রপ্রেমের ব্যাকুল উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে উচ্ছ্বাসে সীতার আপন বলিতে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ভাসিয়া গেল ; সীতা আপনাকে ভুলিয়া কেবল রামময়-প্রাণা হইয়াই জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

দর্শনমাজেই বিস্ময়জনক রামচন্দ্রের নির্মল হৃদয়ে সীতার পবিত্র মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। রাম লবঙ্গ সে মূর্তি অন্তরের গুপ্তময় নিভৃত বেশে ধারণ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত ধ্যান করিতেন। যতই তিনি জনকভবনদ্বার অল্পময় চরিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি রামচন্দ্রের স্বাভাবিক অমুরাগ যেন শতগুণে বর্ধিত হইতে লাগিল। রাম সেই অমুরাগের দ্বারা দৌলভ্যাশালিনী সীতাকে তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবতা করিলেন ; তিনি দিন দিন সেই কল্যাণী নবযৌবনার বড়ই পকপাতী হইতে লাগিলেন। সীতার

বিশ্বচিন্তা কারলে তাঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়া বাইত ; অথবা হৃদয়-
কুটীরে সীতার স্থান ছিল বলিয়া রাম সবদে তাহা নির্মল ও পরিচ্ছন্ন
করিয়াছিলেন ! রাম বাল্যকাল হইতেই লোকহিতকর কার্য সমূহে
দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; তিনি প্রজাপুঞ্জকে অতিশয় স্নেহদৃষ্টিতে অব-
লোকন করিতেন, এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহাদের হিতসাধনে
যত্ববান হইতেন । এই সকল কারণপরম্পরা তিনি পূৰ্ব্ব হইতেই
অতিশয় লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন । বিবাহের পর হইতে রাম পরোপ-
কারে যেন অধিকতর আনন্দ অমুভব করিতে লাগিলেন । শাস্ত্রা-
লোচনার তাঁহার অমুরাগ যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, এবং বহুবিন্যা-
মুশীলনে উৎসাহান্নি যেন শতগুণে প্রজ্জলিত হইতে লাগিল ।
রাম পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি যেন অধিকতর কর্তব্যপরায়ণ
হইয়া উঠিলেন, দেবদ্বিজগণের প্রতি যেন অধিকতর ভক্তিমান হইলেন
এবং বরশ্রগণের মধ্যে যেন সমধিক ক্ষুণ্ণ ও প্রীতি প্রকাশ করিতে
লাগিলেন । রাম বুঝিতে লাগিলেন তাঁহার জীবন যেন কঠোর কর্তব্য-
ময় ; কিন্তু সে কঠোরতার কেমন কমলীরতা আছে ! তাঁহার জীবন
যেন একটি মহৎ ব্রত, কিন্তু সে ব্রতোদ্দেশ্যপনে কত সুখ ও আনন্দ
আছে ! রাম তাঁহার জীবনের এই অভিনব পরিবর্তন অমুভব করি-
লেন, এবং সীতাদেবীই যে এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ তাহাও
স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন । সীতা যে সাক্ষাৎসবদে রামকে এই
সমস্ত সং ও কর্তব্যকর্মের অমুষ্ঠানে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন তাহা
নহে ; কিন্তু রাম দেখিয়াছিলেন যে, একমাত্র সীতার বিদ্যমানতাই সমস্ত
সদমুষ্ঠানের যথেষ্ট কারণ ; সীতার নিখাসে সৌরভ ছুড়িতে থাকে,
সীতার বাক্যে অমৃত বর্ষণ হয়, এবং সীতার কোমলচরণস্পর্শে মরু-
ভূমিও পুলকিত হইয়া উঠে ! সীতাকে ভালবাসা একটি সহজী
সাধনা ; সমস্ত নীচবাসনা ও কুপ্রবৃত্তি দমন না করিলে তাঁহাকে ভাল

বাসা যায় না, অথবা তাঁহাকে একবার ভালবাসিতে পারিলে, স্বৰ্যোদরে ভমোরশির ভায়, তাহার। আপনাআপনিই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায় ! রামচন্দ্র সীতার নির্মল আত্মার সহিত স্বকীর আত্মার স্নেহ বোগ অহুতব করিলেন এবং বুঝিলেন যে, এ বোগ অনন্তকালের জন্ত, কখনও কোনপ্রকারে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে ।

বিবাহের পর রামের বাসের জন্ত এক স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দিষ্ট হইয়াছিল । রাম রাজকাৰ্য্যবিষয়ে পিতার সহায়তা এবং মাতৃগণের সেবা শুশ্রূষা করিয়া সামান্ত অবসর পাইলেই সীতার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইতেন । তিনি প্রীতিবিস্ফারিতলোচনে প্রিয়তমা জানকীর সহিত কত মনোহর গল্প করিতেন, কত সাধুগ্রন্থে সময় অতিবাহিত করিতেন, সীতাকে কত নীতিগর্ভ শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করাইতেন এবং পাতিব্রতাদর্শ সৰ্ব্বদে তাঁহার সহিত কত সমালোচনাই করিতেন । সীতার কর্ণধ্বজ রামের সেই অমৃতময়ী বাণী অতৃপ্তরূপে পান করিত । সীতাও কখন কখন রামের নিকট তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেন ; ঋষিগণের মুখে তিনি কেমন আশ্রমের বর্ণনা শুনিতেন, তাঁহার আশ্রমদর্শনলালসা এখনও কেমন বলবতী ; এখনও রামের সহিত পুণ্ডিত কাননসমূহে ভ্রমণ করিতে সীতার কত ইচ্ছা হয় ; রাম কোন দিন আশ্রমপর্য্যটনের সময় সীতাকে কি দয়া পূর্বক সমস্তব্যাহারে লইয়া যাইবেন ? সরলা সীতা রামের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার আনন্দের কারণ হইতেন । রামও দেবরূপিনী জানকীর বখেট সমাদর করিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিতেন ।

লক্ষণ রামের অতিশয় অহুগত ছিলেন । তিনি শৈশবকাল হইতেই স্বভাবতঃ রামের পক্ষপাতী ও তাঁহার প্রতি অতিশয় অহু-রাসিক । রাম যেখানে বাইতেন, লক্ষণও ধর্ম্মধারণ পূর্বক সেখানে

তঁাহার অনুসরণ করিতেন। লক্ষণ ব্যতীত রামও অধিকরণ কোথাও থাকিতেন না এবং কোন কার্যই করিতেন না। লক্ষণ সীতাদেবীকে সমুচিত ভক্তি করিতেন এবং স্নমিজ্ঞা হইতে তঁাহাকে কখনও বিভিন্ন ভাবিতেন না। সীতাদেবীও লক্ষণকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্থান দেহ করিতেন।

সীতা কোশল্যা প্রভৃতি স্বশ্রগণকে যার পর নাই ভক্তি করিতেন। তঁাহাদের সেবাপ্রদা করিতে পারিলে তঁাহার অন্তরে বিমল আনন্দের সঞ্চার হইত। স্বশ্রগণও সীতাকে কল্পাপেক্ষা সমধিক মেহ করিতেন। সীতা স্বশ্রগণের আসিয়া অবধি একটা দিনও জনক জননীর অভাব অনুভব করেন নাই। বাস্তবিক সীতা সকলের এমনই প্রিয়পাত্রী ছিলেন এবং তঁাহার অলৌকিক রূপ ও পবিত্রতাতে গৃহের এমনই অপূর্ণ স্ত্রী হইত, যে আলোক ব্যতীত গৃহ যেমন অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ সীতার অভাবে সেই স্নবৃহৎ রাজনিকেতনও শূন্য বোধ হইত।

এইরূপ বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল। কালের অবিশ্রান্ত গতিতে দেখিতে দেখিতে সীতার বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। সীতাদেবী এখন আর সেই কচিং চাপল্যময়ী, কচিং গাঙ্গীর্ধ্যশালিনী বালিকা নহেন; নবযৌবনসম্মগমে লজ্জাল্পর্শে তঁাহার বেরূপ শোভা হইত, সে শোভাও এখন আর নাই। তিনি এখন যৌবনসীমার অন্তর্ভুক্তিনী; কিন্তু বালিকাবয়সের সেই সরলতা ও পবিত্রতা তঁাহার মুখমণ্ডলে তেমনই প্রদীপ্ত রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যে চাকল্যের লেশমাত্র নাই; বিদ্বান্নতা বেন হ্রিয় ও গঙ্গীর ভাব অবলম্বন করিয়াছে! এই গাঙ্গীর্ধ্যহেতু সীতাদেবী সাধারণের হ্রির্দ্রীক্যা হইরাছিলেন। সহসা তঁাহাকে দেখিলে মনে ভীতিনিমিত্ত বিস্ময়ের আবির্ভাব হইত। কিন্তু বাহ্যিক নিয়ত তঁাহার

পবিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহার। তাঁহার দেবকন্যার পরিচয় পাইয়া ভক্তি ও আনন্দরসে আশ্রুত হইতেন। মহাবাহু রামচন্দ্র জানকীর প্রতি উত্তরোত্তর শ্রদ্ধাবান হইতে লাগিলেন; উভয়ের প্রেম ও প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উভয়ে অভিন্নহৃদয় হইলেন। রাম জানকীর অভিপ্রায় যেমন স্পষ্টই জানিতেন, সুরূপা জানকীও সেইরূপ অপেক্ষাকৃত বিশেষরূপে রামের অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন। এইরূপে সুখে ও সম্ভাবে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহাদের জীবননাটকে একটি নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হইল।

মহারাজ দশরথ বৃদ্ধবয়সে রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি চারিটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চারিটি পুত্রকেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। পুত্রেরাও সকলেই সুশীল সচ্চরিত্র ও পিতার প্রতি সমান ভক্তিমান ছিলেন। কিন্তু তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের যেমন শোভা হয়, সেইরূপ ভ্রাতৃগণের মধ্যে রামই অতিশয় শোভা পাইতেন। তিনি যেমন প্রিয়-দর্শন ও মিষ্টভাবী ছিলেন, সেইরূপ সত্যব্রত ও পরাক্রমশালীও ছিলেন; শাস্ত্রে ও শস্ত্রবিদ্যায় তাঁহার বৈরূপ পারদর্শিতা ছিল, সেইরূপ বিনয় ও ক্রমাও তাঁহার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার হইয়াছিল। তিনি এক-দিকে প্রজাকুলের হিতসাধনে যেমন সর্বদাই রত থাকিতেন, সেইরূপ অশিষ্ট ও দণ্ডার্থের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া জ্ঞানের মর্যাদাও রক্ষা করিতেন। তিনি যেমন প্রজাপালন ও রাজ্যাশাসনের বিবিধ উপায় সুন্দররূপে অবগত ছিলেন, সেইরূপ সর্ববিষয়ে ধর্মকেই জরযুক্ত কুরিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। রাম নৃপতিহীনত এই দামত সর্বোৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকৃতিবর্জের এবং বিশেষতঃ পিতৃ-দেবের অতিশয় প্রিয়ভাজন হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক, প্রজাপুঞ্জ লেন বৃদ্ধমহারাজ দশরথ অপেক্ষাও রামের প্রতি সমধিক অহুয়াগ

প্রদর্শন করিতে লাগিল ! এদিকে মহারাজও প্রিয়তম রামচন্দ্রকে
 জেদূশ লোকপ্রিয় দেখিয়া মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন ।
 বার্কক্যাপ্রযুক্ত তিনি আর পূর্ববৎ রাজ্যপালনে সক্ষম ছিলেন না,
 সুতরাং লোকাভিরাম রামচন্দ্রকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া
 স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিলেন । এতদ্ব্যতীত তিনি
 অনতিবিলম্বে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কোশল রাজ্যের নানা
 নগর ও জনপদ হইতে অধীন রাজা সামন্ত ও অন্তান্ত প্রধান
 ব্যক্তিগণকে আহ্বান করাইলেন এবং মর্যাদানুসারে তাঁহাদিগকে
 বাসগৃহ ও নানাপ্রকার আভরণ প্রদান করিলেন ।

পূর্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ প্রবলপ্রভাপাশিত হইলেও প্রজা-
 রঞ্জনবৃত্তি তাঁহাদের অন্তরে বড়ই বলবতী ছিল । প্রজাপুঞ্জ রাজগণকে
 দেবতুল্য জ্ঞান ও পূজা করিত ; আর তাঁহারাও কদাপি যথেষ্টাচারী
 হইতেন না । তাঁহারা স্ত্রদক্ষ সচিববর্গের পরামর্শ না লইয়া কোন
 কার্য্যই করিতেন না ; এবং রাজ্যসম্বন্ধীয় গুরুতর কর্তব্যবিষয়ে রাজ্যস্থ
 প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণেরও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । এই আহুত
 ব্যক্তিগণ স্বাধীনভাবে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতেন এবং রাজ-
 তরে ভীত হইয়া কখন কোনও অন্তায় কার্য্যের পোষকতা করিতেন
 না । রাজগণকেও ইহাদের মতামতের উপর শ্রদ্ধাবান হইয়া চলিতে
 হইত । মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার
 অভিলাষে এই প্রাচীন প্রথানুসারেই স্বরাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তি-
 গণকে আহ্বান করাইয়া সকলের সহিত সম্ভাষনেনে উপস্থিত
 হইলেন ।

অনন্তর সম্ভাষনেনে সকলে সমবেত হইয়া উপবেশন করিলে, মহা-
 রাজ পশ্চিমদিক্ প্রাতিধ্বনিত করিয়া পারিষদবর্গকে আয়ত্ত
 ও তাঁহাদের অভিধিবেশ আকর্ষণ পূর্বক রাজ্যের অবস্থা কীৰ্ত্তন

করিতে লাগিলেন । দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন ; তিনি রাজ্যের কল্যাণ-কামনার শরীরকর করিয়া বহুসংখ্যক বৎসর রাজ্যাশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছেন ; এক্ষণে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে অবসর গ্রহণের অভিলাষী হইয়াছেন । রামচন্দ্র এই গুরুভারবহনের উপযুক্ত কি না, অথবা তদপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠতর আছেন কি না এতৎসম্বন্ধে দশরথ সকলের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন ।

দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণমাত্রেই সভামধ্যে এক তুমুল হর্ষধ্বনি সমুথিত হইল । তৎক্ষণাৎ সকলে সমন্বরে “রামচন্দ্রকেই রাজ্যভার প্রদত্ত হউক” এই কথা মহারাজের নিকট নিবেদন করিলেন, এবং দশরথের সমক্ষে রামের অশেষ গুণকীর্তন করিয়া তাঁহাকেই যৌবরাজ্যে নিৰ্ব্বাচিত করিবার যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করিলেন ।

তখন রাজা দশরথ পারিষদবর্গ ও প্রজাসাধারণের বাক্যে প্রীত হইয়া তদ্বশেই রামের রাজ্যাভিষেকবার্তা বিধোষিত করিয়া দিলেন । আবালবৃদ্ধবনিতা তাহা শ্রবণ করিয়া হর্ষোল্লাসে নিমগ্ন হইল । অযোধ্যানগরী উৎসবতরঙ্গে ভাসমান হইল । সর্বজনপ্রিয় রামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে দিগ্বাঙল পরিপূর্ণ হইয়া গেল । গৃহমালা সুধাধোত ও গৃহচূড়ে বিচিত্র বর্ণের ধ্বজপতাকাসকল উড্ডীন হইতে লাগিল । কেহ কেহ বহুমুখা বসনভূষণ পরিধান করিয়া, কেহ নৃত্য-গীতে নিমগ্ন হইয়া এবং কেহ কেহ বা দরিদ্রগণের মধ্যে ধনরত্ন বিতরণ করিয়া স্ব স্ব হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকটিত করিতে লাগিল । চতুর্দিকেই আনন্দচিহ্ন বিরাজিত, কোথাও নিয়ানন্দের ছায়ামাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না । মহারাজ-দশরথের আদেশে রাজপথসকল পরিষ্কৃত ও সজ্জিত হইল এবং অভিব্যেকোপযোগী

সামগ্রীসকল সংগৃহীত হইতে লাগিল । কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ শুভকণ্ঠে রামচন্দ্রের অধিবাসোচিত সমস্ত ক্রিয়া সমাপন করিলেন । সীতাদেবী স্বামীর সহিত দীক্ষারোপাসনায় প্রায় সমস্ত নিশা যাপন করিলেন এবং উভয়ে প্রশান্তচিত্তে আপনাদের গুরুভার বহনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ।

সীতাদেবী রাজবধূর পদ হইতে রাজমহিষীর পদে সমুদ্রীত হই-
তেছেন এই চিন্তায় কি তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন ? সামান্য
নারীর ছায় সীতার প্রকৃতি ছিল না । আত্মসম্মান ও পদগৌরবের
কথা একটাবারও সীতার মনে সমুদিত হয় নাই । (সীতা আপনার
বিষয় কিছুই ভাবিতেন না । পতির সুখ ও মঙ্গলচিন্তা ব্যতীত অন্য
কোন চিন্তাতে তাঁহার আনন্দ হইত না, বরং সেরূপ চিন্তাকে প্রত্যা-
দেওয়া তিনি পাপ মনে করিতেন । সীতা “আমিষ” ও “আপনষ”
বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং কেবলমাত্র স্বামীর জন্যই জীবনধারণ
করিতেন । স্বামীর প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া সীতা আপনার
স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছিলেন ; সুতরাং স্বামীতে ও তাঁহাতে আর কোন
বিভিন্নতা ছিল না । এই নিমিত্ত পতির সুখ ও আনন্দে সীতা আন-
ন্দিত হইতেন এবং পতির দুঃখ ও বিপদে সীতা স্ত্রিয়মান হইতেন ।
আজ সীতা রাজমহিষী হইবেন বলিয়া তাঁহার মনে বিশেষ কোন
উল্লাস নাই, আর কাল যদি স্বামীর সহিত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তিনি
পথের ভিখারিণী হন, তাহাতেই কি নিজের অল্প তাঁহার কোন কষ্ট
হইবে ? তবে ইহা সত্য বটে যে, স্বামীর মনোগত ভাবের সহিত
তাঁহারও মনোগত ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল । এই নিমিত্ত রামের
হৃদয়ে যখন যে ভাব তরঙ্গান্বিত হইত, সীতার হৃদয়েও তখন সে
ভাবের উচ্ছ্বাস বহিত । আজ হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা প্রেমময়
জীবিতনাথ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালনরত্নে দীক্ষিত হইবেন,

এই চিন্তার সীতার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছিল, রাজমহিষী হইবেন বলিয়া সীতার কিছুমাত্র আনন্দ হয় নাই। সীতার চরিত্রগত এই বিশেষত্বটি স্মরণ রাখিলে, সীতার মাহাত্ম্য বুঝিতে বড় বিলম্ব হয় না।

রাত্রি প্রভাত হইতেছিল। এই শুভদিনে রামচন্দ্র রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইবেন। সুষুম্না নগরী এতক্ষণ মৃতের স্থায় নিষ্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট ছিল, ক্রমে ক্রমে যেন তাহাতে জীবনী শক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। বিহঙ্গমকুল মঙ্গলময় কোলাহল করিয়া উঠিল। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে ঈশ্বরপরায়ণ সাধুমহাত্মাগণের কণ্ঠ হইতে স্তুতি গান নিঃসৃত হইয়া বায়ুমণ্ডল বিকম্পিত করিল। জনসাধারণ ধীরে ধীরে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিনের আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করিল। কল্লোলময় সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের স্থায় আবার সেই মহানগরী হইতে হর্ষকোলাহল সমুথিত হইতে লাগিল। বন্দীগণ রামচন্দ্রের স্তুতিগান আরম্ভ করিল। দম্পতীযুগল সমস্ত নিশা ঈশ্বরপূজায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন; প্রভাতে শুচি ও নিৰ্ম্মলচিত্ত হইয়া প্রশান্তমনে তাঁহারা রাজ্যাভিষেকের নির্দিষ্টকাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্য আসিয়া রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন, এবং মহারাজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন এই কথা নিবেদন করিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন।



চতুর্থ অধ্যায় ।

সংসারে এক জাতীয় লোক এমন অদ্বন্দ্ব প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদিগকে মন্দ দৃষ্টান্ত দ্বারা কখন অসৎ করিতে হয় না, তাহারা স্বভাবতই অসৎ। যেখানে যাহা কিছু কুৎসিৎ ও ঘৃণ্য আছে, তদ্বারাই তাহারা আপনাদের প্রকৃতি পুষ্টি করিয়া থাকে; সমস্ত দিলে তাহারা তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়, অথবা আপনাদের দূষিত নিশ্বাসবায়ু দ্বারা তাহার সৌন্দর্য ও পবিত্রতা নষ্ট করে। এই প্রকৃতির লোকেরা সৌন্দর্য ও পবিত্রতার একান্ত বিরোধী। সৌন্দর্য তাহারা দেখিতে পার না, পবিত্রতা তাহারা বুঝিতে পারে না; তাহারা চতুর্দিকে কেবল আপনাদের আবিল হৃদয়েরই প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। পরের সুখ ও আনন্দ দেখিলে ঈর্ষানল তাহাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়, নিঃশঙ্ক সাধুতা দেখিলে তাহারা আপনাদের কলুষিত করুণা দ্বারা তাহা কলঙ্কিত করে, এবং অগতে অসাধুতা ও পাপের রাজ্য বৃদ্ধি হইতে দেখিলে তাহাদের বিকট উল্লাসের আর সীমা থাকে না। কেহ অপকার না করিলেও তাহারা তাহার অপকার করে এবং স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে পরের সুখ দুঃখের প্রতি কদাচ দৃষ্টিপাত করেন না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই প্রকৃতির লোকেরা মানবসমাজের কলঙ্কস্বরূপ এবং ইহাদের দ্বারাই মানবের সমুদয় অকল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে।

মহুয়া এই অদ্বন্দ্ব প্রকৃতির রমণী। মহুয়া কুজা ও বৃক্ষ, সুতরাং দেখিতে অতিশয় কুরুপা। বাদ্যীক তাহার অন্তরের পরিচয় দিবার

জন্মই যেন তাহাকে অতিশয় কুংসিং বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এই কুন্ডা মহিষী-কৈকেয়ীর পরিচারিকা ; কৈকেয়ী পিতৃালয় হইতে ইহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং মহারা কৈকেয়ীর বড়ই শুভাকাজক্ষী । কৈকেয়ী যে উপায় অবলম্বন করিলে, মহারাজের প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন, মহারা তাঁহাকে সে উপদেশ প্রদান করিত । কৈকেয়ী রাজকন্যা, সুতরাং তাঁহাকে স্বভাবতই উন্নতমনা মনে করা অসম্ভব নহে । বাস্তবিক তিনি অতিশয় উচ্চপ্রকৃতির নারী না হইলেও, নারীসাধারণের অপেক্ষা কোন মতেই নিকৃষ্টতর ছিলেন না । তিনি নীচতাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না । স্বয়ং সদস্য বিষয়ের বিচার করিয়া তিনি কখন কোনও কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না ; এই নিমিত্ত তিনি মহারাজ উপদেশের উপর অতিশয় নির্ভর করিতেন এবং সর্ববিষয়ে তাহার কূটবুদ্ধি দ্বারাই আপনাকে পরিচালিত হইতে দিতেন । কৈকেয়ীর ইহাতে কোন উপকার না হইয়া বরং অপকারই অধিক হইয়াছিল । সে বাহা হউক, এই মহারা অতিশয় বুদ্ধিশালিনী ; তাহার বুদ্ধি দূর-দর্শিনী ও স্বল্পগামিনী । কৈকেয়ী আপনার মঙ্গলামঙ্গলের কথা বড় চিন্তা করিতেন না ; কিন্তু মহারাজ প্রয়োচনাতেই যুবতী মহিষী বৃদ্ধমহারাজকে আপনার করায়ত্ত করিয়াছিলেন । বাস্তবিক, দশরথ অন্তান্ত মহিষী অপেক্ষা কৈকেয়ীর প্রতিই সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতেন । কোশল্যা তাঁহার মায়া ছিলেন বটে, কিন্তু কৈকেয়ীই তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী ।

মহিষীগণ অন্তর্বর্তী হইলে মহারাজ মনে একটা গুরুতর আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল । কৈকেয়ীর পুত্র সর্বাঙ্গে সজাত না হইয়া অল্প কোন মহিষীর পুত্র জন্মিলে কৈকেয়ীর রাজমাতা হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না ! মহারাজ বাহা আশঙ্কা, হৃর্ভাগ্যক্রমে তাহাই

ঘটিয়া গেল । ভরত জন্মাহুত্রে রাজার দ্বিতীয় পুত্র হইলেন । কৈকেয়ী সুশীল পুত্র লাভ করিয়া আনন্দিত হইরাছিলেন, মহারাজার দূরদর্শননিবন্ধন সে আনন্দসম্ভোগে কিছুমাত্র বঞ্চিত হন নাই । তিনি মহারাজের অন্যান্য পুত্রগণকেও নিজ পুত্রের ন্যায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ রামের সাধুতা সত্যপরায়ণতা ও ব্রাহ্মবংশলতা দেখিয়া তাঁহার গুণের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন । রাম যখন সর্বজনপ্রিয় ছিলেন, তখন কৈকেয়ীর স্নেহভাজন হইবেন না কেমন ? এ পর্য্যন্ত রামের প্রাতি কৈকেয়ীর মনে কোন বিরুদ্ধভাবই উৎপন্ন হয় নাই । হুষ্ঠা মহারা হলাহল উদগীরণ করিয়া এখনও কৈকেয়ীর সরল মন বিধাক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই । মহারা বুদ্ধিমতী, তাই স্নযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল এমন সময়ে দৈবক্রমে সেই স্নযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল ।

রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র, অযোধ্যানগরী হইতে এক মহান্ উৎসবকোলাহল সমুথিত হইয়াছিল । মহারা সেই কোলাহলের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত এক উচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিল, এবং চতুর্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিতে পাইল যে, গৃহে গৃহে ধ্বজপতাকাসকল উড্ডীন হইতেছে; রাজপথসকল পরিষ্কৃত জলসিক্ত ও পুষ্পমালায় সমলঙ্কৃত হইয়াছে; নগরীকে আলোকমালায় সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত পথের উভয়পার্শ্বে বৃক্ষাকার আলোকস্তম্ভসকল সংস্থাপিত হইয়াছে; দেবগৃহ সকল সুধাধবলিভ হইতেছে এবং নাগরিকেরা বিচিত্র বস্ত্র মালা ও অলঙ্কার ধারণ করিয়া মহোৎসবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে । মহারা এক খাত্তীকে সম্মুখে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে তাহাকে এই উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল ।

খাত্তী মহরাকে প্রকৃত সংবাদ জ্ঞাপন করিল । পরদিন প্রভাতে রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কুজার আশা-

প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ হইল। এতদিনে কৌশল্যাকুমার রামচন্দ্র তবে সভ্যসভ্যই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিলেন, এতদিনে তবে কৈকেয়ীর সৌভাগ্যরবি অন্তমিত হইতে চলিল ও রাজকুমার ভরতের ভাগ্যে পরাবীনতাই নির্দিষ্ট হইল। কুজার ক্ষুদ্র হৃদয়রাজ্যে এক ক্ষুণ্ণ বিপ্লব উপস্থিত হইল, চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে ছুটী অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষে ভরত ও কৈকেয়ীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বোধ হইল। রাজি প্রভাত হইলেই রাম রাজা হইবেন; রাম রাজ-সিংহাসনে একবার আরোহণ করিলে, আর কেহ কি তাঁহাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হইবে? তবে কি ভরতের আর কোন উপায় নাই? সহসা বৃদ্ধা স্থির হইল, সহসা তাহার কুটিল চক্ষু সমুজ্জল ও মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল, বোধ হইল যেন সে অন্ধকার মধ্যে আলোক দেখিয়াছে, নৈরাশ্রের মধ্যে আশা পাইয়াছে! কুজা আর কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অস্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

মহারা কৈকেয়ীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই বলিল “কৈকেয়ি, তুমি নিজ স্বপ্ন ও সৌভাগ্যচিন্তাতেই নিমগ্ন আছ; তোমার গৃহের বহির্ভাগে যে সকল ক্ষুদ্রতর ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহার কি কোন সংবাদ রাখ? তুমি আপনাকে রাজার প্রিয়তমা মহিষী মনে করিয়াই সর্বদা গর্ব করিয়া থাক, কিন্তু এতদিনে তোমার সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে।” কৈকেয়ী মহারার ব্যঙ্গসূচক এই অভিনব বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া তাহাকে সমস্ত রহস্তই প্রকাশ করিতে বলিলেন। মহারার মুখে রামের রাজ্যাভিষেকবার্তা শ্রবণ করিয়া সরলহৃদয়া কৈকেয়ী হর্ষে মুহমান হইলেন; তিনি প্রীতিভরে তৎক্ষণাৎ নিজ অঙ্গ হইতে এক বহুমূল্য ভূষণ উন্মোচন করিয়া মহারাকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। স্থূলবুদ্ধি কৈকেয়ীর এই অপ্রত্যাশিত আচরণ দর্শন করিয়া মহারা ক্ষোভে ও রোষে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। কিঙ্করী

কৈকেয়ীপ্রদত্ত ভূষণও দূরে নিক্ষেপ করিয়া মহিষীর মন্বন্ধির যথেষ্ট নিন্দা করিল। মহারা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, রাম রাজ্যোখর হইলে তাঁহার ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্টই অধিক হইবে, ভরত রামের অধীন হইয়া ভৃত্যের ভায় রাজ্যে অবস্থান করিবেন, এবং কৈকেয়ীকেও অতঃপর কোশল্যা ও সীতার মনস্তৃষ্টি করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। অতএব মহিষী যদি আপনার মঙ্গলকামনা করেন, তাহা হইলে রাম বাহাতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত না হইয়া ভরতই তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তিনি তাহারই উপায়বিধান করিতে প্রাণপণে যত্ন করুন। কৈকেয়ী রামের প্রতি স্নেহবশতঃ কুজার ঘৃণিত প্রস্তাবে প্রথমে যথেষ্ট অশ্রদ্ধা ও অনাদর প্রকাশ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে মহারার প্রবল যুক্তিবলে তাঁহার সাধুভাব ও সাধুচিন্তা কোথায় তিরোহিত হইয়া গেল। অসাধুদর্শিনী কুজা মহিষীকে আপনার দূরভিষন্ধিরই অনুবর্তিনী করিল; মহিষীও স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে স্বর্ণলতা কালভূজস্বরূপে পরিণত হইয়া গেল।

কৈকেয়ী কহিলেন “মহারে, তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী; উপস্থিত বিপদ হইতে যেক্রমে মুক্ত হইতে পারি, তুমিই তাহার উপায় বিধান কর। মহারাজ আমার পুত্র ভরতকে রাজা না করিয়া যদি রামকেই রাজ্যভার প্রদান করেন, তাহা হইলে শপথ করিতেছি, আমি আর এ জীবন রাখিব না।” মহারা কৈকেয়ীর বাক্যে মনে মনে ভুট্ট হইয়া বলিল “মহিষি, তুমিই ইহার সম্যক উপায় অবগত আছ; কিন্তু বোধ হইতেছে তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ। বহুকাল হইল, মহারাজ সম্বর-নামা এক অশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কতবিক্রমজনক হইয়াছিলেন; তুমিই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সবিশেষ যত্ন ও গুজবদ্বারা তাঁহাকে স্তম্ভ করিয়াছিলে। মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তৎকালে তোমাকে দুইটি অভিলষিত বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া-

হিলেন। কিন্তু তুমি তখন সে বর ছইটি চাহিয়া লও নাই, বখন অধিকারক হইবে তখনই চাহিয়া লইবে বলিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি মহারাজের নিকট সেই বরের উল্লেখ করিয়া প্রথমবরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস, এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা কর। রাম অতিশয় লোকপ্রিয় ইহা সত্য বটে; কিন্তু বুদ্ধিমান ভরত চতুর্দশ বর্ষের মধ্যে প্রজাগণকে আপনার বশতাপন্ন করিতে সক্ষম হইবেন সন্দেহ নাই। অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তেই ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্বক অশ্রুজলে ধরাতল অভিষিক্ত কর। মহারাজ নিশ্চয়ই তোমাকে দেখিতে আসিবেন। সেই সময়ে কৌশলক্রমে তাঁহাকে সত্যাপশে বদ্ধ করিয়া বর প্রার্থনা করিবে; ইহাতে অবশ্যই তোমার ইষ্টসাধন হইবে।” মহারাজ এই পরামর্শ শ্রবণপূর্বক কৈকেয়ী আহ্লাদে গদগদ-চিত্ত হইলেন, এবং তাহার গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন ও বহু ধনরত্ন প্রদান করিলেন।

রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের অনুমতি প্রদান পূর্বক হৃষ্টমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সর্বাপ্ত কৈকেয়ীকে এই আনন্দ-সমাচার জ্ঞাপন করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। রাজ্ঞী ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন প্রতিহারীর মুখে এই কথা শ্রবণ পূর্বক দশরথ চিন্তাকুল-মনে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সত্যসত্যই কৈকেয়ী মলিন বসন পরিধান পূর্বক ধূলিশয্যায় শয়না আছেন এবং অশ্রুজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছেন। প্রিয়তমা মহিষীর এই অসম্ভাবিত অবস্থা দর্শনে মহারাজ অতিশয় বিচলিত হইলেন। তিনি স্নেহপূর্ণ স্তম্ভুর বাক্যে কৈকেয়ীর ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু অভিমানিনী স্বামীর প্রশ্নের কোন উত্তরই প্রদান করিলেন না। মহিষীর শরীর কি অস্থির হইয়াছে, কেহ কি তাঁহার অবমাননা করিয়াছে,

অথবা তাঁহার প্রতি কি কোন কর্তব্যের ক্রটি হইয়াছে ? রাজা ব্যাকুল ভাবে বারম্বার এইরূপ প্রশ্ন করিলেও কৈকেয়ী নিরুত্তর रहিলেন । কিয়ৎকালপরে তিনি বাম্পাকুললোচনে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন “নরনাথ, আমার শরীর অসুস্থ হয় নাই, আমাকে কেহ অবজ্ঞা করে নাই এবং আমার প্রতি বিশেষ কোন কর্তব্যেরও ক্রটি হয় নাই ; কিন্তু তোমার কাছে আমার কোন প্রার্থনা আছে, তুমি যদি তাহা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে আমার মনোমালিন্য দূরীভূত হইতে পারে, অন্তথা আমি তোমার সমক্ষেই এই প্রাণ বিসর্জন করিব ।” রাজা মহিষীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সহাস্রবদনে শপথ করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন । সুচতুরা কৈকেয়ীও অবসর বুঝিয়া সত্যব্রত রাজাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিলেন এবং হিতৈষিনী মন্ত্রীর উপদেশক্রমে যে বিষ উদ্যীরণ করিলেন, তাহাতে কিয়ৎকাল মধ্যে সেই বিশাল রাজসংসার জর্জরিত হইয়া শ্মশানভূম্যে ভীষণ আকার ধারণ করিল ।

কৈকেয়ী সম্বরবৃদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন “রাজন্, তুমি তৎকালে আমার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া আমার দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে ; আমি তখন বর প্রার্থনা করি নাই, উপযুক্ত সময়ে প্রার্থনা করিব বলিয়াছিলাম, অদ্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি । প্রথম বরে কল্যাই তুমি রামচন্দ্রকে চতুর্দশবর্ষ দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত কর, আর দ্বিতীয় বরে রামের পরিবর্তে আমার পুত্র প্রাণাধিক ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর । তুমি আপনার পূর্বপ্রতিজ্ঞা পালন করিয়া সত্যের মর্যাদা রক্ষা কর, এক্ষণে তোমার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা ।”

কৈকেয়ীর এই নিদারুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দশরথ বজ্রাহত অথবা ভূতাবিষ্টের স্থায় মহসা নিশ্চেষ্ট হইলেন । তাঁহার মুখমণ্ডল

বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি জাগ্রত আছেন কি স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কোভে ও রোবে তাঁহার বাক্শক্তি রুদ্ধ এবং অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্রাবিত হইল। তিনি বহুক্ষণের পর সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে যারপরনাই ভৎসনা করিতে লাগিলেন; তিনি স্বর্ণলভ্যত্বে সেই ভুজঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াছেন; রাম সেই পাপীয়সীর কি অপরাধ করিয়াছেন? রাম যে আপন জননী অপেক্ষাও সেই দুর্কৃত্তাকে সমধিক ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। রামনির্বাসনরূপ অমঙ্গল বাক্য উচ্চারণ করিতে কৈকেয়ীর পাপরসনা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন? রাম ব্যতীত দশরথ যে মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিবেন না! কৈকেয়ী প্রসন্ন হউন, কৈকেয়ী অস্ত্র কোন বর প্রার্থনা করুন, রাজা তাহা পূর্ণ করিবেন।

দ্বীজাতি স্বভাবতই করুণাময়ী। তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্র উচ্চতাবের লীলাভূমি, ধর্ম্মবলে বলবতী হইলে তাঁহাদিগকে মূর্ত্তিময়ী পবিত্রতা বলা যাইতে পারে। নিঃস্বার্থতাই তাঁহাদের চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এই নারীজাতি যখন নীচবাসনা ও অধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহারা অসাধ্যের সাধন এবং দুর্কর্ম্মেরও অমুষ্ঠান করিয়া থাকে, সংসারে অশান্তি অপবিত্রতা ও অনর্থ আনয়ন করে এবং হৃদয়ে কোমলতার পরিবর্তে কঠোরতা, দয়ার পরিবর্তে নির্দয়তা ও নিঃস্বার্থতার পরিবর্তে স্বার্থপরতা পোষণ করে। কৈকেয়ী জঘন্ম স্বার্থপরতার অকুণ্ঠিত্তি হইয়া বিমূঢ় রাজার বিলাপ ও ভৎসনাবাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। রাজার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হইল না, বরং তিনি বৃদ্ধ নরপতির শোকপীড়িত হৃদয়কে অসহ উপহাস ও বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা মোহা-
হর হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিবংশও ষট্টরাহিল। তিনি

পতিত, কখনও বা শোকে লুপ্তসংজ্ঞ এবং কখন কখন চেতনা লাভ করিয়া ক্ষিপ্তচিত্তের ভ্রায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । কিন্তু ছুটা কৈকেয়ীর কঠিন হৃদয় কিছুতেই দ্রব হইল না । এইরূপে সেই কালরজনী অতি-বাহিত হইয়া গেল ।

যামিনী প্রভাত হইলে রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইল । বশিষ্ঠাদি ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ সভাতে সমবেত হইলেন । কিন্তু মহারাজ তখনও সেখানে উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া তাঁহারা স্মমন্ত্রকে অন্তঃপুরমধ্যে প্রেরণ করিলেন । স্মমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজকে প্রফুল্লহৃদয়ে গাত্ৰোত্থান এবং রামচন্দ্রের অভিষেকরূপ মঙ্গলোৎসব সম্পাদন করিতে প্রার্থনা করিলেন । দশরথ স্মমন্ত্রের সেই বাক্যে অতিশয় কাঁড় হইলেন এবং সজলনয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন “স্মমন্ত্র, তোমার বাক্য আমার অধিকতর মর্মবেদনা হইতেছে।” মহারাজের মুখে সহসা এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া স্মমন্ত্র বিস্মিতমনে সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ অপস্থত হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে কৈকেয়ী তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন “স্মমন্ত্র, মহারাজ রামাভিষেকের হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন ; এক্ষণে তিনি পরিশ্রমে যৎপরোনাস্তি শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছেন ; অতএব তুমি ত্বরিতপদে একবার রামচন্দ্রকে এইস্থলে আনয়ন কর।” স্মমন্ত্র রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এবং রাজারও সেইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রামের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন ।

রামচন্দ্র জানকীর সহিত কুশলব্যায় নিশাযাগন করিয়া প্রভাতো-
চিত ক্রিয়াদি সমাপন পূর্ব্বক পবিত্র আসনে স্থখে উপবিষ্ট আছেন,
এমন সময়ে স্মমন্ত্র গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন
করিলেন । রাম ও জানকী উভয়েই মনে করিলেন, মহারাজ বৃদ্ধি

তাঁহাকে রাজ্যাভিষেকের নিমিত্তই আহ্বান করিতেছেন। সে বাহা হউক, রাম পিত্রাজ্ঞা শুনিয়া অনতিবিলম্বে স্তম্ভসহ পিতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে মহারাজ দেবী কৈকেয়ীর সহিত দীনভাবে ও শুষ্কমুখে পর্যাঙ্কে উপবিষ্ট আছেন! রাম অগ্রে পিতার চরণবন্দন পূর্বক কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। দশরথ রামকে দেখিয়াই “রাম” এই শব্দ উচ্চারণ পূর্বক সহসা শোকাচ্ছন্ন হইলেন। পিতৃবৎসল রাম পিতার ঈদৃশী দীনদশা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও বিচলিত হইলেন। তিনি শুষ্কমুখে ব্যাকুলচিত্তে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মাতঃ, পিতৃদেব আজ আমাকে দেখিয়া সহসা শোকাভিভূত হইলেন কেন? আজ তিনি পূর্বের ন্যায় আমার সহিত প্রফুল্লমনে বাক্যালাপ করিতেছেন না কেন? তিনি কি অসুস্থ হইয়াছেন? আমি কি তাঁহার কোন অপ্রিয়সাধন করিয়া অসন্তোষের কারণ হইয়াছি? আপনি সকল কথা সবিশেষ বলুন, শুনিতে মম বড় ব্যাকুল হইয়াছে, এবং মহারাজের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইতেছে।”

নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন “বৎস, তোমার পিতা অসুস্থ হন নাই, তুমি তাঁহার কোন অসন্তোষেরও কারণ হও নাই; কিন্তু ইনি মনে মনে কোন সঙ্কল্প করিয়াছেন, লজ্জাবশতঃ তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি মহারাজের অতিশয় প্রিয়, স্ততরাং তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইহঁর বাক্যক্ষুণ্ণ হইতেছে না। রাজা তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না বলিয়া তুমি হুঃখিত হইও না। তোমার পিতা আমার নিকট কোন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, তুমি যদি তাহা পালন করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে তাঁহার সত্যরক্ষা হয়, আর আমিও তোমাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলি।”

রাম পিতার আদেশে অগ্নিতে অস্প্রদান করিতে পারেন এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেও পারেন, সুতরাং কৈকেয়ীর এই বাক্যে তিনি অতিশয় মর্মান্বিত হইয়া বলিলেন “দেবি, পিতা আমার বাহ্য আদেশ করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি তাহাই পালন করিব, আপনি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। এক্ষণে আমার প্রতি তাঁহার আদেশ কি তাহাই বলুন এবং মহারাজকে প্রসন্ন করুন।”

তখন নির্দয়া কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বরসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার হৃষ্টমনে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। রামকে চতুর্দশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে এবং তাঁহার পরিবর্তে ভরত রাজসিংহাসন অধিকার করিবেন। কৈকেয়ী মহারাজের নিকট এই বরদ্বয় প্রার্থনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি একদিকে রামের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ এবং অপরদিকে ধর্ম্মভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শোকাবল হইয়াছেন। রাম কর্তব্যপরায়ণ পুত্রের জ্ঞান পিতৃসত্য পালন করিতে যত্ববান হউন, এবং অনতিবিলম্বে জটাবকুল ধারণ পূর্বক বনগমন করুন; অন্তথা মহারাজের শোকাপনোদন হইবে না। রাম অবোধ্য পরিভ্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান না করিলে তিনি অন্নজল স্পর্শ করিবেন না; অতএব রাম সত্বর হউন।

রাম কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্বক কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন “দেবি, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হৃষ্টমনে প্রিয়তম ভরতকে ধন, রত্ন, রাজ্য, প্রাণ এবং এমন কি সীতা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারি; যখন স্বয়ং পিতৃদেব আমাকে রাজ্য পরিভ্যাগে আদেশ করিতেছেন, তখন আর কথা কি? আপনি মহারাজকে প্রসন্ন করুন; আমি এতদগোঁই জটাবকুল ধারণ পূর্বক দণ্ডকারণ্য অভিযুগে যাত্রা করিব; কেবল জননী কৌশল্যাদেবীকে আশ্রিত ও জানকীর সহিত একবার সাক্ষাৎকার করিতে যাকিছু

বিলম্ব হইবে মাত্র । মহারাজ এতন্নিমিত্ত ঈদৃশ শোকাবল হইয়াছেন কেন ? পিতৃদেব নিজমুখে আমাকে এই আদেশ প্রদান করিলে চরিতার্থ হইতাম । যাহা হউক, আমি আপনায়ই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এতদ্বৎই অরণ্যযাত্রা করিতেছি ।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র বৃদ্ধ নরপতির পাদবন্দন ও কৈকেয়ীর নিকট প্রসন্নচিত্তে বিদায় গ্রহণ পূর্বক কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । প্রথম হইতেই লক্ষণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ; তিনি রামের বনবাসের কথা শুনিয়া ক্রোধে হতাশনের স্থায় প্রজ্জলিত হইতে লাগিলেন । রাম বিদায় গ্রহণ করিলে বৃদ্ধ নরপতির শোকসমুদ্র পুনর্বার উদ্বেল হইয়া উঠিল । তিনি “হা রাম, হা রাম” বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে মুচ্ছাপন্ন হইলেন ।

বৃদ্ধ রাজা বিলাপ করিতে থাকুন, ইত্যাবসরে আমরা একবার একটা গুরুতর বিষয় বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করি । দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া কোন সময়ে দুইটি বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । দুর্ভাগ্যক্রমে পরে সেই অঙ্গীকারই দশরথের কালস্বরূপ হইয়া উঠিল । সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া রাজা প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর পুত্রকে বনবাস দিতে বাধ্য হইলেন ! কৈকেয়ী দশরথের বশবর্ত্তিনী স্ত্রী মাত্র ; চেষ্টা করিলে কি তিনি মহিষীর এই অভ্যায় প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না এবং এরূপ প্রার্থনার অসম্মত হইয়া একবার তাঁহার অসত্যপরাধ হওয়াও কি বরং ভাল ছিল না ? স্ত্রীর নিকট একবার মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইলেই কি বিশেষ দোষ হইত ? রামায়ণ পড়িতে পড়িতে কোন কোন পাঠকের মনে হয়ত এবম্বিধ নানাপ্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে এবং দশরথের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধও সমুৎপন্ন হইতে পারে । কিন্তু যখন মনে করা যায় যে, দশরথ একজন তেজস্বী ও সত্যব্রত রাজা ছিলেন, এবং একমাত্র

সত্যপালনের নিমিত্তই তিনি প্রিয়তম পুত্র ও এমন কি তাঁহার প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই, তখনই আমরা তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই, তখনই বুঝিতে পারি দশরথ যথার্থই ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন । যাহারা ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান্, তাঁহারা কি গৃহে কি বহির্ভাগে সর্বত্রই সত্যের মর্যাদা রক্ষা করেন । জগৎ যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহারা সত্য ও ত্রায়ের রাজ্যকে জয়যুক্ত করিতে চেষ্টা করেন । আর জী হইলেই কি তিনি স্বামীর চক্ষে নিকৃষ্ট ও হেয় হইয়া থাকেন ? তাঁহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করা যায় তাহা কি রক্ষণীয় নহে ? ইহা ব্যতীত আমাদের আরও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পুরাকালে নারীজাতি পুরুষগণকর্তৃক সমুচিত সংকৃত ও সম্মানিত হইতেন । “দেবি” “আর্য্যো” প্রভৃতি সম্বোধনমুচক শব্দ-প্রয়োগই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ । এস্থলে আমরা পিতৃবৎসল রাম-চন্দ্রেরও অসাধারণ পিতৃভক্তির কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি-তেছি না । পিতৃভক্তির এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল এবং অদ্বিতীয়ও বটে । যিনি এক পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত অগ্নানবদনে করতলগত সমস্ত রাজ্যের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসরূপ কঠোর ব্রত আলিঙ্গন করিতে পারেন, তিনি যে সাধারণের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া অদ্যাপি জগতে পূজিত হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

রাম কৌশল্যার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন জননী তাঁহার মঙ্গলকামনায় দেবপূজায় নিযুক্ত আছেন । রাম জননীর চরণে প্রণত হইলে, তিনি প্রিয়তম পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আশ্রয় করিলেন এবং আজ রাম রাজা হইবেন এই কথা ভাবিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । রাম জননীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন “মা, আজ তোমার আনন্দের কোন কারণ নাই ; তোমার, সীতার ও লক্ষ্মণের বড় বিপদ উপস্থিত হইয়াছে ।

পিতৃদেব জননী কৈকেয়ীর প্রার্থনার ভরতকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া আমাকে চতুর্দশবর্ষ বনবাস আদেশ করিয়াছেন ।” এই বাক্য শ্রবণমাত্র কোশল্যা ছিন্নমূল লতার স্তায় সহসা ভূমিতলে পতিত হইলেন । রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে বহুকষ্টে তাঁহার চৈতন্ত্যসম্পাদন করিলেন । কোশল্যা শোকে ত্রিয়মান হইয়া বহুতর বিলাপ ও নিজ অদৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিলেন । মুহূর্ত্তমধ্যে রামনির্কাসনসংবাদ অন্তঃপুরমধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল, এবং চতুর্দিক্ হইতে এক হাহাকার শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না । লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাম ও কোশল্যার সমক্ষেই বৃদ্ধনরপতির সমুচিত নিন্দা করিতে লাগিলেন । মহারাজের বুদ্ধিব্রংশ ঘটিয়াছে, জীপসায়ণ রাজার আদেশপালনের আবশ্যকতা নাই । লক্ষ্মণ তদগেই ধনুর্ধারণ পূর্বক দশরথ, কৈকেয়ী ও ভরতপ্রভৃতি বিপক্ষগণকে বিনাশ করিবেন । লক্ষ্মণ সহায় থাকিলে রামের বিরুদ্ধে কে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে ? সুধীর রাম লক্ষ্মণের বাক্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মৃদুমধুর তিরস্কার করিলেন । পিতাই সাক্ষাৎ ধর্ম; পিতা আকাশ হইতেও মহত্তর; পিতার অপেক্ষা শুকতর ব্যক্তি একগতে আর কে আছে ? পিত্রা-দেশ ও পিতৃসত্যপালন দ্বারা তাঁহার ধর্মরক্ষা করিতে না পারিলে রামের জীবনধারণে প্রয়োজন কি ? ভরত সুশীল ও ভ্রাতৃবৎসল; ভরত রামলক্ষ্মণের কি অপকার করিয়াছেন ? দেবী কৈকেয়ী জননী; তাঁহার নিন্দা করিতে নাই । লক্ষ্মণ রামের তিরস্কারবাক্যে লজ্জিত হইলেন । রামের স্থিরপ্রতিজ্ঞাদর্শনে কোশল্যা বিলাপ করিতে লাগিলেন । কোশল্যা রামকে না দেখিয়া কণকালও জীবিত থাকিবেন না; রাম যদি একান্তই বনগমন করেন তবে তিনিও তাঁহার সহিত অরণ্যযাত্রা করিবেন । রাম জননীকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন, বলিলেন স্বামী বর্ত্তমানে দ্বীকে স্বামিপরিত্যাগ

করিতে নাই, তাহাতে অধর্ম ও অপযশ উভয়ই সঞ্চিত হয় । পতি-
শ্রদ্ধা হইয়াই জীজ্ঞাতির ধর্ম । রাম বনগমন করিলে মহারাজ শোকাবুল
হইবেন ; কোশল্যা সন্নিকটে না থাকিলে তাঁহার পরিচর্যা কে
করবেন ?

রামকে বনগমনে একান্তই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া কোশল্যা প্রণত
পুত্রকে সজলনয়নে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং সর্ব্বত্র তাঁহাকে সুস্থ ও
কুশলে রাখিতে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন । রাম জননীর
পাদবন্দন পূর্ব্বক লঙ্কণের সহিত তাঁহার অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া
সীতার আবাসে প্রবেশ করিলেন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

মানুষ তীব্র যন্ত্রণা ও দারুণ মনঃকষ্ট প্রাপ্ত হইলেও অগ্নানবদনে তাহা সহ্য করিতে পারে । কিন্তু সেই অবস্থায় সে যদি কোন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হয়, অথবা কোন ব্যক্তি যদি তৎকালে সহানুভূতিসূচক কোন বাক্যপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও আর তাহার আত্মসংযম রক্ষিত হয় না, মানবের দৌর্বল্য তৎক্ষণাৎ অশ্রুজলরূপে পরিষ্ফুট হইয়া পড়ে ।) রাম এতক্ষণ আপনার মনোভাব সংগোপন করিতে সমর্থ হইরাছিলেন । দশরথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কৌশল্যার অস্তঃপুরে প্রবেশের সময় এবং কৌশল্যার অস্তঃপুর হইতে বহির্গমনের সময়ও তাঁহার মুখমণ্ডলে কেহ কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই । কিন্তু যেমন তিনি সীতার আবাসের সন্নিকট হইলেন, অমনই তাঁহার সংরুদ্ধ শোকা-বেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল । রামের লোচন অশ্রুপূর্ণ হইল, মুখমণ্ডল সহসা নিম্নত হইয়া গেল, এবং হৃদয়রাজ্যে নানাব্যবহারে তুমুল বিস-ম্বাদ আরম্ভ হইল । সীতাদেবী রাজধর্মের অনুরূপ আচার অবলম্বন পূর্বক হৃষ্টমনে কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া প্রাতিমুহূর্তে স্বাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম লজ্জাবনত-বদনে তথায় প্রবেশ করিলেন । জানকী প্রিয়তমকে চিন্তিত ও শোক-সন্তপ্ত দেখিয়া কম্পিতকলেবরে উদ্ভিত হইলেন এবং ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“নাথ, সহসা কেন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত ? আজি-কার শুভদিনই তোমার রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি এইরূপ

বিমনা হইয়াছ ? যেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল আবৃত নাই কেন ? ধবল চামরযুগল লইয়া ভৃত্যেরা কি নিমিত্ত তোমার বীজ্ঞন করিতেছে না ? সূত মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গলগীতি গান করিয়া আজ কৈ তোমার স্তুতিবাদ করিল ? বেদপারগ বিপ্রেরা নানান্ত্রে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই ? গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান পারিষদগণ বেশভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না ? সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান্ অশ্বে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না ? সুদৃশ্য সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই ? পরিচারকেরা সুবর্ণনির্মিত ভদ্রাসন স্বন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে অগ্রে আগমন করিল ? যখন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, তোমার মুখশ্রী কেন মলিন হইল ? কেনই বা তোমার সেইরূপ-মধুর হাস্য দেখিতে পাই না ?” (২।২৬)

রামচন্দ্র বৈদেহীর ঈদৃশ করুণ বিলাপবাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, “জানকি, পূজ্যপাদ পিতা আমাকে চতুর্দশবর্ষ অরণ্যে নির্বাসিত করিয়াছেন।” এই বলিয়া তিনি প্রিয়তমার কাছে ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

তারপর তিনি বলিলেন “প্রিয়ে, আমি এক্ষণে বিজ্ঞন বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমার একবার দেখিতে আসিলাম।”

রাম উপদেশহলে সীতাকে আরও কহিতে লাগিলেন, “জানকি, আমি পিতার অঙ্গীকার রক্ষার্থ এক্ষণে বনে চলিলাম, কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিলে তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোথান পূর্বক বিধানানুসারে দেবপূজা করিয়া আমার সর্বাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী অতি হৃৎখিনী, বিশেষতঃ তাঁহার শেষদশা উপস্থিত, তুমি

কেবল ধর্মের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সেবা ভক্তি করিবে। আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একরূপ স্নেহ ও ভক্ত্যভ্যাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এই দেশ ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাঁহার অপকার করিও না। সৌজন্য ও যত্নে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে মহীপালগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন। তাঁহার আশ্রয় নার ঔরসজাত পুত্রকেও অহিতকারী দেখিলে পরিত্যাগ করেন; কিন্তু স্নযোগ্য হইলে একজন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া থাকেন। জানকি, আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি অরণ্যে চলিলাম; আমার অহুরোধ এই, আমি তোমায় যে সকল কথা কহিলাম, তাহার একটীও যেন বিফল না হয়।” (২১২৬)।

(জানকী মুহূর্ত্তকাল পূর্বে কোথায় রাজমহিবীর পদে উন্নীত হইতেছিলেন, আর কোথায় প্রাণেশ্বর রাজকুমার জটাবন্ধন ধারণ পূর্বক তখনই বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন! সীতা সামান্য নারী হইলে হয়ত অবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্তনে ও আশার এই মর্ম্মভেদিনী ছলনার একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িতেন; হয়ত তৎক্ষণাৎ তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুজলসিক্ত কাতরোক্তিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেন, কৈকেয়ীর প্রতি অজস্র অভিশাপ ও কটুক্তি বর্ষণ করিতেন, অদৃষ্টলিপির কতই নিন্দাবাদ করিতেন ও বিধাতার কার্যের উপর দোষারোপ করিয়া উদ্ভক্তার ন্যায় পরিলক্ষিতা হইতেন; হয়ত তিনি স্বার্থপরবশ হইয়া রামকে বনগমনরূপ এই ক্লেশকর হুঃসাহসিক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এবং এমন কি স্বামীকে সত্যপথ হইতেও পরিভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন! কিন্তু পূর্বেই

উক্ত হইয়াছে সীতাদেবী সে প্রকৃতির নারী ছিলেন না ; সীতা আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, এবং পতির সহিত একাত্ম হইয়া তাঁহাতেই জীবিত ছিলেন । সীতা রাজমহিষী হইবেন না, তজ্জন্ত তাঁহার মনে হুঃখের ছায়াপাতমাত্র নাই ; স্বামী পিতৃসত্যপালনার্থ ভীষণ দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছেন, তজ্জন্ত সীতার মনে বরং আহ্লাদই হইতেছে ; সীতার তাৎকালিক কর্তব্য কি তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন ; রাম বনগমন করিবেন এই কথা শুনিবামাত্র সীতা আপনার কর্তব্য কর্ম স্থিরীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন । সীতার একমাত্র হুঃখ এই যে, রামচন্দ্র নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া তাঁহাকে ভরতের আশ্রয়ে গৃহেই কালযাপন করিতে বলিতেছেন ! এতদিনেও যে রাম সীতাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই ইহাই তাঁহার অভিমানের কারণ । তাই প্রিয়বাদিনী সীতা স্বামীর উল্লিখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্বক বলিতে লাগিলেন,

“নাথ, তুমি কি জঘন্ত ভাবিয়া আমার ঐরূপ কহিতেছ ? তোমার কথা শুনিয়া যে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না ! তুমি বাহা কহিলে, ইহা একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য, একান্তই অপবশের, বলিতে কি, এ কথা শ্রবণ করাই অসম্ভব বোধ হইতেছে । নাথ, পিতা মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্মের ফল আপনাব্যুহী প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে । স্মৃতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে । দেখ, অস্ত্রান্ত্র অসম্পর্কীয়ের কথা দূরে থাক্, জীলোক আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না, ইহলোক বা পরলোকে কেবল পত্নীই তাহার গতি । প্রাসাদশিখর, স্বর্ণের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া স্ত্রী স্বামীর চরণছায়ার আশ্রয় লইবে । পিতা

মাতাও উপদেশ দিয়াছেন যে সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে । অতএব, নাথ, তুমি যদি অদ্যই গহনবনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব । অকুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না । পথিকেরা যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমিও অশঙ্কিতমনে আমার সঙ্গিনী করিয়া লও । আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই যে আমার রাখিয়া যাইবে । আমি জিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, কেবল তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয় । তোমার ছাড়িয়া স্বর্গের স্তম্ভও আমার স্পৃহণীয় নহে । এক্ষণে এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, তাহাতে আমার কোন কথাই কহিও না ।” (২।২৭)

বান্দীকির রামায়ণ হইতে আমরা সীতার বাক্যগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । রাম সীতাকে গৃহে অবস্থান করিতে বলিতেছেন এই কথা শুনিয়া সীতার হস্ত সঙ্করণে অপারগতা ; রামের যখন বনবাসের আদেশ হইয়াছে, ফলে সীতারও তাহাই ঘটিতেছে, সীতার এই সরল স্বাভাবিক যুক্তি ; রাম বনগমন করিলে, সীতা তাঁহার অগ্রে অগ্রে কুশকণ্টক দলন করিয়া যাইবেন সীতার পবিত্রপ্রেমপ্রণোদিত এই সংসাহস ; পথিকেরা যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, সেইরূপ রামও সীতাকে সঙ্গিনী করুন, সীতার এই মর্শ্বস্পর্শিনী বরুণ উক্তি, এবং সীতা যাহা করিবেন রাম যেন তাহাতে বাধা না দেন, সীতার স্তম্ভক কৰ্ত্তব্য-জ্ঞানজনিত এই আশ্চর্য্য তেজস্বিতা, এই সমস্ত বিষয় যখন আমরা মনে মনে আলোচনা করিতে থাকি, তখন সীতাচরিত্রের অপরিমের গভীরতা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই !

সীতা বড়ই বুদ্ধিমতী । পাছে স্বামী বনবাসের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, এইজন্য প্রথম হইতেই তিনি নিজের স্বাভাবিক বনবাসস্পৃহা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । সীতা

বলিলেন জীবিতনাথ, আমার একান্ত অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্রসকল বাস করিতেছে, সেই নিবিড় নিৰ্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিরন্তর তোমার চরণসেবা করি; যে জলাশয়ে কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডবসকল কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিরন্তর পূৰ্ণক তথায় অবগাহন করি; সেই বানরসঙ্ঘল বারণবহুল প্রদেশে পিতৃগৃহের জ্ঞান অক্লেশে তোমার চরণযুগল গ্রহণ পূৰ্ণক তোমারই আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবর ও পৰ্ব্বতসকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। জানি, তুমি আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার কথা দূরে থাকুক, অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোন-মতেই আমাকে পরাভুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের কলমূল আছে। আমি উৎকৃষ্ট অন্নপানের নিমিত্ত তোমার কোন কষ্টই দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে ঘাইব এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এইরূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও হুঃখ কিছুই জানিতে পারিব না।” (২।২৭)

পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে, সীতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অতিশয় অমুরাগিনী; বাল্যকালে পিতৃগৃহে তাপসতাপসীগণের সুখে তিনি আশ্রমের বর্ণনা শুনিয়াছেন; তাই নিৰ্জন বনে তাপসী হইয়া স্বামীর চরণসেবা করিতে তাঁহার বড় সাধ হইয়াছে। আশ্রমের সন্নিকটেও চতুর্দিকে যে প্রকার বন থাকে, সীতা সেই প্রকার বনের শোভার কথাই উল্লেখ করিলেন; নিবিড় ও দুৰ্গম অরণ্য যে কিরূপ, তাহা তিনি, সম্যকরূপে অবগত নহেন। তাই রামচন্দ্র মনে মনে বনবাসের হুঃখসকল আলোচনা করিয়া সীতাকে সঙ্গ লইতে সম্মত হইলেন না এবং পূৰ্বেই অবস্থান করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

রাম বলিলেন “প্রিয়ে, অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দরবিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জন করিতেছে; হৃদ্যন্ত হিংস্র জন্তুসকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে; তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদী সকল নক্রকুন্তীরসঙ্কুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাত-স্রোতঃ সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথ কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্বত্র স্থলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিত পত্র শব্দ প্রস্তুত করিয়া ক্লাস্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ংপতিত কলে ক্ষুধা শাস্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জটাতার-বহন, বকলধারণ এবং প্রতিদিন দেবতা পিতৃ ও অতিথিগণকে বিধি-পূর্বক অর্চনা করা আবশ্যক। যাহারা দিবাভাগে নিরমাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুমুমচয়ন করিয়া বানপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্তব্য। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে; কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্বেক সর্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার সরীসৃপ আছে, নদীগর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক, কীট এবং পতঙ্গ ও দংশনশব্দে যন্ত্রণা সর্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর। এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য স্থখের নহে। তথায় ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের কারণ সঙ্কেও নির্ভয় হইতে হইবে। অতএব নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না; বনবাস তোমায় সাজিবে না; জানকি এখন হইতেই দেখিতেছি তথায় বিপদেরই আশঙ্কা অধিক।” (২২৮)

সীতা রামের বাক্য শুনিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন “নাথ, তুমি অরণ্যে যে সকল দুঃখের কথা কহিলে, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু তোমার সন্নিহিত থাকিলে সুররাজ ইন্দ্রও আমার পরাভব করিতে পারিবেন না । আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যখন বনবাসের ইচ্ছা করিতেছি, তখন বনবাসের দুঃখ সকল আমার পক্ষে সুখেরই হইবে । আমি তোমার বিরহে মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিব না ; অতএব তোমার সহিত আমার বনগমন করা সর্বতোভাবে শ্রেয় হইতেছে । নাথ, যে পুরুষ জিতেন্দ্রিয় নহে, স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তাহাকেই অরণ্যবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় ; কিন্তু তুমি নির্লোভ, সুতরাং তোমার কোন আশঙ্কাই নাই ।” (২১২৯)

রাম সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া জীষৎ হাস্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনার কিছুতেই সম্মত হইলেন না । তখন সীতাদেবী সহজযুক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া আর এক যুক্তিপথ অবলম্বন করিলেন । তিনি বলিলেন, “পূর্বে পিতৃভ্রাতারে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদবধি বনবাসবিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ আছে । আমি যখন বালিকা ছিলাম, তখন এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন । তিনি তপোবলে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কি অলীক ? আর তোমার সহিত বনবাসে আমারও অত্যন্ত অভিলাষ, আমি পূর্বে এমন অনেকদিন অহুনয় করিয়া তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও সম্মত হইয়াছিলে । অতএব নাথ, তুমি এই দুঃখিনীকে সঙ্গে লইয়া চল ।” (২১২৯)

জানকীর সহস্র চেষ্টা বিফল হইল ; রাম সীতাকে সঙ্গে লইতে কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না । নয়নজলে সীতার বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া গেল । অহুনয়, বিনয়, যুক্তি, দৈবজ্ঞের উক্তি কিছুই সকল

হইল না দেখিয়া সীতা আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন। সীতা প্রীতিভরে অভিমানসহকারে মহাবীর রামকে উপহাস করিয়া কহিলেন “নাথ, আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে জীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমার সম্প্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়া থাকে যে রামের যেরূপ তেজ, প্রথম সূর্য্যোদয়ে সে প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে প্রলাপমাত্র হইয়া উঠিবে। তুমি কি কারণে বিষম হইয়াছ, কিসেরই বা এত আশঙ্কা যে অনন্তপরায়ণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছ ? আমি কুলকলঙ্কিনীর স্ত্রী তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে আমি কহিতেছি আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব।” (২।৩০)

রামচন্দ্র সীতাকে রাজা ভরতের আশ্রয়ে থাকিতে বলিয়াছিলেন ; সীতাকে পরপুরুষের আশ্রয়ে থাকিতে বলা সীতার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। তাই সীতা গাভ্রজালায় দম্ভসহকারে রামকে বালিতে লাগিলেন “নাথ, সত্য যাহার হিতাভিলাষ করিতেছ, যাহার নিমিত্ত রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইলে, তুমিই সেই ভরতের বশবর্তী হইয়া থাক, আমাকে ভবিষ্যে কিছুতেই সম্মত করিতে পারিবে না।” তাহার পর তিনি আরও কহিতে লাগিলেন “ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব। তোমার সহিত তপস্তা হউক, অরণ্য বা স্বর্গই হউক, কোনটিতে সঙ্কুচিত নহি। আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, তখন পথ সুখশস্যার স্ত্রী বোধ হইবে, তাহাতে কোন রূপ ক্লান্তি অনুভব করিব না। কুশ, কাশ, শর ও ইবীকা প্রভৃতি যে সকল কষ্টকরূপ আছে আমি তাহা তুল ও যুগচর্ম্মের স্ত্রী স্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড়ীন হইয়া আমার আচ্ছন্ন করিবে তাহা অত্যন্তম চন্দনের স্ত্রী জ্ঞান করিব। আমি যখন বন-

মধ্যে তৃণশ্রাব্য ভূমিশস্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, পর্য্যঙ্কের চিত্রকঙ্কল কি তদপেক্ষা অধিকতর সুখের হইবে ? ফলমূল পত্র অন্ন বা অধিকই হউক, তুমি স্বয়ং যাহা আহরণ করিয়া দিবে, আমি অনুভূতের ভ্রায় তাহা মধুর বিবেচনা করিব, এবং বসন্তাদি ঋতুর ফলপুষ্প ভোগ করিয়া সুখী হইব ।” (২।৩০)

যুবতীগণ পিতৃগৃহে যাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে স্বামী ও অশ্রান্ত গুরুজনকে বড়ই উত্যক্ত করেন । রাম সীতাকে বনবাসে লইয়া গেলে সীতা পিতামাতা অথবা গৃহের জন্ত উদ্বিগ্ন হইতে পারেন এই আশঙ্কায় পাছে রাম তাঁহাকে সঙ্গে লইতে আপত্তি করেন, তাই জানকী বলিতেছেন “পিতামাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইব না, গৃহের কথাও মনে আনিব না । এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া দূরাস্থরে থাকিব বলিয়া তোমায় কিছুমাত্র দুঃখ দিব না । এই কারণেই কহিতেছি তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল । তোমার সহবাস স্বৰ্গ, বিচ্ছেদই নরক এইটি তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক । অধিক কি, আমি বনবাসে কিছুই দোষ দেখিতেছি না ; যদি তুমি আমার না লইয়া যাও, আমি বিষপান করিব, কোন মতেই বিপক্ষ ভরতের বশবর্তিনী হইয়া থাকিব না । চতুর্দশ বৎসরের কথা দূরে থাকুক, আমি মুহূর্তের নিমিত্তও তোমার শোক লম্বরণ করিতে পারিব না ।” (২।৩০)

জানকী এই বলিয়া প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন । সীতার মুখমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া বিবর্ণ হইল । রামচন্দ্র প্রিয়তমাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন পূর্বক আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং কহিলেন দেবি, তোমার যজ্ঞা দিয়া আমি স্বৰ্গও প্রার্থনা করি না । আমার কুত্ৰাপি ভয়সম্ভাবনা নাই ! তোমার প্রকৃত অভিপ্রায় কি আমি তাহা জানি-তাম না, তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য থাকিলেও কেবল

এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই। এক্ষণে সুখিলাম তুমি আমার সহিত বনগমনে সম্যক্ প্রস্তুত হইয়াছ। তোমার দণ্ড-কারণ্যগমনে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি যখন তর্কবিতর্ক করিয়াছ, তখন অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি বলিতেছি যাহা আমার ধর্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়ে, তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্বাংশে উত্তম এবং আমাদের বংশেরও অমুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপযুক্ত অমুরূপে প্রবৃত্ত হও। তুমি আপনার ধনরত্ন, বস্ত্রভূষণ, ক্রীড়া-সামগ্রী সমস্তই ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া অদ্যই অরণ্যযাত্রা করিতে প্রস্তুত হও।” (২।৩০)

প্রেমের জয় হইল। সীতার আনন্দের আর পরিসীমা নাই। মেঘমুক্ত হইলে পূর্ণচন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, বনবাসে স্বামীর সঙ্গিনী হইতে সম্মতি পাইয়া সীতারও তদ্রূপ শোভা হইল। সীতা তৎক্ষণাৎ অগ্নানবদনে আপনার সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

লক্ষ্মণ এতক্ষণ উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন; তিনি রামকে বনগমন করিতে একান্তই কৃতনিশ্চয় দেখিয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন “প্রভো, যদি বনবাসই স্থির করিলেন, তবে আগনার এই চির অমু-চরকেও সঙ্গে লউন। রাম লক্ষ্মণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। অবশেষে তিন জনেই অরণ্যগমনের সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। অনন্তর সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দশরথের নিকট বিদায় লাইতে গমন করিলেন। যে সীতাকে কেহ কখনও নয়নগোচর করে নাই, সেই রাজকুমারী ও রাজবধূ সীতাদেবীকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল এবং দশরথ ও কৈকেয়ীর যথেষ্ট নিদ্ভা করিল। দশরথ রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়াই উচ্চৈঃ-

স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কোশল্যা প্রমুখ রাজমহিষীগণ শোকাকুল হইলেন । রাম দশরথের পাদবন্দন পূর্বক তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন । দশরথ বাম্পাকুললোচনে প্রিয়তম পুত্রকে বিসর্জন করিলেন । দুর্ভৃতা কৈকেয়ী রামলক্ষ্মণের পরিধানের নিমিত্ত চীরবস্ত্র আনয়ন করিলেন । রাম ও লক্ষ্মণ সেই স্থলেই তাপসবেশ ধারণ করিলেন । মুগ্ধস্বভাবা সীতাও, কিরূপে চীর ধারণ করিতে হয় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে তাহা আপনার কোশেয় বস্ত্রের উপরই বন্ধন করিতেছিলেন এমন সময়ে বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনেরা তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত করিলেন । দশরথ বৎসর সংখ্যা করিয়া সীতার জন্ত বহুমূল্য বস্ত্র ও ভূষণ প্রদান করিলেন । অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা গুরুজনবর্গের নিকট বথাক্রমে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন । কোশল্যা দেবী সীতাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আশ্রয় করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন,

“বৎসে, যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামিসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে, উহারা স্বামীর সম্পদের সময় স্নখভোগ করে এবং বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানাদোষে দূষিত, অধিক কি, পরিত্যাগও করিয়া থাকে । উহারা মিথ্যা কহে, এবং পতির প্রতি একান্ত বিরস বলিয়া অন্নকারণেই বিরক্ত হইয়া উঠে । এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ; উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসনভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতজ্ঞ হয়, ধর্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষপ্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে । কিন্তু যাহারা গুরুজনের উপদেশগ্রহণ এবং আপনাদের কুল-মর্যাদা পালন করেন, যাহারা সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব, সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন । এক্ষণে

আমার রাম যদিও নির্কাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহাকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্ভ্রমই হউন, তুমি ইহাকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।” (২।৩৯)

জানকী কোশল্যাদেবীর ঈদৃশ ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃত-
জলিপুটে কহিলেন “আর্য্যে, আপনি আমাকে যেক্রপ আদেশ করিতে-
ছেন, আমি অবশ্যই তাহা গালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ
আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি
আমাকে অসতীদিগের তুল্য বিবেচনা করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে
রক্ষার জ্ঞান আমি ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি; পিতামাতা ও পুত্র পরি-
মিত বস্ত্রই দান করিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমের
পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে কে না আদর
করিবে? আর্য্যে, আমি কি কারণে স্বামীর অবমাননা করিব?
পতিই আমার পরম দেবতা।” (২।৩৯)

কোশল্যা সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে
লাগিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ
পূর্বক স্তম্ভচালিত রথে আরোহণ করিলেন। রথ স্বর্ঘরশব্দে রাজপথে
ধাবমান হইল। রাজপুরীর মধ্যে ভীষণ আর্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল।
জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম বনগমন করিতেছেন দেখিয়া নাগরি-
কেরা আপনাদিগকে অনাথ মনে করিল, এবং বালক বৃদ্ধ, যুবক প্রৌঢ়,
ব্রাহ্মণ শূত্র, সৈন্ত সামন্ত, সকলে হাহাকার করিয়া তাঁহার রথের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

(রাম সন্তপ্তমনে একবার পশ্চাদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন অযোধ্যাবাসিগণ শোকাক্ত হইয়া তাঁহার রথের অনুসরণ করিতেছে । রাম তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিল না । রাম যেখানে যাইবেন, তাহারাও সেখানে যাইবে ; রামশূন্য অযোধ্যানগরীতে তাহারা আর বাস করিবে না । ভক্ত প্রজাগণের ঈদৃশ অনুরাগ দেখিয়া রাম অশ্রু-জল সঞ্চার করিতে অক্ষম হইলেন । তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্তম্ভকে মহাবেগে অঞ্চালনা করিতে বলিলেন । প্রজাপুঞ্জও কিছুতেই নিরস্ত হইল না ; অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, তপোনিরত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণও হাহাকার করিতে করিতে রামের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং বার্কিক্যনিবন্ধন বেগে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া কুরুশ্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । তদর্শনে রামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতরণপূর্বক পদব্রজেই অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । ক্রমে দিবা অবসানপ্রায় হইলে, সকলে তমসাতীরে উপনীত হইলেন । স্তম্ভ পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে বিমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আহারসামগ্রী প্রদান করিলেন । এদিকে সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া অবতীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে যাবতীয় পদার্থকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল । বৃক্ষসকল অস্পষ্ট ও নিম্পন্দ হইল । পক্ষিগণ নীড়ে বসিয়া কোলাহল করিতে করিতে অকস্মাৎ নীরব হইল । অদূরে তমসার কৃষ্ণজলরাশি তিমিরগর্ভে কোথায় বিলীন হইতে লাগিল । পরিশ্রান্ত অযোধ্যাবাসিগণ সেই সুরম্য নদীতটে একে একে

উপনীত হইয়া শোকে অবসর হইতে লাগিল, এবং রামের সন্নিকটে ও দূরে, চতুর্দিকে শয়ন ও উপবেশন করিয়া প্রগাঢ়নিদ্রায় নিমগ্ন হইল। রামচন্দ্র সেই প্রশান্ত সন্ধ্যাকালে তমসাতটে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া বিবাদজালে আচ্ছন্ন হইলেন। শোকাক্ত বৃদ্ধপিতা, বিলপমানা জননী, দুঃখিত মাতৃগণ এবং অমুরক্ত অযোধ্যাবাসিগণ স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া তাঁহার সুকোমল মনকে অতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিল। তিনি কষ্টে শোক সম্বরণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনপূর্বক লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “বৎস, আজ বনবাসের এই প্রথম নিশা উপস্থিত; আজ আমরা এই নদীতীরেই আশ্রয় লইলাম; এইস্থানে বস্ত্র ফলমূল যথেষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু সঙ্কল্প করিয়াছি আজিকার এই রাত্রি কেবল জলপান করিয়াই থাকিব।” সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ রামের জ্ঞাত পরামর্শ প্রস্তুত করিলেন। তিনি ভাষ্যার সহিত তাহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন; আর মহাবীর লক্ষ্মণ সূর্য্যস্তের সহিত তাঁহার গুণালোচনা করিতে করিতে নিশা যাপন করিলেন।

রাম প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্বক প্রজামণ্ডলীকে ঘোর নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া তাহারা জাগরিত হইবার পূর্বেই সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। রথ মহাবেগে চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে ক্ষণকালমধ্যে বহুদূরে লইয়া গেল। অনন্তর কোশলরাজ্যের অন্ত্যসীমার বেদশ্রুতি নদী পার হইয়া তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, পরে কিয়দূরে গোমতী ও শুন্দিকা নদী অতিক্রম করিয়া সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন। অনতিদূরে পবিত্র-সলিলা জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছিল। রাম সীতাকে সুরম্যাতট-শোভিনী কলনাগিনী সেই জাহ্নবীর বিচিত্র শোভা দেখাইতে দেখাইতে এক মনোহর ইন্দ্রদীপক দেখিতে পাইলেন, এবং সেই বৃক্ষতলেই নিশা-যাপনমানসে সুমন্ত্রকে সম্বরণ করিতে বলিলেন।

গুহ নামে এক নিষাদরাজ ঐস্থলে বাস করিতেন । তিনি রামের বাল্য সখা ছিলেন । সুহৃদ্বর রামচন্দ্র তাঁহার রাজ্যে আগমন করিয়াছেন ইহা শ্রবণমাত্র গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত্ত হইয়া সুস্বাদু ফলমূল ও অর্ঘ্যসহকারে রামের নিকট সমাগত হইলেন । বন্ধুদ্বয় প্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । গুহ কর্তৃক সংকৃত হইয়া রাম পরম আনন্দ লাভ করিলেন, এবং তাপসব্রতপালনের অমুরোধে অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিলেন না । অনন্তর রামচন্দ্র সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার নিমিত্ত সুশীতল পানীয় জল আনয়ন করিলেন । রাম জলপান করিয়া সীতার সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন ; লক্ষ্মণও তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন পূর্বক তকমূলে আশ্রয় লইলেন ।

লক্ষ্মণ রামের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত অকৃত্রিম অমুরাগে রাজিভাগরণ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া নিষাদরাজ তাঁহার ভ্রাতৃত্বভক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন । গুহ মহামতি লক্ষ্মণকে শয়ন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামলাভ করিতে অনেক অমুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রস্তাবে কিছুতেই সন্মত হইলেন না । লক্ষ্মণ সন্তপ্তমনে কহিতে লাগিলেন “দেখ, এই রঘুকুল-তিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আমার আর আহার নিদ্রার প্রয়োজন কি ?” এই বলিয়া লক্ষ্মণ একমাত্র রামের অভাবে পিতামাতা আত্মীয় বন্ধু এবং অযোধ্যাবাসিগণের যে কিরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, শোকাকুলমনে তাহাই কীর্তন করিতে লাগিলেন । এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল । রাম জাগরিত হইয়া গঙ্গা সমুদীর্ণ হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন ইত্যবসরে নিষাদরাজ কর্ণ ও

ক্ষেপণীযুক্ত, নাবিকসহিত, একখানি সূক্ষ্ম নৌকা আনয়ন করিলেন ।
 রামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত, সেই নৌকায় আরোহণ
 করিতে সমুদ্রাত হইলেন । সূক্ষ্মকে এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত
 হইতে হইবে, তাই রাম তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন “সূক্ষ্ম, তুমি
 পুনরায় দ্বারার মহারাজের নিকট গমন কর ; আমাকে রথে আনয়ন
 করা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল ; অতঃপর আমি পদব্রজে গহনবনে প্রবেশ
 করিব ।” ভর্তৃবৎসল সূক্ষ্ম রামের এই অনুজ্ঞা শ্রবণপূর্ব্বক রোদন
 করিতে লাগিলেন । রামের সহবাসে ছিলেন বলিয়া এতক্ষণ তাঁহার
 শোকাবেগ সংরুদ্ধ ছিল, কিন্তু অতঃপর সত্যসত্যই রামকর্তৃক বিসর্জিত
 হইতে হইতেছে ইহা ভাবিয়া তিনি শোকাকুল হইলেন । রাম
 তাঁহাকে সূক্ষ্মদূর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া জনকজননী ও অশ্রান্ত গুরু-
 জনের চরণে প্রণাম, প্রোষিত ভরতশত্রুঘ্নকে স্নেহ, এবং প্রজাপুঞ্জকে
 আন্তরিক সন্ধ্যাব জানাইলেন । তৎপরে ব্রাহ্মদেব বটনির্য্যাস দ্বারা
 মস্তকে জটা প্রস্তুত করিয়া স্বর্গের ভ্রাতা শোভা পাইতে লাগিলেন ।
 বীরযুগল এইরূপে তাপমোচিত বেশ ধারণ করিয়া নিবাদরাজ গুহ ও
 সূক্ষ্মের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং দেবী জানকীর সহিত
 নৌকারোহণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতীর্ণ
 হইলেন ।

অতঃপর রামচন্দ্র ঘোর অরণ্যপ্রবেশের উপক্রম করিতেছেন ;
 সীতাদেবী সঙ্গে আছেন এবং লক্ষ্মণই তাঁহার একমাত্র সহায় । তাই
 তিনি গঙ্গা সমুদ্রীর্ণ হইয়াই ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া লক্ষ্মণকে
 উপদেশ প্রদান করিলেন “ভাই, সজ্জন বা বিজ্ঞনই হউক, সীতাকে
 রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হও । তুমি সর্ব্বাগ্রে গমন কর, সীতা
 তোমার অনুগমন করুন, আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই
 রক্ষক হইয়া বাই । দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি দুষ্কর কার্য্য

সংসাধন করিতে হইবে, সুতরাং এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে। যে স্থানে জনমানুষের সঞ্চার নাই, ক্ষেত্র ও উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং গর্ভ ও নিয়ন্ত্রিত ভূমিই অধিক, জানকী আজ সেই বনে প্রবেশ করিবেন, এবং বনবাসের যে কি দুঃখ আজই তাহা জানিতে পারিবেন।” (২।৫২)

স্বামীর এইরূপ আশঙ্কা ও সতর্কতা দেখিয়া অরণ্যবাস যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার জানকী অবশ্যই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও অমুরাগ, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর বলবীৰ্য্যে অটল বিশ্বাস, এবং তৃতীয়তঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনে আপনার অতৃপ্ত লালসা এই ত্রিবিধ কারণে সীতার মনে বনবাসসম্ভাবিত কোন ভ্রাসই উৎপন্ন হইল না। আমরা অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইব সীতাদেবী গভীর অরণ্যভেদেও কেমন স্বায়ত্তাধীন গৃহাঙ্গন বা গুপ্তোদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন! উল্লিখিত ত্রিবিধ কারণ একাধারে বর্তমান না থাকিলে সীতার স্বায় তেজস্বিনী নারীর পক্ষেও অরণ্যবাস একপ্রকার অসম্ভব হইত।

বতকর্ণ রাম লক্ষণ ও সীতা দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন, ততক্ষণ স্মৃত্ত নিৰ্নিমেষলোচনে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেও, তিনি বহুকণ নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে শূন্যরথ লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।

সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। আজ অযোধ্যাবাসী প্রজাবর্গ, স্মৃত্ত, অথবা স্মৃৎসর গৃহ, কেহই সজে নাই। রাম লক্ষণ ও সীতা জনগণের বাহিরে, সবে মাত্র এই প্রথম নিশা দর্শন করিতেছেন। অদ্যাবধি রামলক্ষণকে আলম্বনশূন্য হইয়া রাজিভাগরণ করিতে হইবে, স্বহস্তে ভৃগুপত্র আহরণ পূর্ব্বক শয্যা প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং সীতার রক্ষণাবেক্ষণ ও

সুখস্বচ্ছন্দ্যের জন্ত বিস্তর কার্যক্ৰেণ্ড সহ করিতে হইবে। তাই
 রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন “বৎস, আর তুমি নগর অরণ করিয়া
 উৎকণ্ঠিত হইও না।” রাম লক্ষ্মণকে উৎকণ্ঠা দূরীভূত করিতে
 উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভূমিশয্যাতে শয়ন করিয়াই
 আপনার মানসিক উদ্বিগ্ন নিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না।
 যথার্থ বটে রাম এক পিতৃসত্যপালন ও ধর্মরক্ষার নিমিত্তই পিতা মাতা
 ও জ্ঞানপদবর্গের মনে ক্রোধপ্রদান করিয়াও মহোৎসাহে বনবাস স্বীকার
 করিয়াছেন, কিন্তু তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি কুপুত্রের জ্ঞান জননীকে
 বিস্তর যত্না প্রদান করিয়াছেন এবং পিতারও শোকের যথেষ্ট কারণ
 হইয়াছেন; এই সমস্ত বিষয় পূর্বাধিকার আলোচনা করিয়া রাম
 অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অবিরল ধারায় অশ্রুস্রোতন করিতে
 লাগিলেন, তদর্শনে সীতা এবং লক্ষ্মণও অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন।
 অবশেষে সুধীর লক্ষ্মণ শান্তচিত্ত হইয়া রামচন্দ্রকে আশ্বাস প্রদান
 করিতে লাগিলেন। রাম কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্নমধুর বাক্যে আশ্বস্ত ও
 উৎসাহিত হইয়া সেই জনসঙ্কারণশূন্য অরণ্যে নিশা যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে সকলে গাত্ৰোত্থানপূর্বক গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল
 লক্ষ্য করিয়া বনে বনে গমন করিতে লাগিলেন। সীতা ভর্তার সহিত
 কত রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন, কিন্তু রামের বিষাদপূর্ণ মুখ-
 মণ্ডল অবলোকন করিয়া কিছুতেই আনন্দলাভ করিলেন না। রাজ-
 বালা ও রাজবধূ সীতাদেবী একমাত্র পতিপ্রেমের বশবর্তিনী হইয়া
 সেই কণ্টকপূর্ণ, প্রস্তরময়, নিম্নোন্নতভূমিসঙ্কুল বনপ্রদেশকে কুসুম-
 কীর্ণ পথের জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন পর্য্য-
 টন করিয়া তাঁহারা সন্ধ্যাকালে প্রয়াগসন্নিধানে উপনীত হইলেন,
 এবং যেখানে মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রম বিরাজ করিতেছিল সেই
 দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহারা আশ্রমে

প্রবেশ করিয়া মহর্ষির পাদবন্দন করিলেন। রাম আশ্বপরিচর প্রদান করিলে, মহর্ষি তাঁহাদের সম্বন্ধে সমাদর করিলেন। তিনি তাঁহাদের সংকারার্থ উৎকৃষ্ট ফল মূল ও সুস্বাদু জল প্রদান করিলেন এবং অবস্থিতির নিমিত্ত একটি সুন্দর স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন। পরে মহর্ষি অস্ত্রাঙ্ক মুনিগণের সহিত রামকে বেটন পূর্বক নানা প্রশ্নে কিরংকণ অভিবাহিত করিয়া, সেই পবিত্র রমণীয় আশ্রমেই তাঁহাকে বনবাসকাল যাপন করিতে অমরোধ করিলেন। অদূরে লোকালয় আছে, পৌরবর্গ রাম ও জানকীকে জানিতে পারিলে সততই আশ্রমে গমনাগমন করিবে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের তাদৃশ প্রীতিকর হইবে না, এই নিমিত্ত রাম মহর্ষির সেই সুসজ্জিত প্রস্তাবে সন্মত হইলেন না। রাম বলিলেন “ভগবন, জানকী যথায় সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এমন কোন জনশূন্য আশ্রম দেখাইয়া দিন।” ভরদ্বাজ চিন্তা করিয়া তাঁহাদের বাসের জন্ত দুল্ল কোশ দূরে চিত্রকূট নামে এক পর্বত নির্দেশ করিয়া দিলেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রমে সেই নিশা যাপন ও প্রভাতে তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্বক রামচন্দ্র, প্রিয়তমা জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, মহর্ষিনির্দিষ্ট পথে চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা মুনির অমুকাম্পার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যমুনাতটে উপনীত হইলেন। লক্ষ্মণ শুককান্দ আহরণ ও উত্তীর্ণদ্বারা তাহা বেটন করিয়া এক ভেলা নির্মাণ করিলেন, এবং তত্পরি সীতার উপবেশনার্থ একটি কাঠাসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরে সকলে সেই ভেলার সাহায্যে ধীরে ধীরে যমুনা পার হইয়া তাহার দক্ষিণতটে অবতীর্ণ হইলেন। সীতাদেবী ইচ্ছাপূর্বক শুভের নৌকার গঙ্গা এবং এক্ষণে ভেলার সাহায্যে যমুনা উত্তীর্ণ হইবার সময় নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞালিঙ্গুটে এইরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

“দেবি, এই রাক্ষসের তোমার কৃপার নির্বিঘ্নে পিতৃনিবেশ পূর্ণ করুন। ইনি চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া পুনরায় আমাদের সহিত প্রত্যর্গমন করিলেন। আমি নিরাপদে আসিরা মনের মাধে তোমার পূজা করিব। দেবি, আমি তোমাকে প্রণাম করি।” (২।৫২, ৫৫) যমুনা সমুত্তীর্ণ হইয়া কিরদূর যাইতে না যাইতে জানকী শ্রাম নামে এক অভ্যুচ্চ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। এই প্রকাণ্ড মহীকূহ দিগন্ত-প্রসারী শাখালমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দূর হইতে মনকুষ্য নীরদখণ্ডের স্তায় প্রতীয়মান হইতেছিল। দেবী জানকী বৃক্ষকে প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন “তরুবার, আমার পতি ব্রতকাল পালন করুন, আমরা আবার আসিয়া যেম আখ্যা কোশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার।” এই বলিয়া তিনি সেই বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

পুণ্যতোরা গঙ্গাযমুনা ও এই বিশাল বটবৃক্ষের নিকট সীতার সৌন্দর্য সন্নিবিষ্ট প্রার্থনা তাঁহার সরল হৃদয়ের কি সুন্দর পরিচায়ক! তিনি স্বামীর কল্যাণের নিমিত্ত কি প্রকার সমুৎসুক ছিলেন, এতদ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে। সেই শ্রামবট পরিভ্রমণ করিয়া এক-কোণে দূরেই তাঁহার নীলবর্ণ এক মনোহর কানন দেখিতে পাইলেন। রামচন্দ্র সীতার পুষ্পপ্রিয়তা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অহুরাগের বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাই তিনি লক্ষণকে বলিলেন “জাই, দেখ, সীতা যে পুষ্প চাহিবেন এবং যে বস্তুতে তাঁহার পূজা হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিবে।” (২।৫৫) সীতাদেবী যাইতে যাইতে বৃক্ষশূন্য এবং অদৃষ্টপূর্ব্বপুষ্পশূন্যশোভিত লতা বাহা কিছু দেখেন, এমনই রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষণও ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অতিলাভিত দ্রব্য আনিয়া দেন। এইরূপে সমস্তদিন তাঁহার বনে বনে ভ্রমণ করিলেন। রামলক্ষণ যুগবধ ও ফলমূলদি আহরণ পূর্ব্বক

সুখা শান্তি করিলেন এবং সকলে এক মনোহর নদীতীরে সেই নিশা বাপন করিলেন ।

পরদিন প্রভাতে তাঁহারা গাজোখান করিয়া অনতিবিলম্বে চিত্রকূটের সমীপবর্তী হইলেন । চিত্রকূটপর্বত অতিশয় রমণীয় ; তাহার নামাবিধি বৃক্ষ ও লতাজালে মগ্নিত । সেখানে কলমূল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জলও অতিশয় সুস্বাদু । অসংখ্য অগ্নিকর শ্মশি সেই মনোরম প্রদেশে অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন । সেখানে কোথাও নদী, কোথাও প্রস্রবণ, কোথাও গিরি শৃঙ্গ, কোথাও উচ্চাবচ ভূমি এবং কোথাও বা তৃণশূন্যসমাচ্ছাদিত বিচিত্র সমতল ক্ষেত্র । কোথাও সুরভি আরণ্যকুম্ম প্রক্ষুটিত হইয়া বনস্থল সমুচ্ছল করিতেছে ; কোথাও ভ্রমর ও বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতিদল পুষ্পে পুষ্পে উড্ডীন হইতেছে । রামচন্দ্র বসন্তকালে অরণ্যযাত্রা করিয়াছিলেন । তখন বনে বনে কিংশুক পুষ্প সকল বিকশিত হইয়া প্রজলিত দাবানলশিখার স্তায় প্রতীয়মান হইতেছিল । কোথাও কোকিলের কুহ স্বর, কোথাও ময়ূরের কেকাদ্বনি, কোথাও টিট্টিভের কুজন এবং কোথাও বা দাত্যহের চীৎকার । কোথাও চকিত হরিণ-হরিণীদল বিদ্যুতের স্তায় দৃষ্টিপথ হইতে অদৃষ্ট হইতেছে ; কোথাও বা দূরে মাতঙ্গদল স্তনীতল বৃক্ষচ্ছায়ার ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে । জানকী রামের বাহ অবলম্বন পূর্বক সেই সমুদয় বিচিত্র শোভা দেখিয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করিলেন । তাঁহার পরিদর্শন মুগ্ধমগ্ন সমুচ্ছল এবং চক্ষুঃসর প্রভালম্পার হইল । তিনি ভাবাবেশে নির্মাক ও বনভ্রমণজনিত ক্লেশরাশি একেবারে বিস্মৃত হইলেন । তিনি একবার সেই বনস্থলীর সৌন্দর্য্যের দিকে এবং একবার প্রীতিবিকারিতলোচনে স্বামীর প্রচুর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনোমধ্যে অতুল আনন্দ অনুভব করিতে

লাগিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে তাঁহার। মহর্ষি বাম্বীকির পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিমল প্রীতিলাভ করিলেন, এবং সমুচিত অভ্যর্থনা ও সংকার দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্মানিত করিলেন।

যে কারুণিক কবির অমৃতময়ী লেখনী হইতে এই পবিত্র রামকথা নিঃসৃত হইয়া ভারতবাসিগণের কর্ণকুহরে আজ সহস্র সহস্র বৎসর সুধাবর্ষণ করিতেছে এবং প্রতিনিয়ত কোটি কোটি হৃদয়ল মানবকে সাধুতা সত্যপরায়ণতা ও পবিত্রতার দিকে অগ্রসর করিয়া সংসারে ধর্মের প্রভাব এখনও অপ্রতিহত রাখিয়াছে, সেই কবিকুলচূড়ামণি মহর্ষি বাম্বীকির আশ্রমে মহাত্ম্যব রামচন্দ্রের এই প্রথম পদার্পণকথা মনোমধ্যে কি সুগভীর ভাবরাশিরই সমুদ্রেক করিতেছে! এখনও মহর্ষি ক্রৌঞ্চবধে শোকসন্তপ্ত হইয়া অকস্মাৎ স্তম্ভিত শ্লোক উচ্চারণ করেন নাই, এখনও রামায়ণ রচনা করিবার কোন ইচ্ছাই তাঁহার মনোমধ্যে জাগ্রত হয় নাই; এখনও তিনি একটীবার স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই যে তাঁহার অতিথি এই সত্যব্রত অরণ্যচারী রাজকুমারের অলৌকিক গুণরাশিই জগতে তাঁহার অতুল কীর্তিস্থাপনের একমাত্র কারণ হইবে! হরত বাম্বীকি তৎকালে রামচন্দ্রের অসাধারণ পিতৃ-ভক্তির কথা শ্রবণ পূর্বক কেবল মাত্র বিম্বরসম্বলিত এক অপূর্ণ আনন্দরসে ভাসমান হইয়াছিলেন, হরত সেই আশ্রমে দেবকলিণী, পবিত্রতার দীপ্তিময়ী প্রতিমূর্তি, স্বামীর সহিত অরণ্যচারিণী, নববৌবন-সঙ্গীরা জানকীদেবীকে সেই প্রথম সন্দর্শন পূর্বক মানসচক্ষে দেব-রাজ্যের অঙ্গাঙ্গি দ্বারা অবলোকন করিয়াছিলেন এবং অমিতভোজা সঙ্গের অলোকসাধারণ ব্রাহ্মভক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া অনির্বচনীয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখন পর্য্যন্তও রামচন্দ্রের সহিত আপনার হৃদয় সঙ্কল্পের কথা একটীবারও চিন্তা করেন নাই।

দশরথতনয় রামচন্দ্র পিতৃসত্যপায়ন্যার্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রিয়তমা পত্নীর সহিত অরণ্যপার্শ্বটান করিতে করিতে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছেন; এইরূপ রাজভক্তি ও আতিথ্যেরতার বশবর্তী হইয়াই বান্দীকি তখন তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন মাত্র ।

সেই নির্জন রমণীর বনপ্রদেশে বাস করিতে রামের একান্ত ইচ্ছা হইল । তিনি লক্ষ্মণকে উৎকৃষ্ট কাঠ দ্বারা এক কুটার নির্মাণ করিতে আদেশ করিলেন । মহাবীর লক্ষ্মণও অনতিবিলম্বে তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিলেন । গৃহের চতুর্দিক কাঠাবরণে আবৃত এবং উপরিভাগ শাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইল । তাহার অভ্যন্তরে একটা বেদিও প্রস্তুত হইল । কুটারখানি পরম সুন্দর হইয়াছে দেখিয়া রামচন্দ্র যথাবিধি শাগবজাদি সমাপনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সীতার সহবাসে ও লক্ষ্মণের পরিচর্য্যায় শ্রীত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

সীতাদেবী বান্দীকির আশ্রম ও তৎসন্নিহিত বন ও উপবনের শোভা দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন; তিনি স্বামীর সহিত চিত্রকূটের নানা স্থানে হরিণীর দ্বার স্বাধীনভাবে বিচরণ ও প্রিয়তমের প্রণয়োচ্ছল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া স্বর্গসুখও ভুজ্জ করিয়াছিলেন । ভ্রামলবিটপিশোভিত মনোহর বন অথবা পবিত্র আশ্রমই যেন তাঁহার প্রস্তুত গৃহ ছিল । হার, মন্মভাগিনী জানকী স্বামীসহ বান্দীকির আশ্রমের চতুর্দিকে মহোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে একটা দিনও আশঙ্কা করেন নাই যে সেই রমণীর আশ্রমেই আবার একদিন তাঁহাকে স্বামিবিয়োগে বিলাপ করিয়া গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতে হইবে !

রাম প্রিয়তমা পত্নী ও অল্পমত ভ্রাতার সহিত চিত্রকূটে সুখে বাস করিতে থাকুন, ইত্যবসরে আমরা তাঁহার বিরহে অযোধ্যানগরীর কি

দুঃখবহা হইরাছে তাহা একবার দেখিয়া আসি। শূন্যরথ লইয়া অমর রাজধানীতে প্রত্যাপ্ত হইলে, রামের বনবাসসম্বন্ধে লোকের নিঃসংশয় হইয়া আবার পোকে অতিভূত হইল। মহারাজ দশরথ বিলাপ করিতে করিতে ক্লিষ্টপ্রায় হইলেন। তিনি শোকাবহ মহিবীগণকে বিশেষতঃ কোশল্যা'কে সোধন করিয়া কহিলেন যে, তাঁহার অস্বাভাবিক উপস্থিত হইরাছে; তিনি রামের অদর্শনে আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না। তখন কোশল্যা স্বয়ং সংবতচিত্ত হইয়া রাজাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। (পুত্রনির্ভাসনের ষষ্ঠ দিবসের রজনীতে মহারাজ দশরথ রামের অন্ত বিলাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার শয্যাসন্নিধানে মহিবীগণ নিদ্রিত ছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মৃত্যুরূপিনী শোকাবহ দুর্ঘটনা অবগত হইলেন না।)

রজনী প্রভাত হইলে, তাৎকালিক প্রথা অনুসারে শূন্যরথ, কুলপরিচরক মাগধ, গায়ক ও স্ততিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিয়া স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্বাদ ও স্ততিবাদ করিতে লাগিল। পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব ভূপতিগণের অন্তত কার্যকলাপ উল্লেখ করিয়া করতালিপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালিশব্দে বৃক্ষশাখার ও পত্রের যে সকল পক্ষী ছিল তাহারা জাগ্রত হইয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিল। পবিত্রহান ও তীর্থের নামকীৰ্ত্তন আরম্ভ হইল এবং বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। সেবানিপুণ স্ত্রীলোকেরা ও বুদ্ধ পরিচারকগণ আগমন করিল। কেহ কলসে দ্রাব্য হরিচন্দন-সুৰভিত স্নানীতল জল লইয়া আসিল। কুমারী ও সাক্ষী মহিলাগণ মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু, পানীয় গজোদক, এবং পরিধের বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে মহারাজের যে যে দ্রব্য আবশ্যক হয় সমস্তই আনীত হইল, কিন্তু স্তম্ভ রাজা তখনও প্রবৃত্ত হইলেন না দেখিয়া মহিবীগণ তাঁহার গাজস্পর্শপূর্বক সজ্জা দেখিলেন যে রাজার

দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে ! শোকের উপর এই দারুণ শোক উপস্থিত হইলে, সেই ক্ষুদ্র রাজসংসার মুহূর্ত্ত মধ্যে এক ভীষণ দৃষ্টে পরিণত হইয়া গেল । চতুর্দিকে শোকভরঙ্গ উচ্ছলিত হইতে লাগিল এবং নাগরিকেরা বিবাদে আগনাগমন কর্তব্যাকর্তব্য বিন্মত হইয়া দ্বানমুখে অবস্থান করিতে লাগিল । রামলক্ষণ বনবাসে আছেন ; সুশীল ভরত কুমার শত্রুরের সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহারা অযোধ্যানগরীতে এই দুই আকস্মিক বিপৎপাতের কথা কিছুই অবগত নহেন । মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কোন পুত্রই সন্নিহিত নাই ; সুতরাং বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মৃতদেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপিত করিতে আদেশ করিলেন এবং ভরতকে অযোধ্যার শীঘ্র আনয়নের নিমিত্ত তদগ্রেই ক্রতগামী দূতলকল প্রেরণ করিলেন ।

দূতেরা বথাসময়ে কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইয়া ভরতকে অযোধ্যার প্রত্যাগমন করিতে স্বরাশ্রয়ান করিল ; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে কোন কথাই প্রকাশ করিয়া বলিল না । ভরত গিরিব্রজ নগর হইতে অযোধ্যার সপ্তমদিনে উপস্থিত হইলেন । তিনি উৎকণ্ঠিতমনে আগমন করিতেছিলেন, দূর হইতে অযোধ্যাকে স্রীহীন দেখিয়া আরও ব্যাকুল হইলেন । ভরত দীনমুখে ব্যাকুলচিত্তে জননীর গৃহে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রাণে পিতা ও রামলক্ষণ প্রভৃতি প্রিয়জনগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । কৈকেয়ী বহুকালপরে বৎস ভরতকে দেখিয়া প্রথমে পিজালয়ের শুভলংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে অন্নান-বদনে রামের বিরহে রাজা দশরথের মৃত্যুকথা উদ্গীর্ণ করিলেন এবং ভরতের সন্তোষবিধানার্থ তৎসঙ্গে রামবনবাসসংক্রান্ত সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন ! কুমার ভরত এই দুই সর্বঘাতী অপ্রিয়-সংবাদ শ্রবণরাজ্য সংক্রান্ত হইয়া সহসা ধরাডলে পতিত হইলেন ;

সীতা ।

তিনি বহুক্ষণপরে চেতনালভ করিয়া শোকে ও রোমে কখন বিলাপ এবং কখনও বা চূৰ্ণতা কৈকেয়ীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শোকাক্ত শত্রুর পাল্লীরসী মহরাকে সমস্ত অনিষ্টের মূল জানিয়া তাহার অভিশপ্ত ছরবহা সম্পাদন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠাদি অমাত্যগণ কুমার ভরতের শোকাগ্নিনোদন করিয়া তাঁহাকে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অহুরোধ করিলেন। দশ-রথের স্তূতদেহ তৈলদ্রোণি হইতে উত্তোলিত হইয়া সরস্বতীরে আনীত এবং চন্দনাদি স্নগন্ধকাষ্ঠরচিত প্রজলিত চিতামধ্যে সংস্থাপিত হইয়া ভস্মীভূত হইল। ভরত শত্রুর ও কোশল্যাদি মহিষীগণ মহারাজের দেহরত্ন ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং চতুর্দিকে গোরবর্ণ হাহাকার করিয়া উঠিল। ভরত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্বক পরলোকগত পিতা এবং বনস্থিত রাম লক্ষ্মণ ও সীতার শোকে বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। অমাত্যগণ অনেক অহুনের সহকারে তাঁহাকে পিতৃপ্রদত্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অহুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে তদ্বিষয়ে সম্মত করিতে পারিলেন না। ভরত সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া লোকাভিরাম রামচন্দ্রকে বন-বাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং তদ্বন্দ্বেষে অশোচান্তে অমাত্যবর্গ, মাতৃগণ, সৈন্তসামন্ত, অহুচরবর্গ এবং অসংখ্য অশ্ব হস্তী ও রথের সজ্জিত অরণ্যভিমুখে বাজা করিলেন। ভরতের আজ্ঞাহুসারে পথশোধকেরা পূর্ব হইতেই পথসকল প্রস্তুত, পরিষ্কৃত ও সমতল করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা গমনকালে কোন ক্লেশই প্রাপ্ত হইলেন না। রাম যেখানে যেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান অবলোকন করিয়া ভরত শোকসন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে নিবাদরাজ গুহের নৌকাযোগে গঙ্গা সমুদ্রীর্ণ হইয়া জলধি ভরবাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভরতরাজ ভরতের আগ-

মনসংবাদ অবগত হইয়া পুলকিত, এবং তৎপ্রভাবে সকলের সমুচিত সৎকার করিয়া সজ্জ হইলেন। অনন্তর মহর্ষিপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক তাঁহারা অনতিবিলম্বে চিত্রকূটে উপনীত হইলেন। ভরত, সৈন্ত ও অশুচরবর্গকে দূরে সরিবিষ্ট করিয়া কেবলমাত্র শত্রুগ্ন স্তম্ভ ও নিবাদ-রাজ্যের সমভিব্যাহারে, যথায় কমললোচন রামচন্দ্র জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত পর্ণকুটীয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপনীত হইলেন।

এদিকে রামচন্দ্র দূর হইতে সৈন্তগণের কোলাহল শ্রবণ এবং অরণ্যমধ্যে সজ্জস্ত যুগসকলের ইতস্ততঃ পলায়ন দর্শন করিয়া কুমার লক্ষ্মণের সাহায্যে প্রকৃত ঘটনা অবগত হইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি মনোমধ্যে নানারূপ বিতর্ক করিয়া অবশেষে ইহাই অবধারণ করিলেন যে, সর্বাধিপতি পিতা অথবা কুমার ভরতই তাঁহার নিকট আগমন করিতেছেন। এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে কুটীরে উপবিষ্ট আছেন ইত্যবসরে ভরত আসিয়া তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইলেন, এবং রামলক্ষ্মণের তাপসবেশ অবলোকন ও পিতার পরলোকগমন স্মরণ করিয়া অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরত রামচন্দ্রের তাপসবেশে বনগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া অবধি স্মরণ জটাবদ্ধল ধারণ করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তিনি পিতৃশোক কাতর হইয়া অতিশয় ক্লশ এবং দুর্বলও হইয়াছিলেন; স্মৃতরাং রাম তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারিলেন না। নিমেষমধ্যে ভ্রম বিদূরিত হইলে, রামচন্দ্র ব্যগ্রতাসহকারে সন্মুখে ভরতকে উত্তোলন পূর্বক গাত্ররূপে আলিঙ্গন করিলেন, এবং জনক জননী ও রাজ্যের সর্বপ্রকার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরতের মুখে মহারাজ্যের সূত্য়রূপ হুঃসংবাদ অবগত হইবামাত্র রাম ভূতলে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অতিশয় কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকণ অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর

রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত, মন্দাকিনীজলে অবগাহন পূর্বক স্নান করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে মহারাজের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পণক্রিয়া সমাধা করিলেন। কিয়ৎকণপরে ভগবান্ বশিষ্ঠের সহিত কৌশল্যাদি মহিষীগণ কুটীরে উপস্থিত হইলে, সকলে আবার প্রবল শোকতরঙ্গে ভাসমান হইতে লাগিলেন। আতপতাপে মলিনমুখী জানকী লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া পরলোকবাসী স্বত্তরের জন্ত অজস্র বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, ভরত বিনয় ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ, অমাত্যগণ, পৌরগণ ও জ্ঞানপদবর্গ সকলেই ভরতের প্রার্থনা সমর্থন করিলেন, কিন্তু সত্যব্রত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র তাঁহাদের সে প্রার্থনায় সন্মত হইলেন না। রাম তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ভরতকেই রাজ্যাশাসন ও প্রজাপালন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং তিনি যে পিতৃসত্য পালন না করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইবেন না তাহাও স্পষ্টরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। ভরত রামচন্দ্রের অটল সঙ্কল্পদর্শনে নিরুপায় ভাবিয়া অগত্যা তাঁহার স্বর্ণপাছকাছটি গ্রাসস্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। ভরত অমাত্যগণের পরামর্শে রামের পাছকা লইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার নিকট বিদ্বায় গ্রহণ করিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অল্পক্ৰমে মাতৃগণ ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সকলে শোকসন্তপ্তহৃদয়ে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে সেই ঘোর বনে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। ভরত পাছকাযুগল গ্রহণ পূর্বক নন্দিগ্রামে তাহা রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া তথায় তপস্বিবেশে অবস্থান ও সেই স্থান হইতেই সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায় ।

ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে, রাম চিত্রকূটেই পূর্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, চিত্রকূটবাসী তাপসগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে গোপনে কি জল্পনা করিতেছেন এবং এক এক বার রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রকুটি-সঞ্চালন করিতেছেন। রামচন্দ্র তদর্শনে শঙ্কিত হইয়া কুলপতিকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং প্রত্যুত্তরে অবগত হইলেন যে তাপসগণ রাম লক্ষণ অথবা সীতার ব্যবহারে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই ; পরন্তু সেই অরণ্যচারী খরদূষণ প্রভৃতি দৃষ্ট রাক্ষসগণ রামচন্দ্রের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া নিরীহ ঋষিগণের উপর ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, এই নিমিত্ত তাঁহারা চিত্রকূটসন্নিহিত আশ্রম সকল পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপূর্ণ অথ কোন প্রদেশে গমন করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। রামচন্দ্র ভাৰ্য্যার সহিত অরণ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহারও সর্বদা সতর্ক থাকা কর্তব্য। তিনিও ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের সহিত সেই নিরুপদ্রব স্থানে গমন করিতে পারেন।

অনেকানেক ঋষি সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অত্র গমন করিলেন, যাহারা অবশিষ্ট রহিলেন তাঁহারা রামের ভূজবলের আশ্রয়ে চিত্রকূটেই বাস করিতে লাগিলেন। সুরূপা জানকী ঋষিগণের পরিচর্যা করিয়া সম্ভোষ লাভ করিতেন, কখনও বা স্বামীর সহিত মন্দাকিনীতটে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার শোভা এবং হংসসারস ও কারণ্ডবগণের জলক্রীড়া দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেন। কিন্তু ভরতের সৈন্ত ও অমুচরবর্গ এবং হস্ত্যশ্ব সকল সেই অরণ্যের অপূর্ব

শ্রী বিনষ্ট করিয়াছিল ; সুতরাং রাম চিত্রকূটে আর পূর্ববৎ আনন্দলাভ করিতে সক্ষম হইলেন না । বিশেষতঃ লোকালয়ের সন্নিহিত বলিয়া তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন ; অধিকন্তু চিত্রকূটে তিনি ভরত মাতৃগণ ও পুরবাসীদিগকে দেখিতে পাইলেন ; তাঁহারা সকলেই রামের শোকে আকুল, রামও তাঁহাদিগকে কোন মতেই বিদ্রুত হইতে পারিতেছেন না, সুতরাং অন্তঃ গমন করাই তাঁহার প্রেরণার বোধ হইল ।

(রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, ঋষিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মহর্ষি অত্রিয়ার আশ্রমে উপনীত হইলেন । মহর্ষি আতিথ্যসংকার দ্বারা তাঁহাদের যথেষ্ট সন্মান করিতেছেন ইত্যবসরে অত্রিপত্নী ধর্মপরায়ণা অননুয়া তথায় আগমন করিলেন । এই মহাভাগা তপোবলসম্পন্ন সর্বজনপূজনীয়া ও পতিব্রতা ছিলেন । তিনি অতিশয় বৃদ্ধা, সর্বাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল ও কেশরাশি জরাপ্রভাবে গুরু । তিনি বায়ুভরে কদলীতরুর স্তায় অনবরত কম্পিত হইতেছেন । সীতা স্বামীর আদেশে তাপসীর সন্নিধানে গমন করিয়া স্বনাম উল্লেখপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন অননুয়া তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন,

“জানকি, তোমার ধর্মদৃষ্টি তীক্ষ্ণ । তুমি আত্মীয় স্বজন ও অভিমান বিসর্জন করিয়া ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের অনুসরণ করিয়াছ । স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয়বোধ করেন, তাঁহার সদগতিলাভ হয় । পতি হৃদয়ীল স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, পূজ্যস্বভাব স্ত্রীলোকের তিনিই পরম দেবতা । সেই সঞ্চিতপাত্তার স্তায় সর্বাংশে স্ত্রীস্বামী হইতে বিশেষ বন্ধু আমি ভাবিয়াও আর দেখিতে পাই না । যাহারা

কেবল ভোগসাধন করিতে তাঁহাকে অভিলাষ করে, সেই সকল ঐশ্বরিনী এই সমস্ত গুণদোষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জানকি, তাদৃশী হুঁচরিত্রা সকল অধর্ম্মে পতিত ও অবশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার তুল্য বাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী, পুণ্যশীলার জ্ঞায়, স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা হইয়া থাক।” (২।১১৭)

বৃদ্ধা ঋষিপত্নীর এই উপদেশবাক্যের প্রকৃত মূল্য জগতে পাওয়া যায় না। পাতিব্রত্যাধর্ম্মের এরূপ উচ্চ আদর্শ সংসারে অতিশয় দুর্লভ। এই উচ্চ আদর্শ দ্বারা অণুপ্রাণিত হইয়া নারীগণ আপনা-দিগকে পরিচালিত করিলে সংসারক্ষেত্র স্বর্গের শোভা ধারণ করিবে। প্রার্থনা করি, এই অমূল্য উপদেশমালা নারীমাত্রেয়ই কর্তৃহার হউক !

যিনি যে বিষয়টি প্রাণতুল্য ভালবাসেন এবং তাহার পালনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন ও তৎসম্বন্ধে সর্বদাই চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে সে বিষয়ে কোন উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার মনোমধ্যে কেমন এক প্রকার অসহিষ্ণুতা আসিয়া উপস্থিত হয়, কেমন এক প্রকার বিরক্তিতাবে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। জননীকে পুত্র-স্নেহ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার মনে যেমন বিচিত্রতাবের উদয় হয়, পতিব্রতাকেও পাতিব্রত্যা ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলে তাঁহার হৃদয়ও তদ্রূপ ভাবের লীলাভূমি হইয়া থাকে। সীতাকে যখনই কেহ পতিপরায়ণতাসম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তখনই আমরা তাঁহার বাক্যে কেমন এক প্রকার অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তি লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহাকে যেন সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদানের আবশ্যকতাই নাই ! সত্য বটে, সীতার মনে কোন অহঙ্কার ছিল না এবং তিনি আপনাকে পতিভক্তিসম্বন্ধে সমস্ত উপদেশের বহির্ভূতও মনে করিতেন না ; বরং স্বামীর প্রতি কর্তব্যপালন সম্বন্ধে তাঁহাকে

যাহা বলা হইত, তিনি সম্বন্ধে তাহা গ্রহণ করিতেন এবং তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। বালিকাবয়সে একরূপ উপদেশ সীতার পক্ষে অমূল্য রত্নস্বরূপ ছিল। কিন্তু এখন তিনি যৌবনারূঢ়া, এ সময়ে বিশেষ কোন উপদেশের সাহায্য ব্যতিরেকেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বামীর চরণতলে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং অকপট অনুরাগভরে সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। সামান্য উপদেশমধ্যে সাধারণতঃ যে কার্য্যানুষ্ঠানের শাসন থাকে, সীতাদেবী পতিপ্রেমের বশবর্ত্তিনী হইয়া তদপেক্ষাও গুরুতর কর্তব্যপালনে সর্ব্বদাই তৎপর আছেন এবং উপযুক্তস্থলে নিজ কর্তব্যজ্ঞানের সমুচিত পরিচয়ও প্রদান করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সীতাদেবী এক্ষণে পাতিব্রতরূপ ধর্ম্মরাজ্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন ; অতরাং তাঁহাকে পতিভক্তি সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিষয়ের উপদেশ দিলে তাঁহার মনে যে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতা আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি ? তাই রামের বনগমন-সময়ে কোশল্যার উপদেশের প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার এই অসহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এবং এই বৃদ্ধা তাপসীকেও প্রত্যুত্তরে যাহা বলিলেন তাহাতেও পাঠকপাঠিকাগণ উক্ত ভাব লক্ষ্য করিবেন। ফলতঃ, এতদ্বারা আমরা সীতার আশ্চর্য্য তেজস্বিতা উচ্চপ্রকৃতি ও ধর্ম্মবলেরই সম্যক্ পরিচয় পাইতেছি মাত্র।

সীতা অননুয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন “দেবি, আপনি যে আমার শিক্ষা দিছেন, আপনার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্যের কি ? কিন্তু আর্য্যো, স্বামী যে জ্বীলোকের গুরু, আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও দক্ষিণ ও হৃশ্রিত হন, তথাচ কিছুমাত্র বিধা ন্য করিয়া তাঁহার পরিচাক্ষণ্য নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু

যিনি জিতেন্দ্রিয়, গুণবান, দয়ালু, স্তিরামুরাগী ও ধার্মিক, এবং যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবৎসল, তাঁহার বিষয়ে আর কি বলবার আছে ? রাম যেমন কোশল্যােকে, সেইরূপ অগ্ন্যস্ত রাজপত্নীকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাম নারীমাত্রকেই মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাপসি, আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আৰ্য্যা কোশল্যা আমার যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিশ্বস্ত হই নাই, এবং বিবাহের সময় জননী অগ্নিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুলি নাই। ফলতঃ পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্তা, আত্মীয় স্বজন এ কথা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন এবং আপনিও উঁহার গ্ৰাম উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন * * * ।” (২।১১৮)

অনন্থরা জানকীর বাক্যে প্রীত হইয়া সন্নেহে তাঁহার মস্তক আশ্রয় করিলেন এবং তাঁহাকে সুরুচির মালা, বস্ত্র, আভরণ ও অঙ্গরাগ প্রদান করিলেন। সেই অঙ্গরাগে সীতার দেহ অপূর্ণ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। ঋষিপত্নী এইরূপে সীতার সম্মান ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়া তাঁহার নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত ও স্বয়ম্বর প্রভৃতি অপূর্ণ কথা শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজি সমাগত হইলে অনন্থরা বলিলেন “জানকি, সন্ধ্যা হইয়াছে, এখন আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতিসেবার প্রবৃত্ত হও। তুমি আজ মধুর কথা কীর্তন করিয়া আমার পরিতুষ্ট করিলে, এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।”

সীতা তাঁহার আদেশানুসারে নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন পূর্বক রামের নিকট গমন করিলেন। রাম সীতাকে সন্দর্শন করিয়া অনন্থরার প্রীতিদানে পরম সন্তোষলাভ করিলেন। লক্ষ্মণও সীতাদেবীর এই সংকারনিরীক্ষণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, রাম লক্ষ্মণ ও সীতা মহর্ষির নিকট
 বিদায় গ্রহণ করিয়া ভীষণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই
 মহারণ্য দূর হইতে ঘনক্লম্ব নিবিড় মেঘমালায় স্তায় পরিদৃষ্ট হইতে-
 ছিল; তাহা সুবিশাল তরুরাজিতে পরিপূর্ণ ও হৃৎশূন্য লতাজালে
 সমাকীর্ণ; তন্মধ্যে নিরন্তর ঝিল্লিকাধ্বনি হইতেছে এবং পক্ষিসকল
 ভয়ঙ্কর কোলাহল করিতেছে। কোথাও ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র
 জন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, কোথাও বা বিকটাকার রাক্ষসগণ
 সকলের সজ্ঞাস সমুৎপন্ন করিয়া নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিতেছে। স্থলে
 স্থলে ঋষিজনসেবিত মনোহর আশ্রমসকলও বনবিভাগ আলোকিত
 করিয়া বিরাজ করিতেছে। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত, তাহাদের
 অপূর্ব শোভা দর্শন করিয়া নয়নমন চরিতার্থ করিলেন এবং পবিত্র-
 স্বভাব তপস্বীগণ ও তাঁহাদের সমুচিত সৎকার করিয়া পরম প্রীতিলাভ
 করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী এতদিন মহারণ্যের অপূর্ব সৌন্দর্য্য-
 দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেছিলেন এবং বনভ্রমণলালসাও তাঁহার মনে দিন
 দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। মহাবীর রামচন্দ্রের ভূজবলের আশ্রয়ে
 থাকিয়া তিনি এপর্য্যন্ত বনবাসজনিত বিশেষ কোন কষ্টই প্রাপ্ত হন
 নাই। কিন্তু বনবাস যে নিরবচ্ছিন্ন সূখের নহে এবং সেখানে যে
 মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর বিপদসকলও উপস্থিত হয়, একদিন সীতা তাহা
 বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। একদা প্রভাতকালে রামচন্দ্র সুনিগণকে
 সম্ভাষণ করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।
 কিয়দূর যাইতে না যাইতেই, বিরোধনামে এক বিকটদর্শন রাক্ষস
 আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং সীতাকে স্বল্পে উত্তোলন
 পূর্বক রাম লক্ষ্মণের বিনাশসাধনে যত্নবান্ হইল। রাম সীতার এই
 আকস্মিক বিপৎপাতে শোকাকুল হইলেন, এবং তদগোঁই ধমুর্কীগণ
 গ্রহণপূর্বক ছুঁই নিশাচরকে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

রাক্ষস রামশরে তাড়িত হইয়া সীতাকে ভূমিতলে সংস্থাপন পূর্বক ভ্রাতৃযুগলকে রোষভরে আক্রমণ করিল, এবং তাঁহাদিগকে স্বল্পে আরোপণ করিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। সীতাদেবী স্বামী ও দেবরের এই হৃদশা দেখিয়া, বিগ্না কুররীর স্ত্রায়, ক্রন্দন করিতে করিতে রাক্ষসের অনুসরণ করিলেন এবং কৰুণস্বরে বলিতে লাগিলেন “রাক্ষস, তুমি এই স্থলীল সত্যপন্নায়ণ রাম ও লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর এবং উহাদের পরিবর্তে আমাকে লইয়া যাও।” রাম ও লক্ষ্মণ সীতার বিলাপ শ্রবণ করিয়া বিরোধের বাহুযুগল ভগ্ন করিলেন এবং তাহাকে ভূমিতলে আকর্ষণ ও অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিলেন। বিরোধ প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহারা অচিরে ভরবিহ্বলা জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন।

জানকী এই এক ঘটনা হইতেই বনবাসের দুঃখসকল অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। স্বামীর সহিত যে কোন কষ্ট সহ্য করিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। স্বামিবিরহিত হইয়া স্বর্গস্থও মিথ্যা। বাহাহউক, সীতার মনে কোন শঙ্কা না হইলেও রাম ও লক্ষ্মণ অতঃপর বিশেষ সতর্কতার সহিত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অরণ্য অতিশয় দুর্গম, এরূপ অরণ্যে তাঁহারা আর কখনও প্রবেশ করেন নাই। তাই রামচন্দ্র একটা নিরুপদ্রব ও ভরশূন্য স্থানের অবেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনতিদূরে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রম ছিল। তাঁহারা আশ্রম মধ্যে প্রবেশ পূর্বক মহর্ষিকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি প্রীতমনে তাঁহাদিগকে আতিথেয় নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে শিষ্টাচার পরিসমাপ্ত

হইলে, রাম বলিলেন “তপোধন, এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইব, আপনি আমার তাহাই বলিয়া দিন।” তখন শরভঙ্গ রামকে মহর্ষি স্মৃতীক্ষের নিকট বাইতে বলিয়া তাঁহারই সমক্ষে অগ্নিশ্রবণ পূর্বক দেহ বিসর্জন করিলেন। শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, সেই আশ্রমবাসী ঋষিবর্গ রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া হরস্তু রাক্ষসগণের উৎপীড়ন হইতে পরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন। রাজাই ধর্মের রক্ষক; স্ততরাং তিনি ধর্মকে রক্ষা না করিলে কে আর তদ্বিষয়ে সমর্থ হইবে? ঋষিগণ রামচন্দ্রের শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। রাম পিতৃসত্যপালনার্থ দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছেন, তিনি সর্বদাই ঋষিগণের আজ্ঞাবীন; বাহাতে তাঁহারা নিরুপদ্রবে ধর্মসাধন করিতে পারেন, রাম তদ্বিষয়ে অবশ্রুই প্রাণপণে সহায়তা করিবেন। তিনি বীর লক্ষণের সাহায্যে ঋষিকুলকণ্ঠক রাক্ষসগণকে নিশ্চরই নিহত করিবেন। এইরূপে ঋষিগণকে আশ্বস্ত করিয়া রাম তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে মহর্ষি স্মৃতীক্ষের আশ্রমে উপনীত হইলেন।

স্মৃতীক্ষ তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রকে তাঁহার আশ্রমেই বাস করিতে অমুরোধ করিলেন; কিন্তু রাম মহর্ষির প্রস্তাবে কিছুতেই সন্মত হইলেন না। অনন্তর সকলে স্মৃথে সেই নিশা মহর্ষির আশ্রমে যাপন করিলেন। পরদিন সূর্যোদয় হইলে, রাম তাঁহাকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন “ভগবন্, আমরা আপনার সৎকারে তৃপ্ত হইয়া স্মৃথে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে অমুমতি করুন প্রস্থান করি। এই দণ্ডকারণ্যে পুণ্যলীল ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমসকল দর্শন করিতে আমাদের একান্ত অভিলাষ হইয়াছে এবং এই তাপসেরাও আমাদের তদ্বিষয়ে বারম্বার দ্বরা দিতেছেন। অতএব এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনি ইহাদের সহিত আমাদের

গমনে অনুমতি প্রদান করুন ।” এই বলিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত, মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন । মহর্ষিও তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া দণ্ডকারণ্য পর্য্যটনের পর পুনর্বার তাঁহার আশ্রমে আগমন করিতে অনুরোধ করিলেন ।

যেদিন রামচন্দ্র ঋষিগণের সমক্ষে রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই সীতার মন নানা চিন্তার আকুল হইয়াছিল । সীতাদেবী রামকে কোন একটা কথা বলিতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত অবসরাভাবে তিনি এপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হন নাই । সীতা রামচন্দ্রের কেবলমাত্র পত্নী বা সহচারিণী সখী ছিলেন না, তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও জীবনপথের একমাত্র সঙ্গিনী । সীতা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে ধর্ম্মসাধনই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং বিবাহই সেই ধর্ম্মসাধনের পরম সহায় । এই নিমিত্তই বিবাহের এত পবিত্রতা ! পবিত্র বিবাহসূত্রে গ্রথিত হইয়া দুইটি মানবাত্মা একত্বীভূত হয় এবং উভয়ে পরস্পরের বলে বলীয়ান হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া থাকে । কেবল বিবাহদ্বারাই দুইটি অপূর্ণ মানব পূর্ণ হইয়া প্রাপ্ত হয় । স্বামী আপনার পুণ্যবলে স্ত্রীকে রক্ষা করেন এবং স্ত্রীও আপনার পুণ্যবলে স্বামীকে রক্ষা করেন । দুইয়ের মধ্যে একের হীনতা থাকিলে, অন্নেরও হীনদশা উপস্থিত হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত মানবজীবনের পূর্ণতা বিকাশ করিতে হইলে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই অক্ষয় ধর্ম্মবল সঞ্চয় করিতে হয় । যেখানে ধর্ম্মে স্ত্রীর অধিকার নাই এবং স্বামীও তৎকর্তৃক পরিচালিত হন না, সেখানে বিবাহ প্রকৃত বিবাহনামের যোগ্যই নহে, সেখানে পত্নীর আবার পত্নীত্ব কোথায় ? স্ত্রীর কর্তব্য ও অধিকার কি, আমাদের সীতাদেবী তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন । তিনি স্বামীর কেবলমাত্র দৈহিক ও মানসিক মঙ্গলচিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন না, তিনি তাঁহার

আত্মারও মঙ্গলকামনা করিতেন । যে কার্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বামী ধর্মপথ চাইতে পরিভ্রষ্ট হইতে পারেন, সীতা সযত্নে ও স্নমধুর বাক্যে তাঁহাকে সে কার্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন । সত্যবটে, জনকতনয়া স্বামীকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও নির্মল ধর্মজ্ঞানেও বিশেষ আস্থা প্রকাশ করিতেন । রামচন্দ্র যে সীতা অপেক্ষা সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং তিনি যে কদাচই সীতার উপদেশের পাত্র নহেন, সীতাদেবীর ইহাও বিলক্ষণ হৃদ্বোধ ছিল । কিন্তু তাঁহার এ জ্ঞান থাকিলেও তিনি প্রিয়তম আর্ষাপুত্রকে কখন কোনও অন্ত্যায় কার্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিলে, মুহুমধুরবাক্যে তাঁহার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেন এবং তাহা হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন । সীতাদেবী আপনার এই অধিকারটি উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন । এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে, রামচন্দ্রও কখনও সীতার হিতকর বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিতেন না ; তিনি শুদ্ধস্বভাবা জ্ঞানকীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন । শ্রদ্ধাই তাঁহাদের প্রেমের মূলভিত্তি ছিল । যেখানে এই মূলভিত্তি বিদ্যমান নাই, সেখানে পবিত্র প্রেম কিরূপে বিরাজিত থাকিবে ?

সে যাহাহউক, ভর্তাকে কোন একটা কথা জ্ঞাপন করিতে সীতা বড় সমুৎসুক হইয়াছিলেন । রাম ঋষিগণসমক্ষে রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞা করিলে, সীতার ধর্মপ্রবণ সরল মন চমকিত হইয়া উঠিল । সীতা স্বয়ং বিহ্বলী ছিলেন না ; ইদানীন্তন কালের ত্রায় জীশিকা তৎকালে বহুলরূপে প্রচলিত ছিল না ; সুতরাং সীতাদেবী স্বয়ং কোন শাস্ত্রগ্রন্থই পাঠ করেন নাই । কিন্তু ইহাতে তাঁহার ধর্মজ্ঞানলাভের কোনও বাধাত উপস্থিত হয় নাই । পিতৃগৃহে পূজ্যপাদ জনক ও ঋষিগণের মুখে, এবং যশোরালয়ে স্বয়ং স্বামীর সন্নিকটে, তিনি অনেক শাস্ত্রোপদেশ

শ্রবণ করিয়াছেন । উপদেশ লাভ করিলেই যে বিশেষ ধর্মজ্ঞান হয়, আমরা সে কথা বলিতেছি না ; ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে সাধনের সামগ্রী । সীতা বিদ্রুঘী না হইলেও নিজজীবনে এই ধর্ম সাধন করিয়াছিলেন, সুতরাং ধর্মের স্বল্প তত্ত্বসকল তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল । স্বামী তাপসত্বত অবলম্বন পূর্বক যে হিংসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, ইহা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত ও ধর্মসঙ্গত নহে । রামচন্দ্র যখন রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞা করেন, তখনই সীতা তাঁহাকে নিজ অভিমত জ্ঞাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের সম্মুখে লজ্জাবশতঃ তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই । আজ সুতীক্ষ্ণের আশ্রম হইতে পথে বাইতে বাইতে সীতা অবসর বুঝিয়া রামকে বলিতে লাগিলেন “নাথ, ধর্ম অতিশয় স্বল্পবিধানের গম্য ; সর্ব্বপ্রকার ব্যসন হইতে মুক্ত না হইলে কদাপি ধর্মলাভ হয় না । ব্যসন তিনপ্রকার ;—মিথ্যাকথন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও বৈরব্যতীত রোদ্ভাব ধারণ । পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটি দোষ তোমাকে কখনও স্পর্শ করে নাই ; তুমি সততই সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জগদ্বিখ্যাত আছ । কিন্তু নাথ, তোমাতে অকারণ প্রাণিহিংসারূপ কঠোর ব্যসনটি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে । তুমি বনবাসী ঋষিগণের রক্ষাবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষসবধ স্বীকার করিয়াছ এবং সেই নিমিত্তই ধনুর্ধার লইয়া লক্ষ্মণের সহিত ভীষণ দণ্ডকারণ্যে বাইতেছ । কিন্তু তোমার বাইতে দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইতেছে । আমি তোমার কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতেছি, তোমার স্বথ ও স্বথসাধনই বা কি চিন্তা করিতেছি ; চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে । তুমি যে দণ্ডকারণ্যে যাও, আমার এরূপ ইচ্ছা নহে । তথায় গমন করিলে, নিশ্চয়ই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে । কারণ শরাসন সঙ্গে থাকিলে ক্ষত্রিয়দিগের তেজ স বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ।” (৩।৯)

এই বলিয়া সীতা এক আখ্যা কীৰ্ত্তন করিলেন । ইহু কোন এক ঋষির তপোবিঘ্নমানসে তাঁহার নিকট একটা খড়্গ ত্রাসস্বরূপ রাখিয়া যান । ঋষি ত্রাসরক্ষাতৎপর হইয়া খড়্গ ব্যতীত কোথাও বাইতেন না । এইরূপে খড়্গের নিত্যসংস্পর্শে ঋষি প্রাণিহত্যার মত্ত হইলেন, এবং অত্যন্তকাল মধ্যে তাঁহার সমুদয় তপস্তাও বিনষ্ট হইয়া গেল ! অতঃপর সীতা রামচন্দ্রকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন “নাথ, আমি তোমায় শিক্ষাদান করিতেছি না ; অল্পসংশ্রবে লোকের যে চিত্তবৈপরীত্য ঘটয়া থাকে, আমি স্নেহ ও বহুমানবশতঃ তোমাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিলাম । অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্যা করা উচিত নহে ; বনবাসী আৰ্ত্তদিগের পরিভ্রাণ হয়, ক্ষত্রিয়বীর শরাসনে এই পর্য্যন্তই করিবেন । শত্রু কোথায়, আর বনই বা কোথায় ? ক্ষত্রিয়-ধর্ম কোথায়, আর তপস্তাই বা কোথায় ? এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই । বাহা তপোবনের ধর্ম তুমি তাহারই সম্মান কর । তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্ম-চরণে প্রবৃত্ত হও । ধর্ম হইতে অর্থ, ধর্ম হইতে মুখ এবং ধর্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয় ; তুমি সকলই জান ; তোমায় ধর্মোপদেশ প্রদান করে এমন কে আছে ? আমি কেবল জীজনসুলভ চপলতায় এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণের সহিত সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ, এবং বাহা অভিক্রটি হয়, অবিলম্বে তাহারই অহুষ্ঠান কর ।” (৩৯)

সীতা এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, ধর্মপরায়ণ রাম পতিপ্রণয়িনী প্রিয়ভবার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । দণ্ডকারণ্যচারী রাক্ষসগণ তপোনিরত নিরীহ ঋষিবর্গকে বিনষ্ট এবং নানাপ্রকারে তাঁহাদের তপোবিঘ্ন সমুৎপন্ন করিতেছে । ঋষিকুল রামের শরণাগত হইয়াছেন । আৰ্ত্তকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । রাম সেই ক্ষাত্রধর্মের বশবর্তী হইয়াই তাঁহাদিগকে অভয়প্রদান করিয়াছেন । নরমাংসলোলুপ

রাক্ষসগণকে বধ করিয়া অরণ্যকে নিরুপদ্রব করা রামের একান্ত কর্তব্য। এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে বলিতে লাগিলেন “জানকি, আমি ঋষিগণের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অভ্যর্থনা করিতে পারিব না। বরং স্নাতকতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু একবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। প্রার্থনা না করিলেও যাহা করিতাম, অঙ্গীকার করিয়া কিরূপে তাহার বৈপরীত্য আচরণ করিব ? জানকি, তুমি স্নেহ ও সৌহার্দ্যানিবন্ধন যাহা কহিলে, শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অগ্রিয়কে কেহ কখন কিছু কহিতে পারে না। তুমি যেরূপ কূলে উৎপন্ন হইয়াছ, এই বাক্য তাহার ও তোমারও অমুরূপ সন্দেহ নাই। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, এক্ষণে আমার এই সঙ্কল্পে অনুমোদন কর।” (৩।১০)

সীতাদেবীর ধর্মসঙ্গত বাক্যে রামের প্রত্যুত্তর যাহাই হউক না কেন, পরম্পরের মধ্যে রাম ও সীতার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, এবং সীতা স্বামীর প্রতি আপনার কর্তব্যগুলি কেমন সুন্দররূপে পালন করিতে যত্নবতী ছিলেন, ইহাই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা রামায়ণ হইতে উল্লিখিত কথোপকথনগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি, পাঠকপাঠিকাগণ স্বামী জীর এই সম্বন্ধটি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

রাম সুরূপা জানকী ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের সহিত সেই দণ্ডকারণ্যের নানাস্থল পর্য্যটন করিলেন। তাঁহারা কত আশ্রম, নদ নদী, গিরি গুহা, বন উপবন, পঞ্চল সরোবর দর্শন করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন ; কোথাও নানাবিধ জলচর ও খেচর পক্ষী, কোথাও যুথবদ্ধ হরিণ, মদোন্মত্ত সশৃঙ্গ মহিষ ও দলবদ্ধ হস্তী, কোথাও ভীষণ বরাহ ও

শাখাকৃত বানর, এবং কোথাও বা বিকটাকার রাক্ষস দর্শন করিয়া তাঁহারা হৃদয়মধ্যে কখনও ভয় এবং কখনও বা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রামলক্ষণ কত যে ঋষিতপস্বীর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া বিমল প্রীতি লাভ করিলেন, সীতাদেবী কত যে ঋষিপত্নী ও ঋষিকন্ডার সহিত সদালাপ করিয়া আনন্দিত হইলেন, এস্থলে তাহা বর্ণনীয় নহে। তাঁহারা কোথাও সম্বৎসর, কোথাও দশ মাস, কোথাও চারি মাস, কোথাও ছই মাস, এবং কোথাও বা তদপেক্ষাও অল্প দিন বাস করিয়া সেই অরণ্যমধ্যেই দশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপে দণ্ডকারণ্যপর্য্যটন শেষ হইলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র মহর্ষি স্মৃতীক্লেব্র আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়দিন সেই স্থলেই স্থখে বাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র, ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত, মহর্ষির আশ্রমে আনন্দে কালযাপন করিতেছেন, সহসা একদিন অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে তাঁহার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী হইল। মহর্ষির আশ্রম তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল; স্মৃতরাং স্মৃতীক্লেব্র নির্দেশানুসারে তিনি, লক্ষণ ও সীতা সমভিব্যাহারে, তথায় গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। স্মৃতীক্লেব্র সন্মুখ হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা সেই স্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন পথ অতিক্রম করিয়া অগস্ত্যের ভ্রাতা মহর্ষি ইন্দ্ৰবাহের তপোবনে উপস্থিত হইলেন। এই তপোবন অতিশয় রমণীয়। রাম, ভ্রাতা ও স্ত্রীর সহিত, তথায় রাজ্য যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে অগস্ত্যের আশ্রমভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে, বনের অপূর্ব শোভা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত ও পুলকিত হইতে লাগিলেন। ন্যূনাধিক এক যোজন পথ অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই, অদূরে অগস্ত্যাশ্রম পরিদৃষ্ট হইল। রাম তেজঃপ্রদীপ্ত মহর্ষির পবিত্র আশ্রমের শাস্ত্যাব ও শোভা দেখিয়া তৎসন্নিহিত স্থানেই বনবাসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

তঁাহারা আশ্রমের নিকটবর্তী হইবামাত্র, মহাবীর লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া মহর্ষিসন্নিধানে রামচন্দ্র ও দেবী জানকীর আগমনসংবাদ প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি তঁাহাদের আগমনবার্তা প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং তদন্তেই তঁাহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক আশ্রম মধ্যে আনয়ন করিতে এক সুবোধ্য শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে স্বয়ং অগস্ত্যও রামচন্দ্রের প্রত্যাগমনার্থ ঋষিগণের সহিত গাত্রোখান করিলেন; তিনি অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী উপস্থিত হইয়া তঁাহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি প্রীতিসহকারে তঁাহাদের যথাবিধি সৎকার করিলেন, এবং তঁাহারা তঁাহাকেই দেখিতে আসিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া পরম আশ্লাদিত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন,

“তোমরা জানকীকে লইয়া আমায় অভিবাদন করিতে আসিয়াছ; রাম, ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও; লক্ষ্মণ, আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এক্ষণে, পথশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, জানকীও নিশ্চয় বিশ্রামার্থ উৎসুক হইয়াছেন। এই স্নকুমারী কখনও ক্লেশ সহ করেন নাই, কেবল পতিস্নেহে দুঃখপূর্ণ বনে আসিয়াছেন। রাম, এখানে ইনি যেক্রমে সুখে থাকেন, তুমি তাহাই কর। তোমার অনুসরণ করিয়া, ইনি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতেছেন। ইনি সকল প্রকার দোষশূন্ত হইয়া, সুরসমাজে দেবী অরুন্ধতীর স্তায়, পতিব্রতীর অগ্রগণ্য হইয়াছেন। বৎস, তুমি ইহাঁকে ও লক্ষ্মণকে লইয়া বাস করিলে, এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই।” (৩।১০)

রাম মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাজলিপুটে বিনীতবচনে কাহিলেন “তপোধন, আপনি গুরু; যখন আপনি আমাদের গুণে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমরা ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। যেখানে বন আছে এবং জলও সুলভ, আপনি আমাকে এমন একটা স্থান

নির্দেশ করিয়া দিন ; আমি তথায় কুটীর নির্মাণ পূর্বক স্থখে বাস করিব ।” মহর্ষি কণকাল চিন্তা করিয়া রামকে সেই স্থান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামক রমণীয় বনে বাস করিতে পরামর্শ দিলেন । রাম উহার পরামর্শানুসারে পঞ্চবটী যাইতে সক্ষম করিলেন, এবং মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় উপনীত হইলেন ।

পঞ্চবটী একটা সুন্দর পুষ্পিত কানন । অদূরে নির্মলসলিলা গোদাবরী প্রবাহিত হইতেছে ; স্থলে স্থলে রমণীয় সরোবরে স্নগন্ধি পদ্মসকল প্রফুল্লিত রহিয়াছে । গোদাবরীতীরে হংস সারস ও চক্রবাক সকল অনবরত ক্রীড়া করিতেছে ; তীরভূমি কুসুমিত বৃক্ষসকলে পরিপূর্ণ । চতুর্দিকে গভীর অরণ্য ; তন্মধ্যে দলে দলে মৃগ সকল সঞ্চরণ করিতেছে । ময়ূরের কেকাদ্বনি ও কোকিলের কুহরবে বায়ুমণ্ডল নিরন্তর সুধরিত হইতেছে । কিয়দূরে পর্বতশ্রেণী ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার স্তায় শোভা পাইতেছে । অরণ্যে নানাজাতি বৃক্ষ ; সাল, তাল, তমাল, খজুর, আম্র, অশোক, তিলক, চম্পক, কেকাদ্বী, চন্দন, শমী, ধব, খদির, কিংকর প্রভৃতি তরুরাজি কুসুমিত লতাজালে জড়িত হইয়া রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে । রাম প্রিয়তমা জানকীর সহিত আনন্দোৎফুল্লমনে সেই স্থান অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণকে একটা সুন্দর সমতল ও পুষ্পবৃক্ষপরিপূর্ণ স্থলে কুটীর নির্মাণের আদেশ করিলেন । লক্ষ্মণও অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রস্তুত উৎকৃষ্টভক্ষ্যশোভিত সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন । উহার ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য্য সম্পাদিত হইল ; এবং উহা শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর ও পত্রৈ আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংবদ্ধ হইল । কুটীরখানি মনোরম হইয়াছে দেখিয়া, রাম অতিশয় প্রীত হইয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন । অনন্তর

যথাবিধি বাস্তবশাস্তি করিয়া রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, সেই
কুটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । সীতাদেবী সেই নির্জনপ্রদেশের অগুরু
শোভা দেখিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন । মনোরম পঞ্চ-
বটী তাঁহার চক্ষে পিছুগৃহ অপেক্ষাও সুখকর বোধ হইতে লাগিল ।

অষ্টম অধ্যায় ।

সুরম্য পঞ্চবটী বনে রাম পরম সুখেই কালযাপন করিয়াছিলেন ।
নির্জন বন, তাহাতে অগণ্য কুসুমিত বৃক্ষ ও লতা; নানাবিধ পক্ষী
তাহাতে বাস করিত । ময়ূরসকল ময়ূরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া
তাহাদের পরিচ্ছন্ন কুটীরঙ্গনে নৃত্য করিত । রাম জানকীর সহিত
মৃগচর্মে উপবেশন পূর্বক তাহাদের নৃত্য দেখিয়া কতই আনন্দলাভ
করিতেন । কখন কখন হরিণহরিণীদল শান্তভাবে তাহাদের আশ্রমের
চতুর্দিকে বিচরণ করিত, এবং এক এক বার হরিণনয়না সীতার
মুখপানে বিশ্বাসপূর্ণ বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার নিঃশব্দচিহ্নে
সুকোমল তৃণভঞ্জে রত হইত । সীতার অমানুষী মূর্তিদর্শনে
তাহারা সমস্ত আশঙ্কাই পরিহার পূর্বক গৃহপালিত পশুর ত্রায় তাহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত । কত মনোহর সুকণ্ঠ পক্ষী আসিয়া
প্রাঙ্গণস্থ পুষ্পিত বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্বক সুললিত গানে সীতার
কর্ণকুহরে অমৃতধারা বর্ষণ করিত ! সীতা কখন কখন স্বামীর সহিত
অরণ্যে ভ্রমণ করিতেন । ভ্রমণকালে তিনি কত সুগন্ধ পুষ্পই চয়ন
করিতেন ! সেই পুষ্পসকলে সীতা নানা প্রকার ভূষণ রচনা করিয়া
অঙ্গে ধারণ করিতেন । রামচন্দ্র জানকীর বনদেবীর ত্রায় অপূর্ব
শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতেন । কখন বা রামও তমালবৃক্ষের
সুগন্ধি পল্লব দ্বারা সীতার নিমিত্ত মনোহর কর্ণভূষণ রচনা করিতেন,
এবং স্বহস্তে তাহা প্রিয়তমার গুত্র গওদেশে লবিত করিয়া আনন্দিত
হইতেন । সীতাও প্রিয়ভ্রমের ঈদৃশ আদর ও প্রীতিদানে সঘর্ষিত হইয়া
লজ্জার সঙ্কচিত হইতেন । লজ্জা ও আনন্দ একত্র সম্মিলিত হইয়া

সীতার মুখমণ্ডলে স্বর্গের শোভা আনয়ন করিত। কোন কোন দিন সীতা পতির সহিত কমলদলশোভিত স্বচ্ছ সরোবরে গমন করিয়া স্বহস্তে নানাজাতি কমল উজ্জ্বল করিতেন; কখনও বা হংসসারস-নির্নাদিত গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইয়া স্বামীর সহিত তাহার বিচিত্র শোভা দর্শন করিতেন। সীতার চরণে শ্রুতিমধুর নৃপুরধ্বনি শ্রবণ পূর্বক রাজহংসশ্রেণী গ্রীবা নত করিয়া অক্ষট স্বরে বিরাক্ত করিতে করিতে তাঁহার পদাঙ্গুসরণ করিত। কখনও বা সীতা রামের সহিত মির্ভয়ে শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া ভীষণ গুহা নিম্নে পতিত ভূমি ও কৃত ভয়ঙ্কর স্থান দর্শন করিতেন। লক্ষ্মণ আলম্বশূন্য হইয়া সর্বদাই তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ভ্রাতৃবৎসল এই বীর রাজকুমার ধর্ম্মরূপহস্তে সেই আশ্রমকে সমস্ত বিপদাশঙ্কা হইতে সর্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি গোদাবরী হইতে প্রত্যহ নির্মল জল আনয়ন করিতেন; স্বহস্তে ফল, মূল, পুষ্প, কুশ, কাশ ও সমিধ আহরণ করিতেন এবং রাম ও সীতার পরিচর্যাতে সর্বদাই নিযুক্ত থাকিতেন। সীতাদেবী রামচন্দ্রের সহিত পরিচ্ছন্ন শিলাতলে উপবেশন পূর্বক দেবর লক্ষ্মণের প্রশংসা করিয়া কতই আনন্দ লাভ করিতেন। রাম ও লক্ষ্মণের উপর সীতার স্নেহ দর্শন করিয়া অতিশয় পুলকিত হইতেন।

রামচন্দ্র তাপসোচিত সমস্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন করিতেন। তিনি ত্রিকালীন স্নান, দেবোপাসনা, বস্ত্র ফলমূলে জীবনধারণ ও অস্তান্ত সমস্ত কৰ্ত্তব্যকর্ম্মই সম্পাদন করিতেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি লক্ষ্মণের সহিত কখন কখন যুগবয়্যাহ প্রভৃতি ভক্তগণকে বধ করিয়া তাহাদের পবিত্র মাংস ভক্ষণ করিতেন, কিন্তু তিনি কদাপি অকারণ প্রাণিহিংসাতে মত্ত হইতেন না। তিনি সীতার সহিত বিভিন্ন ঋতুতে প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্নপ্রকার শোভা দেখিয়া

পুলকিত হইতেন। বনযটাসমাচ্ছন্ন বর্ষাকালে কুটারের মধ্যে আবদ্ধ হইরা তাঁহারা স্থতির সাহায্যে কখন কখন আপনাদের পূর্বকথা শ্রবণ পূর্বক বিবাদের মধ্যেও কেমন এক প্রকার মধুর আনন্দ অনুভব করিতেন। এসময় শরৎকালে শুভ্রনীরদধংশোভিত সুনীল আকাশ, পুন্নিভ কাশ, কুমুদকল্লারশোভিত নির্মল সরোবর, পরিকৃত বনস্থলী, তৃণশস্যসমাচ্ছন্ন শ্রামল ক্ষেত্র, পল্লবিত তরু, দোহল্যামানা কুমুমিতা লতা প্রভৃতি সন্দর্শন পূর্বক তাঁহারা অবোধ্যার কত কথাই শ্রবণ করিতেন। দারুণ হিমমত্তত্বে পত্রপুষ্পশূন্য বৃক্ষরাজি, নীহারক্লিষ্ট বিত্তক কমল, তৃণশূন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র, ক্ষীণতেজা সূর্য্য, কুজবাটিসমাচ্ছন্ন প্রভাত, নিরানন্দ পক্ষী, কণহারী দিবস, স্থলীর্থ যামিনী, ভূবারশীতল বায়ু ও কচিং মেঘাবৃত আকাশ দেখিরা তাঁহাদের মনে আনন্দের উজ্জেক হইত না, বরং হৃদয় কখন কখন বিবাদভারে আক্রান্ত হইরা পড়িত। সীতা পট্টবস্ত্র ও কাষায়বসন দ্বারা শীত নিবারণ করিতেন; অটাবকলধারী রামলক্ষ্মণ শুষ্ক কাষ্ঠ এবং মৃগ ও বস্ত্র মহিষের শুষ্ক-পূরীষপ্রাক্লিষ্ট অগ্নিদ্বারা কথাকিত শীতক্লেশ বিদূরিত করিতেন। কিন্তু যখন বসন্তের মৃদুপদসঙ্কারে মলয়সমীরল্লার্শে পক্ষীর কণ্ঠে স্তমধুর পান ফুটিত, তরুদেহে কোমল পল্লবরাজি উত্তির ও পুষ্পরাশি বিকশিত হইত, যখন জলে স্থলে ও শূন্যদেশে সজীবতা ভিন্ন অস্ত্র কিছুই লক্ষিত হইত না, যখন চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিরা ধরাকে পুষ্পময়ী বা আনন্দময়ী বলা যাইতে পারিত, তখন তাঁহারা সকলেই হৃদয়ে নববল অবোৎসাহ ও নব নব আনন্দ অনুভব করিতেন। সীতাদেবী তখন কেবল পুষ্পচরনেই ব্যগ্র থাকিতেন, মহত্তরোণিত শিশু বৃক্ষগুলির লালন পালনেই ব্যস্ত থাকিতেন, হরিণশিশুদের সহিত ক্রীড়াতেই মত্ত থাকিতেন, এবং তরুতার সহিত বন, উপবন, শিথি, নির্ঝর প্রভৃতি দর্শন করিতে সর্বদাই সন্মুগ্ন হইতেন।

এইরূপ স্থখ ও স্বাচ্ছন্দ্য সেই পঞ্চবটীবনে তাঁহাদের দিন অতি-
বাহিত হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহাদের একটা গুরুতর বিপৎপাতের
উপক্রম হইল। একদিন রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত, নিশ্চিন্ত-
মনে কুটীরে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে শূৰ্পণখানার এক রাক্ষসী
সেই অরণ্যে বদৃচ্ছাক্রমে পরিলম্বন করিতে করিতে তাঁহাদের সমীপস্থ
হইল। রাক্ষসী রামলক্ষ্মণের অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া
তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিল, এবং
নির্লজ্জার ভাৱ সীতার সমক্ষেই আপনার ঘৃণিত মনোভাব ব্যক্ত
করিল। রামলক্ষ্মণ দুর্জয়তার নীচাকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া তাহার প্রতি
ঘৃণা ও তাজ্জিয়া প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন শূৰ্পণখা তাঁহাদের
ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়বিহ্বলা সীতাকে ভরুণমানসে মুখব্যাদান
পূৰ্ব্বক বেগে ধাবমান হইল। লক্ষ্মণ রাক্ষসীর এই আচরণ দর্শন
করিয়া খড়্গধারা তৎক্ষণাৎ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন, কেবল
জীবধে ঘৃণা বশতঃই তাহার প্রাণ নাশ করিলেন না। রাক্ষসী
এইরূপে বিকৃপা হইয়া বস্ত্রাঘাত ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে সেই
স্থান পরিত্যাগ করিল।

শূৰ্পণখা রাবণ নামে এক প্রবল প্রতাপাবিত রাক্ষসের ভগিনী।
রাবণ লঙ্কাদ্বীপের অধীশ্বর। ধনদূষণ নামে ছই ভ্রাতা চতুর্দিশসহস্র
রাক্ষস সৈন্তের সাহায্যে এই দুর্জয়তাকে সর্বদা রক্ষা করিত। পঞ্চবটীর
অদূরেই জনস্থান নামক প্রদেশে ইহার বাস করিত, এবং ঋষিগণের
আশ্রমে সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের তপোবির সমুৎপাদন পূৰ্ব্বক
প্রাণবিনাশ করিত। শূৰ্পণখা নাসাকর্ণ বিহীন হইয়া ক্রন্দন করিতে
করিতে ভ্রাতৃগণের সমুখে আত্মপূৰ্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিল।
রাক্ষসেরা শূৰ্পণখার দুর্দশাদর্শনে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া রামলক্ষ্মণের
উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে মহাবেগে চতুর্দিকে ধাবমান হইল। রামচন্দ্র

দূর হইতেই রাক্ষসগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া সতর্ক হইলেন । ঘোরতর যুদ্ধ অনিবার্য্য ভাবিয়া তিনি সীতাদেবীর জন্ত চিন্তিত হইলেন । কিয়ৎকণ চিন্তা করিয়া তিনি লক্ষ্মণকে জানকীর সহিত শত্রুর দ্বন্দ্ববেশে এক গিরিশুভার আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন এবং তাঁহাকে সর্বপ্রকার ভয় ও বিপদ হইতে রক্ষা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । এদিকে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে চতুর্দিক্ হইতে রাক্ষস সৈন্তগণ প্রবল বজ্র-জলের স্তার ভীমপরাক্রমে ও অমিততেজ্রে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল । মহাবীর রামচন্দ্র পর্বতের স্তার অচলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া একাকী তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । রাক্ষস সৈন্তগণ তাঁহার তীক্ষ্ণ শরজাল সহ্য করিতে অক্ষম হইলে, খরদূষণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তুমুল-সংগ্রাম আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছুতেই রামকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইল না । এইরূপ বহুকণ যুদ্ধের পর, তাহারা উভয়েই সমস্ত রাক্ষসসৈন্তের সহিত রামশরে মিহত হইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন হইল । যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে সীতা দেবী দেবরের সহিত গিরিভ্রম্ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং জীবিতেশ্বরকে অক্ষতশরীর দেখিয়া প্রবল বেগে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ।

অশুভকণ্ঠেই লক্ষ্মণ শূর্ণগর্ভাকে বিকৃতভাষী করিয়াছিলেন । রাক্ষসী সমস্ত সৈন্তের সহিত ভ্রাতৃদ্বয়কে বনস্থলে নিপাতিত দেখিয়া লঙ্কার পলায়ন করিল । তথায় সেই অসাধুদর্শিনী অশ্রুপূর্ণলোচনে রাবণকে আপনার দুর্দশা ও খর দূষণ প্রভৃতির বিনাশ সংবাদ জ্ঞাপন করিল, এবং রাম লক্ষ্মণকে সংহার করিয়া সেই অসহ্য অপমানের প্রতিশোধ লইতেও উৎসাহিত করিতে লাগিল । সে রাবণকে বলিল যে সীতার তুল্য রূপবতী রমণী জগতে কোথাও বিদ্যমান নাই । সীতা রূপের হটর বনস্থলী আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে । সীতা অতিশয় গতিপ্রণয়িনী ; রাম সীতাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, এবং

লক্ষ্মণ ও রামের একান্ত অসুগত । রাবণ যদি সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে একমাত্র কার্য দ্বারা দুই উদ্দেশ্য অনায়াসে সংসাধিত হইবে । প্রথমতঃ, সীতার অভাবে রাম নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবে, এবং ভ্রাতার মৃত্যু হইলে লক্ষ্মণ ও আর জীবিত থাকিবে না । দ্বিতীয়তঃ, রাবণ সীতার দ্বারা এক দুর্লভ রমণীয় লাভ করিবেন । রাবণ যে সমস্ত সুন্দরী দেবকন্যা অপহরণ করিয়াছেন, তাহারা কেহই রূপে সীতার সমকক্ষ নহে । এই উপায় অবলম্বন না করিলে রাবণ সম্মুখবুকে রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া কখনই সীতাকে লইয়া আসিতে পারিবেন না । রক্তপাত ব্যতিরেকে যে উপায়দ্বারা অনায়াসেই শত্রুর সমুচ্ছেদ হয়, রাবণের তাহাই অবলম্বন করা কর্তব্য ।

এই রাবণ অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিল । তাহার অমিত পরাক্রম ও বিস্তর ঐশ্বর্য ; দেবতারাও তাহার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতেন । রাক্ষস কেবল পাখি ও ঐশ্বর্য ও পাশবিক ক্ষমতালাভের জন্তই বহুকাল দুষ্কর তপস্তা করিয়াছিল । সে ঘোর ইন্দ্ৰিয়পরতন্ত্র অনাচারী ও কদাচারী ছিল । সে যে কত শত সুরূপা কুলললনাকে পিতামাতা ও স্বামীর ক্রোড় হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই । তাহার জঘন্ত চরিত্রের আলোচনা করিলে ননোমধ্যে কেবল বিজাতীয় ঘৃণারই উদ্বেক হইয়া থাকে ।

এই দুঃস্থ রাক্ষস দুর্বৃত্তা, ভগিনীর মুখে সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া তজ্জাভবাসনায় চঞ্চল হইল । সে ভগিনীর বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাস্তুনা করিল ; এবং স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনার্থ তদগোঁই গর্দভবাহিত রথে লক্ষা হইতে জনস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল । সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া রাবণ মায়ারী মারীচের আশ্রমে উপনীত হইল । রাবণ মারীচের নিকট মনোগত দুঃখভিলসি ব্যক্ত করিয়া তাহাকে নিজ উদ্দেশ্যসাধনে

সহায়তা করিতে বলিল। মারীচ রামচন্দ্রকে বিলক্ষণ চিনিত। সে সিদ্ধাশ্রমে ষোড়শবর্ষীয় বালকের শরে তাড়িত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং সে রাবণের প্রার্থনায় কোন মতেই সম্মত হইল না, বরং তাহাকে ঈদৃশ দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত করিতে অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিল। কিন্তু হুরাকাজ্জ রাবণ মারীচের বাক্যে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে বিস্তর ভৎসনা করিল এবং ক্রকুটি সঞ্চালন করিয়া মৃত্যুভয়ও প্রদর্শন করিল। তখন মারীচ আপনার মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া রামশরেই প্রাণত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। রাবণ মারীচকে রজতবিন্দুচিত্রিত স্বর্ণময় এক মৃগের রূপ ধারণ পূর্ব্বক রামের আশ্রমে সীতার মনোহরণ করিয়া ইতস্ততঃ পরিলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করিল। সীতা সেই অপূর্ব্ব মৃগ দেখিয়া নিশ্চয়ই রামকে তাহা ধরিয়া দিতে বলিবে। রাম মৃগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, মারীচ তাহাকে প্রলোভিত করিয়া বহুদূরে লইয়া যাইবে এবং অকস্মাৎ “হা লক্ষ্মণ, হা সীতে” এই আর্তনাদমূচক বাক্যগুলি তারস্বরে উচ্চারণ করিয়া কোথায় অদৃশ হইবে। অনন্তর সীতা সেই আর্তনাদ শ্রবণমাত্র রামের বিপদাশঙ্কা করিয়া লক্ষ্মণকে নিশ্চয়ই রামের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিবে। সীতা তখন কুটীরে একাকিনী অবস্থান করিবে, রাবণ সেই অবসরে সীতাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আকাশপথে লঙ্কায় আগমন করিবেন। মারীচ রাবণের এই অসাধু প্রস্তাবে সম্মত হইবামাত্র মন্দ-ভাগিনী সীতার সুখের দিন অবসান হইল।

একদিন সীতাদেবী প্রফুল্লচিত্তে আশ্রমসন্নিহিত কদলীবনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং কখন কখন কর্ণিকার ও অশোকবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনন্দে নানাবিধ ভূষণ রচনা করিতেছেন। অদূরে রামলক্ষ্মণ এক বৃহৎ শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। হরিণহরিণীসকল সীতার সন্নিকটে সুকোমল ভূণদল ভক্ষণ করিতেছে, কখনও বা হরিণশিশুগুলি

আনন্দে লক্ষন ও কুর্দন করিতে করিতে এক এক বার সীতার সন্নিহিত হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ তড়িৎবেগে জননীর নিকটে ছুটিয়া যাইতেছে। সীতাদেবী পুষ্পচরন করিতে করিতে তাহাদের আনন্দপূর্ণ ক্রীড়া দর্শন পূর্বক মনে মনে কতই আনন্দিত হইতেছেন, এবং কখন কখন মৃদুমধুর সম্বোধনে তাহাদিগকে আপনার নিকটে আহ্বান করিতেছেন। সহসা সীতা দেখিলেন যে, মৃগ সকল কোনও কারণে সন্ত্রাসিত হইয়া বেগে চতুর্দিকে পলায়ন করিল ! তিনি কোতূহলপরবশ হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সন্নিহিত দেখিলেন যে, সুন্দর স্বর্ণচর্ম্ম একটা অপকৃপ মৃগ কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাদের আশ্রমস্থিত মৃগগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে ! সে কখন কদলীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, কখনও বেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে, কখনও স্থির হইয়া তৃণপত্র ভক্ষণ করিতেছে, আবার সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া তৎক্ষণাৎ সীতার নয়নপথে পতিত হইতেছে। সেই অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া সীতা হৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন “আর্য্যপুত্র, তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে লইয়া একবার এখানে আইস।” রাম আহুত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন করিয়া মৃগকে দর্শন করিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি লক্ষ্মণ মৃগকে দেখিয়াই অতিশয় সন্দিহান হইলেন, এবং উহাকে কোন মায়াবী রাক্ষস জানিয়া রামকে সতর্ক করিয়া দিলেন। জানকী সেই মৃগ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে নিবারণ পূর্বক রামকে কহিলেন “আর্য্যপুত্র, ঐ সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে, এক্ষণে তুমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আমাদের এই আশ্রমে বহুসংখ্যক মৃগ ভ্রমণ করিয়া থাকে ; তাহারা দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ শাস্ত্রস্বভাব ও দীপ্তিতে এইটি যেমন, এরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। এই নানাবর্ণচিত্রিত, শশাঙ্কশোভন,

রত্নময় মৃগ আমার নিকট বনবিভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত হইতেছে। আহা, উহার কি রূপ! কি শোভা! কি কণ্ঠস্বর! ঐ অপূর্ণ মৃগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লুইতেছে। তুমি যদি উহাকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমরা পুনর্বার রাজ্যলাভ করিব; তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে এবং ভরত, ভূমি, স্বশ্রগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই বার পর নাই বিস্মিত করিবে। যদি মৃগ জীবিত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তখনময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম্ম আত্মীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা জীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি।” (৩।৪৩)

স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা জীলোকের নিতান্ত অসদৃশ বটে, কিন্তু মুগ্ধস্বভাবা সীতা জীর কর্তব্যটি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না। কত নারী যে কেবল আত্মসুখসাধনের নিমিত্তই স্বামীকে কত দুর্লভ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া সীতার ভ্রায় অবস্থাপন্ন হইয়া থাকেন, তাহার সংখ্যা কে করিবে! আমরা অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, জী কখনও স্বামীর কাছে কোনও ঈঙ্গিত দ্রব্য প্রার্থনা করিবেন না; আমাদের কেবল ইহাই বক্তব্য যে, স্বামীর পক্ষে যাহা দুর্লভ, অথবা যাহা করিতে তিনি অক্ষম, একরূপ কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োগ করা পতিপরায়ণার নিতান্তই অকর্তব্য। সীতা রামের নিকট যাহা প্রার্থনা করিলেন, অবশ্য তাহা রামের পক্ষে অসম্ভব নহে; সীতা তাঁহার সামর্থ্য জানিতেন, তাই তিনি সেই মৃগের অসামান্যরূপে বিমুগ্ধ হইয়া স্বামীর নিকট মৃগ অথবা তাহার স্তন্য

চন্দ্রটি প্রার্থনা করিলেন । ইহাতে আমরা সীতার কোনও দোষ দেখিতে পাইতেছি না । কিন্তু এই ঘটনাটি হইতে সীতার যে ছুরবস্থা সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়াই একবার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, সীতা জ্ঞীর কর্তব্যসম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা যদি অন্ততঃ এই ক্ষেত্রেও গালন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখভোগ ঘটিত না ।

সে যাহাহউক, প্রিয়তমা জানকীর এই আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া রাম অতিশয় আনন্দিত হইলেন । তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন যে, মৃগ যদি সত্য সত্যই মৃগ হয়, তবে তিনি তাহাকে জীবন্ত ধরিয়া অথবা তাহার মনোহর চন্দ্র আনিয়া জানকীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন । আর সে যদি কোন মায়াবী রাক্ষস হয়, তবে তাহাকে বধ করাই কর্তব্য । এই বলিয়া রাম হস্তে ধনুর্ধ্বাণ লইলেন । রাক্ষসগণের সহিত রামের সম্প্রতি বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাই তিনি যাইবার সময় লক্ষ্মণকে জানকীর সহিত কুটীরে গমন করিয়া সতর্ক অবস্থান করিতে বলিলেন । লক্ষ্মণ জানকীকে কুটীরে একাকিনী রাখিয়া যেন কোথাও গমন না করেন । লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশে তৎক্ষণাৎ দেবী জানকীর সহিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন ।

চন্দ্রের জন্ম মৃগকে কেবল বধ করিবার অভিলাষ থাকিলে, রাম সেই স্থান হইতেই পরিত্যক্ত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিতে পারিতেন । কিন্তু সীতার মনস্তত্ত্বের নিমিত্ত তিনি তাহাকে জীবিত অবস্থায় ধরিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন । মৃগ রামকে ধনুর্ধ্বাণ-হস্তে আসিতে দেখিয়া পলায়নপর হইল । কখন সে রামের অতিশয় সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিল, কখনও বা সহসা বহুদূরে চলিয়া গেল । এইরূপে মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে, রাম আশ্রম হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন; তখন কেমন একপ্রকার সন্দেহ

আসিয়া তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিল। তিনি অনতিবিলম্বে ধনুকে এক তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া যুগ্মকে লক্ষ্য করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্যুৎবেগে যুগ্মশরীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র একটা বিকটাকার রাক্ষস “হা লক্ষণ, হা সীতে” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ভূমিতলে পড়িয়াই প্রাণত্যাগ করিল। রাম উদ্দর্শনে সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এবং রাক্ষসের চীৎকার শ্রবণ করিয়া অতিশয় চঞ্চল হইলেন।

সীতা ও লক্ষণ কুটীরमध्ये উপবিষ্ট হইয়া রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই দারুণ আর্তনাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। পতিপ্রাণা সীতা তৎশ্রবণে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। প্রাণনাথ আৰ্য্যপুত্র কোন রাক্ষসের হস্তে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছেন; হায়, তাঁহার কি ভয়ঙ্কর বিপদই উপস্থিত হইয়াছে; তিনি আর্তের জ্ঞায় ভাই লক্ষণ ও মন্দভাগিনী সীতাকে আহ্বান করিতেছেন। সীতার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল, তিনি হৃগ্ধবন্ধ বস্ত্র করিণীর জ্ঞায় সহসা অতিশয় চঞ্চল হইলেন। লক্ষণ সত্বর হউন; লক্ষণ আৰ্য্যপুত্রকে বিপদ হইতে মুক্ত করুন; লক্ষণ বিলম্ব করিতেছেন কেন? হায়, সীতার অদৃষ্টে যে কত দুঃখই আছে তাহা কে বলিবে? সীতাকে উন্মত্তার জ্ঞায় এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান লক্ষণ তাঁহাকে সাশ্বনা করিতে লাগিলেন, বলিলেন রামের কোথাও ভয় নাই; রাম আর্তের জ্ঞায় কখনও এইরূপে চীৎকার করেন না; সংসারে কেহই তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে না। কোন মারাবী রাক্ষস তাঁহাদের অমঙ্গলসাধনের জন্তই তারত্বরে লক্ষণ ও সীতার নাম উচ্চারণ করিতেছে। সীতাদেবী স্থির ও আশ্বস্ত হউন অধীর হইলে গুরুতর অনর্থপাতের সম্ভাবনা।

সীতা স্থির ও আশ্বস্ত হইলেন না। লক্ষণের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব

আচরণ দেখিয়া সীতা তাঁহার সাধুতাসম্বন্ধে দারুণ সন্দেহকে মনো-
মধ্যে প্রদ্রব দিলেন । হায়, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আজ এই কথা
স্মরণ করিতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । সীতা জীবনোচিত
দুর্কলতাবশতঃ স্বামীর আশঙ্কিত বিপৎপাতে একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য
হইয়া সহসা দেবর লক্ষ্মণের গুণগ্রাম ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে
স্বামীর স্নেহশূন্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতামাত্র মনে করিয়া অবজ্ঞা করিতে
লাগিলেন । লক্ষ্মণকে অবিচলিত ও নিশ্চিন্ত দেখিয়া জানকী রোষা-
রুণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিলেন “নৃশংস, কুলাধম, তুই অতি কুকার্য্য
করিতেছিস্ ; বোধ হয় রামের বিপদ তোর বিশেষ প্রীতিকর হইবে,
তন্নিমিত্ত তুই তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া ঐরূপ কহিতেছিস্ । তোর দ্বারা
যে পাপ অহুষ্টিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে ; তুই কপট হ্রস্ব ও
জ্ঞাতিশত্রু । হুট, এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগে, বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই
হউক, আমার জন্ত একাকী রামের অহুসরণ করিতেছিস্ । কিন্তু
তোদের মনোরথ কখনই সফল হইবার নহে । এক্ষণে তোর সমক্ষেই
আমি প্রাণত্যাগ করিব ; নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি রাম বিনা
কণকালও এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিব না ।” (৩।৪৫)

পাঠকপাঠিকাগণ, আপনারা কি এই দুঃস্থী সীতাকে ইতঃপূর্বে
আর কখনও কোথাও দেখিয়াছেন ? হায়, হুটা সরস্বতী কি সীতার
কণ্ঠে বসিয়া তাঁহাকে এই ঘৃণিত অবশঙ্কর ও নীচ বাক্যগুলি উল্লীর্ণ
করাইল ? উক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে উন্মাদিনী সীতার
জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইল না কেন ? সীতা স্বর্গরাজ্যে বিচরণ
করিতে করিতে কি একেবারে নরকের মধ্যে নিপতিত হইলেন ? দেবর
লক্ষ্মণের সাধুতাসম্বন্ধে সীতার সন্দেহ ? যিনি সমস্ত আত্মস্থখ বিসর্জন
করিয়া একমাত্র ভ্রাতৃপ্রেমের বশবর্তী হইয়াই জটাবন্ধল ধারণপূর্বক
অরণ্যে জ্যেষ্ঠের অহুসরণ করিতেছেন, যিনি বনবাসের প্রারম্ভ হইতে

রাম ও সীতার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত একপ্রকার আহার নিজে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং সাধুতার প্রতিমূর্তি, আত্ম-ত্যাগের আধার ও অলৌকিক অমুরাগের দৃষ্টান্ত স্থল, যিনি এপর্যন্ত একটা দিনও সীতার বদনমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, যিনি সীতাকে স্নমিত্রা অপেক্ষাও অধিকতর ভক্তি করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং সীতাও শতমুখে ধাঁহার কতবার প্রশংসা করিয়াছেন, সেই দেবর লক্ষ্মণের প্রতি আজ সীতার এই দুর্ভাক্যপ্রয়োগ ! আমরা প্রথমে বাস্তবিকর রামায়ণে সীতার কণ্ঠ হইতে এই পুতিগন্ধময় ঘৃণিত বাক্যগুলি উচ্চারিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও লজ্জায় ভ্রিয়মাণ হইয়াছিলাম । সাধুশীল লক্ষ্মণের সম্বন্ধে সীতার ঈদৃশী ধারণা দেখিয়া আমরা কোন মতেই তাঁহাকে দোষমুক্ত করিতে সমর্থ হই নাই । বলিতে কি আমরা তাঁহার মুখ হইতে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণের কোন প্রত্যাশাই করি নাই । সীতার স্বভাবও পূর্বাগর আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহার এই অভূতপূর্ব ব্যবহারকে নিতান্ত অসঙ্গত বোধ করিয়াছিলাম । তবে সীতার এবস্থিধ মনোবিকার সংঘটিত হইল কেন ? সীতা এত আত্মবিস্মৃত হইলেন কেন ? আমাদের সেই স্নেহ-ময়ী প্রিয়বাদিনী রমণীশিরোমণি সীতাদেবী আজ প্রাকৃতার ভ্রায় পরিলক্ষিতা হইলেন কেন ? ইহার সঙ্গতর পাইতে হইলে আমাদেরকে ধীরভাবে সীতার তাৎকালিক মানসিক অবস্থাটি পর্যালোচনা করিতে হইবে । লক্ষ্মণ বীর পুরুষ, তিনি বীর ভ্রাতার সাহস ও তেজস্বিতা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন ; তিনি আরও জানিতেন যে, রাক্ষসগণের সহিত যিবাদ হওয়া অবধি, তাহার নানাপ্রকারে তাঁহাদের অমঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিতেছে । যে অপূর্ব যুগ দেখিয়া সীতাদেবী বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়াই লক্ষ্মণের মনে ঘোরতর সন্দেহ উপ-স্থিত হইয়াছিল এবং সেই দিনের যুগয়া হইতে যে উল্লিখিত আর্জ-

নাদের ভায় কোন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইবে, তাহা ও তিনি একপ্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন । এই নিমিত্তই তিনি শোকবিহ্বলা জানকীকে রামের আর্তনাদসম্বন্ধে আপনার বক্তব্য জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন । কিন্তু সীতা কুসুমকোমলপ্রাণা রমণী ; তিনি একান্তই পতিপরায়ণা, পতির সামান্য কষ্টেই তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয় ও তাঁহার সামান্য বিপদাশঙ্কাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠে । বিশেষতঃ তিনি অতিশয় মুগ্ধস্বভাবা ; লক্ষ্মণের ভায় তাঁহার হৃদয়দৃষ্টি ও বিচারকমতা ছিল না ; সুতরাং তাঁহার ভায় তিনি সেই মুগ্ধকে কোন মায়াবী রাক্ষস বলিয়া বিশ্বাস করিতেও সমর্থ হন নাই । মায়াবী রাক্ষসেরা যে উক্তপ্রকার আর্তনাদ করিয়া তাঁহাদের কোন অনিষ্টচেষ্টা করিতে পারে, তাহা তাঁহার হৃদোধই ছিল না । ইহা ব্যতীত তিনি মনোমধ্যে রামচন্দ্রের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা না করিয়া নিশ্চিন্তমনে কুটীরে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ সেই হৃদয়বিদারী আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল । পতিপ্রাণার কোমল প্রাণ বিকম্পিত হইল । অবলা সীতা মনে করিলেন বীরবর লক্ষ্মণ অনতি-বিলম্বেই ধনুর্ক্ষাণহস্তে বিপন্ন ভ্রাতার রক্ষার্থ ধাবমান হইবেন ; কিন্তু তিনি তাঁহাকে স্থির ও অবিচলিত দেখিয়া সহসা ধৈর্য্যসীমা অতিক্রম পূর্ব্বক একেবারে উন্মাদিনীর ভায় ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন । সীতা পতিশোকে আচ্ছন্ন হইয়া কণকালের জন্ত পুত্রস্থানীর দেবর লক্ষণকে, এবং এমন কি, আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া গেলেন ! সীতা ঘোর দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইলেন, তাঁহার মন বিকৃত অবস্থায় উপনীত হইল । মনের এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে, লোকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয় । সীতাদেবীও তাই স্নেহভাজন লক্ষ্মণের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিলেন । ঈদৃশ অবস্থায় তাঁহার ভায় পতিপ্রাণা রমণীর যে এই প্রকার মানসিক বিকার ঘটিতে পারে, আমরা তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি ।

সে যাহা হউক, উল্লিখিত অদ্ভুত বাক্যগুলি যেমন একদিকে সীতার মানসিক ছরবছর পরিচয় প্রদান করিতেছে, তেমনই অপরদিকে আবার পতির জ্ঞাত্তা হার আশ্চর্য্য ব্যাকুলতাও পরিব্যক্ত করিতেছে । কিন্তু জানকী কুক্ষণেই এই বিষময় বাক্যগুলি উল্লীর্ণ করিয়াছিলেন । তিনি জীবনে ইহার পূর্বে বা পরে আর কখনও কাহারও প্রতি এমন কুবাক্য উচ্চারণ করেন নাই । পরন্তু এতদ্বারাই তাঁহার ভাগ্যে যে দারুণ কষ্টভোগের সূত্রপাত হইল, তাহা হইতে তিনি ইচ্ছাজীবনে আর নির্মুক্ত হইতে পারিলেন না । আমরা কত সময়েই যে জিহ্বাকে অসংযত রাখিয়া জানকীর স্মার মনস্তাপ পাইয়া থাকি, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ?

সে যাহা হউক, সুশীল লক্ষণ জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ও অভিমানে অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, এবং সহসা দৃপ্ত সিংহের স্মার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন । কিন্তু তিনি অতিকষ্টে আত্ম-সংযম করিয়া ক্রুতাঞ্জলিপুটে কহিলেন “আর্য্যো, তুমি আমার পরম দেবতা, তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই । অনুচিত কথা প্রয়োগ করা জ্ঞীলোকের পক্ষে নিতান্ত বিস্ময়ের নহে ; উহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহা প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে । যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতেই আমার সহ্য হইতেছে না । উহা কর্ণমধ্যে, তপ্ত নারাতাস্ত্রের স্মার, একান্ত ক্লেশকর হইতেছে । বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমার স্মার্য্যই কহিতেছিলাম ; কিন্তু তুমি আমার প্রতি যারপরনাই কটুক্তি করিলে । দেবি, বধন তুমি আমাকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ, তোমার দিক্ ; মৃত্যু একান্তই তোমার সন্নিহিত হইয়াছে । আমি জ্যেষ্ঠের নিয়োগ পালন করিতেছিলাম, তুমি জীমূলভ দুষ্টস্বভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়াই আমার ঐরূপ কহিলে । তোমার মঙ্গল হউক ; যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম । বেক্রপ

যোর দুর্নিমিত্ত সকল প্রাহুর্ভূত হইতেছে, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানা আশঙ্কা হয়; এক্ষণে বনদেবতার। তোমায় রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার ঘেন তোমায় দর্শন পাই।” (৩৪৫)

সীতা লক্ষ্মণকে আর কিছু না কহিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে সাশ্বনা করিয়া কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

মহাবীর লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলে, সীতাদেবী রামলক্ষ্মণের আগমন প্রতীক্ষায় অশ্রুপূর্ণলোচনে উৎকণ্ঠিতমনে কুটীরে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে ব্রাহ্মণবেশী এক ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধান কাষায় বসন, মস্তকে শিখা, বামহস্তে যষ্টি ও কমণ্ডলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাহুকা। সে ধীরে ধীরে তর্ভুশোকাক্ত। সীতার সন্নিহিত হইয়া উহাকে নিরীক্ষণ পূর্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সীতার বদনমণ্ডল অশ্রুজলে কলঙ্কিত হইয়া নীহারক্লিষ্ট কমলের ত্রায় শোভা পাইতেছিল; শোকে পরিম্লান হইলেও, তাঁহার দেহ হইতে এক দিব্য জ্যোতিঃ পরিস্ফুট হইতেছিল। ভিক্ষুক সীতার আলৌকিক রূপে বিমুগ্ধ হইয়া নিলজ্জের ত্রায় তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং তিনি সেই বিপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য আলোকিত করিয়া একাকিনী তথায় বিরাজ করিতেছেন কেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিল। সরলা সীতা ভিক্ষুককে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া সংক্ষেপে আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং শোকে মন উদ্বিগ্ন থাকিলেও অতিথি-সংকার করিতে বিম্বৃত হইলেন না। তিনি উহাকে পাদ্য ও আসন প্রদান পূর্বক কহিলেন “ব্রহ্মণ, অন্ন প্রস্তুত; এই আসনে উপবেশন করুন, এই পাদ্যদানক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বস্তুদ্রব্য-সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্তমনে ভোজন করুন। ভোজনান্তে

কিয়ংকাল বিশ্রাম করুন, এখানে অবশ্রাই বাস করিতে পাইবেন । আমার স্বামী, ভ্রাতার সহিত, নানাপ্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণ পূর্বক শীঘ্রই কুটীরে প্রত্যাগমন করিবেন ।” (৩। ৪৬, ৪৭)

সীতাদেবী এই প্রকারে ভিক্ষুকের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং রামলক্ষ্মণের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠিতমনে বনের দিকে বারম্বার দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি আকুলমনে হতাশহৃদয়ে দেখিলেন যে, ভ্রাতৃযুগলের শীঘ্র প্রত্যাগমনের কোথাও কোনও লক্ষণ নাই, কেবলমাত্র দিগন্তপ্রসারী শ্রামলবন মধ্যে মধ্যে বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া বিষাদভরেই যেন উচ্ছ্বসিত হইতেছে !

সীতাদেবী ভিক্ষুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, দৃষ্ট সাহসভরে দারুণবাক্যে আপনার পরিচয় প্রদান করিল । সে কহিল “জানকি, যাহার প্রতাপে দেবাসুরমনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ । তুমি স্বর্ণবর্ণা ও কোশেয়বসনা, তোমায় দেখিয়া আমি বিমোহিত হইয়াছি । আমি নানাস্থান হইতে বহুসংখ্য সুরূপা রমণী আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রধানা মহিষী হও । লঙ্কা নামে আনার এক বৃহৎ নগরী আছে ; উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত ও পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত । তুমি রাজমহিষী হইলে, পঞ্চসহস্র সুরবেশা দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে । তখন এই বনবাসে তোমার আর ইচ্ছাও হইবে না । তুমি আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমার সর্বাংশে অমুরূপ । আমি হইতে কদাচ তোমার কোনরূপ অপকার হইবে না । তুমি মনুষ্য রামের মমতা দূর করিয়া আমাতেই অমুরক্ত হও । যে ব্যক্তি জ্ঞীলোকের কথায় আত্মীয় স্বজন ও রাজ্য বিসর্জন করিয়া এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ গুণে সেই নষ্টসকল অন্নায় রামের প্রতি অমুরাগিনী হইয়াছ ?”

অকস্মাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বয়বিমূঢ়া সীতা সিংহীর ভ্রায় গর্জন করিয়া উঠিলেন । সহসা তাঁহার মূর্ত্তি অগ্নিময়ী, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, চক্ষু ক্রকুটিসম্পন্ন, নাসা বিস্ফারিত, দেহ দীর্ঘায়ত ও কেশপাশ আলু-
লায়িত হইল । ক্রোধে তাঁহার সর্বাঙ্গ বিকম্পিত হইতে লাগিল । তিনি রোষভরে কিয়ৎক্ষণ বাঙনিম্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না, পরে ছুরাকাজ্ঞা রাবণের প্রতি স্থগা প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন
“রে ছুরাশ্বন, যিনি হিমাচলের ভ্রায় স্থির, এবং সাগরের ভ্রায় গভীর, সেই দেবারাজতুল্য রান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব । যিনি বটবৃক্ষের ভ্রায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ কীর্ত্তিমান্ ও সুলক্ষণ, সেই মহাত্মা যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব । বাহার বাহু-
যুগল সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ভ্রায় কমনীয় ; যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও সিংহবৎ মম্বরগামী, সেই মনুষ্যপ্রধান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব । রাক্ষস, তুই শৃগাল হইয়া দুর্লভা সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস্ ? যেমন সূর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকেও স্পর্শ করিতে পারিবি না । নীচ, যখন রামের প্রিয়পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয়ই স্বচক্ষে বহুসংখ্য স্বর্ণবৃক্ষ দেখিতেছিস্ ; তুই কুধাতুর সিংহ ও সর্পের মুখ হইতে দস্ত উৎপাটনের ইচ্ছা করিতেছিস্, স্ত্রীমুখে চক্ষু মার্জন এবং জিহ্বা দ্বারা কুর লেহনের অভিলাষ করিতেছিস্ ! তুই কণ্ঠে শিলা বন্ধন পূর্বক সমুদ্রসত্তরণ, প্রজলিত আগ্নিকে বস্ত্রে বন্ধন, এবং লৌহময় শুলের মধ্যদিয়া সঞ্চরণ বাসনা করিতেছিস্ ! দেখ, সিংহ ও শৃগালের যে অন্তর, সমুদ্র ও ক্ষুদ্রনদীর যে অন্তর, সূবর্ণ ও লৌহের যে অন্তর, গরুড় ও কাকের যে অন্তর, হস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, এবং হংস ও গৃধ্রের যে অন্তর, রামের এবং তোরও সেইরূপ অন্তর ! তুই আর কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর, এখনই ধনুর্কাণধারী রামচন্দ্র, বীর লক্ষ্মণের

সহিত উপস্থিত হইয়া, তোর উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবেন। রে পামর, তুই নীচ জঘন্তচরিত্র ও পাপাচারী। তুই আমাকে অমহায়া দেখিয়া অপহরণ করিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব, কোন মতেই তোর বশতাপন্ন হইব না। আমাকে স্পর্শ করিলে, তুই সবংশে ধ্বংস হইবি। কাপুরুষ, তুই আমাকে একাকিনী দেখিয়া কুবাক্য কহিতেছিস, কিন্তু দেখিতেছি রামের হস্তে তোর আর রক্ষা নাই।” (৩৪৭)

অগ্নিমূর্তি সীতা ছুরায়া রাবণের প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া ভীমরূপ ধারণ করিলেন। সে ভীষণ রূপ দর্শনে পামর রাবণেরও হৃৎকম্প হইল। দুর্ভক্ত সীতার প্রতিকূলভাব অবলোকন করিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক অপহরণ করিবার ইচ্ছা করিল, এবং তদুপেই নিরীহ ভিক্ষুবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিল। সীতা রাবণকে দেখিয়া বাত্যাভাড়া কদলীর জায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন এবং চক্ষে চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিলেন। রাবণ ক্রোধকষায়িতলোচনে সীতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলপূর্বক বামহস্তে তাঁহার কেশ ও দক্ষিণহস্তে তাঁহার পদযুগল ধারণ করিল; সহসা এক খরবাহিত রথ কুটারের সন্নিহিত হইল। সীতাদেবী রাবণকর্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইলামাত্র তাহার পাপ হস্তবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভক্ত ঘোরতর তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া রথে আরোহণ করিল। মন্দভাগিনী সীতা এই অসম্ভাবিত বিপদে অতিমাত্র কাতর হইয়া দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং চীৎকার ও বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। বৃকলতা নিম্পন্ন হইল, মৃগসকল চতুর্দিকে পলায়ন করিল; সর্ষপ যেন প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বায়ু যেন নিশ্চল এবং সূর্য্য যেন প্রভাশূন্য হইল। চতুর্দিক হইতে এক হাহাকারধ্বনি

শ্রুতিগোচর হইল, এবং ধরিত্বী যেন ঘন ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল।
 রামের সহধর্মিণী ত্রিলোকপূজ্যা সীতাদেবী রাক্ষসকর্তৃক অপহৃত
 হইতেছেন, ধর্ম অধর্মকর্তৃক আক্রান্ত হইতেছে, গাপ পুণ্যকে দলন
 করিতেছে। হায়, সংসারে আর ধর্ম নাই; জগৎ হইতে সত্যলোপ
 হইল, এবং সরলতা ও দয়ার নামও আর কোথাও রহিল না। সীতা-
 দেবী রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত, গরুড়কবলিতা
 ভূজঙ্গীর স্তায়, বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু হ্রস্ব রাক্ষস
 তাঁহাকে লইয়া সহসা আকাশপথে উখিত হইল। জানকী ইতঃপূর্বে
 তাঁহার একমাত্র রক্ষক দেবর লক্ষ্মণকে অন্তায় কটুক্তি করিয়া রামের
 নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সেই কারণে তাঁহার দারুণ মনস্তাপ উপস্থিত
 হইল। তিনি আর কাহাকেও পরিত্রাতা না দেখিয়া নৈরাশ্রের
 প্রগাঢ় তিমিরগর্ভে নিমজ্জিত হইলেন, এবং শোকে বিহ্বল হইয়া
 বিলাপ ও স্থাবরজঙ্গমকে উন্নত্বার স্তায় সম্বোধন করিতে লাগিলেন;—
 হা শুকবৎসল লক্ষ্মণ, কামরূপী রাক্ষস আমার লইয়া যায়, তুমি তাহা
 জানিতে পারিলে না! হা রাম, ধর্মের জন্ত সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস
 বলপূর্ব্বক আমার লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না! বীর, তুমি
 হুর্লভদিগের শিক্ষক, এই হুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না! যে
 রাক্ষসকুলাধম রাবণ, তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য্য করিলি,
 এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর বোরতর বিপদ দর্শন কর। হায়,
 ধর্ম্মাকাজী রামের ধর্ম্মপত্নীকে রাক্ষসে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়,
 কেহ কি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না? হায়, এতদিনে
 কৈকেয়ীর মনোবাহা পূর্ণ হইল; এতদিনে আমরা স্বজনগণের সহিত
 বিনষ্ট হইলাম। হা জনস্থান, তোমাকে নমস্কার করি; পুণ্ডিত
 কর্ণিকার সকল, তোমাদিগকে অভিবাদন করি; রাবণ সীতাকে অপ-
 হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। পুণ্যমলিলে

গোদাবরী, তোমার বন্দনা করি, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া পলাইতেছে, তুমি শীঘ্রই রামকে এই কথা বল । অরণোর দেবতা-দিগকে অভিবাদন করি, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল । এইস্থানে যে কোন জীবজন্তু আছে, সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিকা সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল । হায়, যমও যদি লইয়া যায়, যদি ইহলোক হইতেও অন্তর্হিত হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে নিজবিক্রমে নিশ্চয়ই আমার আনয়ন করিবেন । হা তাত জটায়ু, দেখ, এই ছুরায়া রাক্ষস আমার অনাথার স্নায় লইয়া বাইতেছে, ইহার হস্তে অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে, তুমি কি ইহাকে নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে ? এক্ষণে, রাম ও লক্ষণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, তুমি তাহাই করিও ।” (৩৮৯)

জটায়ু নামে এক বিহগরাজ আশ্রমের অনতিদূরে বাস করিতেন । তিনি রামচন্দ্রের অতিশয় শুভাকাজক্ষী ছিলেন । সহসা সীতার এই হৃদয়বিদারী বিলাপ শ্রবণ পূর্বক জটায়ু উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, রাক্ষসাদম রাবণ রামের বনিতা সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া শূন্যমার্গে পলায়ন করিতেছে । বিহগরাজ তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ডীন হইয়া রাবণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, নথর ও চঞ্চুপ্রহারে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত এবং পদাঘাতে তাহার রথ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন । রাবণ সীতাকে ভূমিতলে স্থাপন করিয়া জটায়ুকে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিল, এবং বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ধ্বজ দ্বারা পক্ষদ্বয় ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিয়া দিল । বিহগরাজ সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া মরণাপন্ন হইলেন দেখিয়া, মন্দভাগিনী জানকী বিলাপ করিতে করিতে এক লতাকে হস্ত দ্বারা লুপ্তরূপে আলিঙ্গন করিলেন । হরস্ত রাক্ষস ক্রোধে সীতাকে লতা

হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আবার আকাশপথে পলায়নপ্রবৃত্ত হইল। সীতাদেবী নিরুপায় ভাবিয়া রোদন করিতে করিতে আপনার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারসকল চতুর্দিকে নিক্ষেপ্ত এবং “হা রাম, হা লক্ষ্মণ” এই আন্তনাদসম্বলিত করুণ ক্রন্দনধ্বনিতে বায়ুমণ্ডল মুখরিত করিতে লাগিলেন। তিনি রাবণকে কখনও অহুন্নয় বিনয়, কখনও কটুক্তি ও ভৎসনা করিয়া মুক্তিপথ অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র কর্ণপাত্ত করিল না। অনন্তর শোকা-কুলা সীতাদেবী এক পর্বতের উপরিভাগে পাঁচটি বানরকে নিরীক্ষণ করিয়া, উহার রামকে বলিবে এই প্রকৃতাশায়, উহাদের মধ্যে কিয়দংশ কনকবর্ণ কোশেয় বস্ত্র, উত্তরীয়খণ্ড এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসকল নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু রাবণ গমনহরানিবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। বানরেরা সবিস্ময়ে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক রোহদ্যমানা কামিনীকে দেখিতে পাইল।

রাবণ তড়িৎবেগে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং মুহূর্তকাল মধ্যে সাগর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ছুরাছুরা একে-বারে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে ভয়বিহ্বলা সীতাকে রক্ষা করিল। সীতা কোথায় কিয়ৎকাল পূর্বের স্বামীর সহিত অরণ্যচারিণী হইয়াও তৎসহবাসে স্বর্গস্বর্থ তুচ্ছ করিত্বেছিলেন, আর কোথায় সহস্রাঙ্কসকলিত হইয়া প্রিয়তম প্রাণনাথ এবং গুরুবৎসল দেবর হইতে শত শত যোজন দূরে অবস্থান করিতেছেন ! হায়, সীতার এ কি হইল ? রামময়জীবিতা পতিব্রতা সীতাদেবী স্বামীর মঙ্গলময় ক্রোড় হইতে আচ্ছিন্ন হইলেন কেন ? সত্যসত্যই কি সীতা আর জীবিতেশ্বর আর্ধ্যপুত্রকে দেখিতে পাইবেন না ? তবে সীতার আর জীবনধারণে প্রয়োজন কি ? সীতা অপছন্দ হইয়াছেন ইহা বাস্তব ঘটনা, না স্বপ্নমাত্র ? কিয়ৎকণ তিনি ভূতাবিষ্টার স্তম্ভায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন ;

পরে, আপনার ছরবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া অসহায়ার ভ্রায় রোদন করিতে লাগিলেন । রাবণ লঙ্কাতে আসিয়াই ষোরদর্শন রাক্ষসীগণের হস্তে সীতাকে সমর্পণ করিল এবং তাঁহার সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত কঠোর আদেশ প্রদান করিল । সীতার বাহা প্রয়োজন হইবে, রাক্ষসীরা যেন তৎক্ষণাৎ তাহা আনয়ন করে, এবং কেহ যেন ভ্রমেও সীতার প্রতি কোন রূঢ় বাক্য প্রয়োগ না করে ।

রাবণ এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়া আটজন মহাবল রাক্ষসকে রামলক্ষ্মণের প্রাণনাশ করিতে জনস্থানে প্রেরণ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সীতার মনস্তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেই রাক্ষসীরক্ষিতা অনাথিনীকে আপনার ধনবৈভব দেখাইতে লাগিল । সীতাদেবী রাক্ষসীস্বামীকে দেখিয়াই তাহার ও আপনার মধ্যে একটা তৃণ ব্যবধান রাখিলেন, এবং তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া কেবল প্রবলবেগে আশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । তদর্শনে রাবণ সীতাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ক্ষীণপ্রাণ রামের দোষ ও অক্ষমতাদর্শন এবং আপনার গুণ সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদি কীর্তন করিয়া তাঁহার মনোহরণ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল ।

পতিপরায়ণা সীতাদেবী পতিনিন্দা শ্রবণ পূর্ব্বক সেই শত্রুগৃহেই কালভুজঙ্গীর ভ্রায় গর্জন করিয়া রাবণের প্রতি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও অপমানহৃচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং রাবণের ভয়প্রদর্শনে কিছুমাত্র ভীতা হইয়া বলিলেন “দেখ, এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে, তুই বধ বা বন্ধন কর, আমি ইহা আর রক্ষা করিব না, এবং জগতে অসতীকল্প অপবাদও রাখিতে পারিব না । আমি ধর্ম্মশীল রামের ধর্ম্মপত্নী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমার স্পর্শ করিতে পারিবি না ।” (৩৫৬) ।

রাবণ সীতার অনন্তপরায়ণতা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইল । সে সীতাকে তখন বশতাপন্ন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া মনে করিল যে, এই দুষ্টাকে কখনও ভয়প্রদর্শন এবং কখনও বা প্রবোধ বাক্যদ্বারা, বস্ত্রকরিণীর আশ্রয়, বশীভূত করিতে হইবে । এইরূপ চিন্তা করিয়া রাক্ষস সীতাকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিল “সীতে, শুন, আমি আর দ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা করিব । তুমি যদি এতদিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমাকে প্রতর্ভোজনের জন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে ।” (৩।৫৬) এই বলিয়া রাবণ বৃক্ষলতা-শোভিত বিহঙ্গমপরিপূর্ণ মনোহর অশোককাননে সীতাকে লইয়া যাইতে রাক্ষসীগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিল । সীতাও ভয়শোকে বিহ্বল হইয়া রামলক্ষণের চিন্তায় সেই অশোককাননে জীবন্মৃত্যুর আশ্রয় দিনযাপন করিতে লাগিলেন ।

নবম অধ্যায় ।

মারীচ রামের স্বর অনুকরণ পূর্বক আর্তের শ্রায় সীতা ও লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া গতাস্থ হইলে, রামের বীরহৃদয় সহসা বিকম্পিত হইল। নানাপ্রকার ভয় ও দুর্ভাবনা আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অতিশয় চঞ্চল করিল। রামের যেন কোন গুরুতর বিপদ আসন্ন হইয়াছে! রাক্ষসের এই ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শ্রবণ পূর্বক লক্ষ্মণ ত সীতাকে কুটীরে একাকিনী রাখিয়া আসিবেন না? সুবুদ্ধি লক্ষ্মণও কি রামের শ্রায় রাক্ষসের মায়ায় বিমুগ্ধ হইবেন? ছুরায়া রাক্ষসেরা রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সর্বনাশসাধনের নিমিত্তই যে এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে, তদ্বিষয়ে রামের আর কোন সন্দেহই রহিল না। তিনি সীতার নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, এবং মনোমধ্যে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে করিতে দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্বদা কম্পিত, ও চরণযুগল অরানিবন্ধন স্থলিত হইতে লাগিল। পথিমধ্যে ঘোর ছুনিমিত্তসকল প্রাচুর্ভূত হইতে দেখিয়া তিনি আরও চঞ্চল হইলেন; পৃথিবী তাঁহার চক্ষে যেন ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল এবং চতুর্দিক্ যেন তমোজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল! হায়, রামের আনন্দদায়িনী পত্যমুরাগিণী জনকনন্দিনীর কি কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ কি তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন? রামচন্দ্র এইরূপ আশঙ্কা করিতে করিতে ব্যগ্রতাসহকারে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা লক্ষ্মণকে সম্মুখে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত, তালু বিগুঞ্চ ও কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইল। তিনি কোনও প্রকারে সীতার

কুশলপ্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহাকে কুটীরে একা-
কিনী রাখিয়া আসিয়াছেন ইহা শ্রবণমাত্র শোকে ও চিন্তায় অবসন্ন
হইয়া পড়িলেন। রাম দুঃখাবেগে লক্ষ্মণকে কহিলেন “বৎস, আমি
যখন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীকে রাখিয়া আসিলাম,
তখন তুমি কি জন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন
করিলে? না জানি, এক্ষণে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে! হস্ত
সীতা অপহৃত হইয়াছেন কিম্বা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাঁহাকে
ভক্ষণ করিয়াছে! লক্ষ্মণ যদি সেই স্ত্রীলা জানকী জীবিত থাকেন,
তবে আমি পুনরায় আশ্রমে যাইব; আর যদি তাঁহার মৃত্যু
হইয়া থাকে, তবে আমিও প্রাণত্যাগ করিব। তিনি আমাকে উপ-
স্থিত দেখিয়া, হস্তমুখে বাক্যালাপ না করিলে আমি কি প্রকারে
জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব?” লক্ষ্মণ রামকে একান্ত শোকাকুল
দেখিয়া কহিলেন “আর্য্য, আমি আপন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ
করিয়া এখানে আসি নাই।” এই বলিয়া তিনি অগ্রজকে আদ্যো-
পান্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। সীতার ক্রোধবাক্যে লক্ষ্মণ
আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া রামের নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহা
শ্রবণ করিয়া রাম বিস্তর পরিতাপ করিতে করিতে বলিলেন “ভাই,
সীতার নিয়োগে আমার আদেশ লঙ্ঘন করা তোমার সম্পূর্ণই নীতি-
বিরুদ্ধ হইয়াছে।” এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ভ্রাতৃদ্বয়
উৎকণ্ঠিতমনে কুটীরসন্নিধানে উপনীত হইলেন। দূর হইতে আশ্র-
মকে স্রীহীন দেখিয়া রামের আশঙ্কা পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি
স্মৃতিপথে চিন্তাকুলচিত্তে কুটীরাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,
তন্মধ্যে জানকী নাই। জানকী নাই! তবে কি রামের বাহা আশঙ্কা,
তাহাই সত্য হইল? রাম বিশ্ব অন্ধকারময় দেখিলেন, এবং সহসা
অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। জানকী তবে কোথায় গিয়াছেন? রাম-

চন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত উদ্বিগ্নমনে আশ্রমের চতুর্দিকে সীতার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন রাম কাতরস্বরে হতাশহৃদয়ে একবার সীতাকে সন্ধান করিয়া ডাকিলেন। সেই প্রশান্ত অরণ্যমধ্যে রামের কণ্ঠস্বর বায়ুরাশির সহিত তরঙ্গায়িত হইতে হইতে অদূরে কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু কোন স্থান হইতে কোনও প্রত্যুত্তর আসিল না। কেবলমাত্র সেই কাতর কণ্ঠস্বরশ্রবণে চকিত হরিণহরিণীসকল একবার রামের দিকে দীনভাবে দৃষ্টিপাত করিল এবং তরুরাজি যেন বিবাদভরেই একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! মুহূর্ত্তমধ্যে আবার সব নীরব ও নিষ্পন্দ, যেন স্থাবর জঙ্গম সকলেই শোকে অবসন্ন হইয়াছে। রাম মনের উদ্বেগ আর সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না; “ভাই রে লক্ষ্মণ” এই কথা উচ্চারণ করিয়াই তিনি ভূমিতলে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে প্রবোধবচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। দেবী জানকী কুটীরে নাই বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি কোথাও পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন; “অদূরে কন্দরশোভিত গিরিবর রহিয়াছে; অরণ্যপার্শ্বটন জানকীর একান্তই প্রিয়, হয়ত তিনি বনে গিয়াছেন,” (৩৬১) কিম্বা কুম্ভমিত সরোবরে ও বেতসাচ্ছন্ন নদীতে গমন করিয়াছেন, অথবা তাঁহারা কি প্রকার অনুসন্ধান করেন ইহা জানিবার আশয়ে ভয়প্রদর্শনের জন্তই কোথাও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। আর্য্য শোক পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হউন, তাঁহারা উভয়ে সর্ব্বত্রই সীতার অনুসন্ধান করিবেন।

রাম শোকে উন্মত্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি যাইতে যাইতে বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী যাহাকেই সম্মুখে দেখেন, উদ্ভ্রান্তদিস্তে তাহাকেই সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন;— “হে কদম্ব, আর প্রেয়সী তোমায় অতিশয় প্রীতি করেন, তুমি

যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল । করবীর, তুমি কুশাস্ত্রী জানকীর অতিশয় স্নেহের পাত্র, তিনি জীবিত আছেন কি না বল । তিলক, তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরেরা তোমার চতুর্দিকে গুঞ্জন করিতেছে, তুমি জানকীর বিশেষ আদরের বস্তু, তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা কি অবগত আছ ? হে অশোক, শোকনাশক, আমি শোকভরে হত-চেতন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর । কর্ণিকার, তুমি কুমুমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, সুশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অনুরক্ত, এক্ষণে তুমি যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল । হে মৃগ, তুমি মৃগনয়না জানকীকে অবশ্যই জান, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি মৃগীগণের সহিত অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন ? মাতঙ্গ, বোধ হয় আমার জানকী তোমার পরিচিত, এক্ষণে তুমি যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক ত বল ।” (৩.৬০) রাম অরণ্যমধ্যে ভ্রাস্ত ও উন্মত্তবৎ এইরূপে সকলকেই সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন উত্তর প্রদান করিল না । সহসা তাঁহার বিষম ভ্রাস্তি উপস্থিত হইল । তিনি মনে করিলেন যেন প্রিয়তমা জানকী একবার তাঁহার নয়নগোচর হইয়া পরিহাসচ্ছলে আবার বৃক্ষের অন্তরালে লুপ্ত হইতেছেন । তাই তিনি সেই মনঃক্লিত সীতাকে সন্ধান করিয়া কহিলেন “কমল-লোচনে, তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ ? এই যে তোমায় দেখিতে পাইলাম ! তুমি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে কেন আমার বাক্যের উত্তর দিতেছ না ? একবার স্থির হও, এক্ষণে নিতান্তই নির্দিয় হইয়াছি । তুমি ত পূর্বে এইরূপ পরিহাস করিতে না, তবে কি জন্ত আমাকে উপেক্ষা করিতেছ ? প্রিয়ে, আমি তোমাকে পীত-বর্ণ পট্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি দ্রুতপদে যাইতেছ তাহাও দেখিয়াছি ; তোমার অন্তরে যদি স্নেহসঞ্চার থাকে, তবে থাম, আর যাইও না ।

জানকি, আমি একান্ত দুঃখিত হইয়াছি, শীঘ্রই আমার নিকটে আইস ।
তুমি যে সকল সরল মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে, ঐ দেখ,
তাহারা তোমার বিরহে সজলনয়নে চিন্তা করিতেছে।” (৩৬০, ৬১)
কিরংকর্ণ পরে রাম আপনার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন । সীতাকে
কেহ হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, এই চিন্তাই আবার তাঁহার মনে
বলবতী হইল । তিনি লক্ষ্মণকে “ভাই, আমার জানকী নাই, আমি
আর বাঁচিব না” এই কথাগুলি বলিয়া শোকে অতিশয় অবসন্ন ও
মুহূর্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন । লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে
প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাম তাঁহার বাক্য অনাদর
করিয়া সীতার জন্ত অজস্র বাষ্পবারি বিমোচন পূর্বক কাতরকণ্ঠে
বিলাপ করিতে লাগিলেন ।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে অতি কষ্টে আশ্বস্ত করিয়া উভয়ে আবার
বনে, উপবনে, সরোবরে, গোদাবরীতীরে, এবং সীতার সমস্ত গন্তব্য-
স্থানেই তাঁহাকে যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু
কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না । রাম উদ্ভ্রান্তচিত্তে সরিষরা
গোদাবরী ও পর্বতশ্রেণীকে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু
কেহই কোন উত্তর প্রদান করিল না । তদর্শনে তিনি রোবে প্রজ্জলিত
হইয়া যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করিবার নিমিত্তই কটিতটে বদ্ধল ও
চৰ্ম্ম পরিবেষ্টন এবং মস্তকে জটাতার বন্ধন করিলেন । তাঁহার নেত্র
আরক্ত হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল । তিনি
শরাসন গ্রহণ ও সূদৃঢ় মুষ্টিদ্বারা তাহা ধারণ করিয়া তাহাতে এক
প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন । লক্ষ্মণ তাঁহার এই রক্তমূর্ত্তি দেখিয়া
মূহূৰ্ত্তনে নানাপ্রকার যুক্তিপ্রদর্শন পূর্বক তাঁহার ক্রোধশাস্তি
করিলেন ।

রাম লক্ষ্মণের বাক্যে স্থির হইয়া সীতার অন্বেষণার্থ পুনর্বার নানা-

স্থানে ভ্রমণ করিলেন এবং একস্থলে কুশিরাস্ত্র জটায়ুকে দেখিয়া তাঁহাকেই সীতার হস্তা মনে করিলেন । তিনি তীক্ষ্ণশরদ্বারা জটায়ুর প্রাণবিনাশে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে আসন্নমৃত্যু বিহগরাজ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া সীতাহরণসংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ অতিশয় কষ্টে নিবেদন করিলেন । রাবণ সীতাকে একাকিনী পাইয়া অগহরণ করিয়া পলাইতেছিল, জটায়ু তদ্রূপে সীতার রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ছুরায়া রাক্ষসের সাংগ্রামিক রথ সারথি ও ছত্র প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই বিনষ্ট করিয়াছেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য রাবণ তাঁহাকে ছিন্নপক্ষ ও শরবিদ্ধ করিয়া আকাশপথে সীতাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে । জটায়ু রামের আগমনকাল পর্য্যন্ত কষ্টে জীবন রক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে সীতার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সফেন শোণিত উল্গার করিতে করিতে গতাস্থ হইলেন ।

রাম হিতাকাঙ্ক্ষী জটায়ুর মৃত্যুশোকে অধিকতর কাতর হইয়া লক্ষ্মণের সাহায্যে এক চিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং তদুপরি তাঁহাকে আরোপণ করিয়া তাঁহার অগ্নিক্রিয়া সমাধা করিলেন । অনন্তর গোদাবরীজলে তাঁহারা ন্নান তর্পণ করিয়া সীতার অন্বেষণে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন । কিয়দূর যাইতে না যাইতে তাঁহারা এক গহনবনে প্রবিষ্ট হইলেন । এই বনের নাম ক্রোধারণ্য । তাঁহারা যত্নসহকারে সেই অরণ্যে সীতার অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না । অনতিদূরে মতঙ্গাশ্রম নামে এক নিবিড় বন ; রামলক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক অভিনব বিপজ্জালে জড়িত হইলেন । কবন্ধনামা এক দীর্ঘবাহু রাক্ষস তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের সুকোমল মাংসে উদরপূরণের বাসনা করিল । তাহার বিকৃত আকার ও ভীষণমূর্ত্তি । সে শোকসন্তপ্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে বাহুদ্বারা অনায়াসে গ্রহণ করিয়া নিপীড়িত করিতে

লাগিল। সুকুমার লক্ষ্মণ রাক্ষসের হস্তে বিবশ হইয়া কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে রাম তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং উভয়ে বীরোচিত সাহস প্রদর্শন করিয়া রাক্ষসের বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কবন্ধ মেঘবৎ গম্ভীররবে দিগন্ত প্রাতিধ্বনিত করিয়া শোণিতলিপ্তদেহে ভূমিতলে পতিত হইল, এবং মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া রাম লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। কবন্ধ তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত ও রাবণকর্তৃক সীতাহরণসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে ঋণাত্মক পর্বতে সুগ্রীবনামা বানরপ্রধানের সহিত যিহ্নতা স্থাপন করিতে উপদেশ প্রদান করিল, এবং ঋণাত্মক বাইবার পথ প্রদর্শন করিয়া অন্নকণমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে কবন্ধের প্রাৰ্থনানুসারে, রামলক্ষ্মণ করিগুণ্ডভগ্ন শুককাষ্ঠদ্বারা এক চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তাহার দেহ দগ্ধ করিলেন, এবং পুনর্বার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক নিঃশঙ্কমনে ঋণাত্মকপর্বতোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মযুগলে কত যে মনোহর বন ও ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। এক পর্বতপৃষ্ঠে নিশা যাপন করিয়া তাঁহার পরদিন প্রাতঃকালে পম্পাসরোবরের পশ্চিমতটে উপনীত হইলেন। অদূরে তাপসী শবরীর আশ্রম ছিল; রামলক্ষ্মণ তাপসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন পূর্বক বিমল আনন্দ অহুভব করিলেন। তাপসীও তাঁহাদের শুভাগমনে আপনাকে ধন্য মনে করিলেন, এবং সেই মনোহর আশ্রমের যে যে স্থলে শুকসত্ত্ব মহর্বিগণ যজ্ঞোচ্চারণ পূর্বক জলন্ত অনলে পবিত্র দেহপঞ্জর আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদিগকে দর্শন করাইলেন। অনন্তর সেই চীরচন্দ্রধারিণী জটীলা শবরী পৃথিবীতে আপনার অবস্থানকাল শেবপ্রায় জানিয়া রামের সম্মুখেই অধিকৃত নিজ দেহ ভস্মীভূত করিলেন। তাপসী

স্বর্গারোহণ করিলে, রামলক্ষ্মণ সেই স্থান হইতে মনোরম পম্পাতটে উপনীত হইলেন, এবং তাহার বিচিত্র শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন । পম্পার ক্ষটিকবৎ স্বচ্ছলিলে কমলদল বিকশিত রহিয়াছে ; কোথাও কদম্ব নাই, সর্বত্রই কোমল বালুকাকণা, জলমধ্যে মৎস্যকচ্ছপেরা নিবিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে । উহার কোনস্থান কল্লারে তাম্রবর্ণ, কোন স্থান কুমুদে শ্বেতবর্ণ, এবং কোন স্থান কুবলয় সমূহে নীলবর্ণ । উহার তীরভূমি তিলক অশোক বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ-রাজিতে পরিশোভিত ; কোথাও কুমুদিত আম্রবন, কোথাও সুরম্য উপবন, কোথাও লতাসকল সহচরী সখীর ত্রায় বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, এবং কোন স্থান বা ময়ূররবে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে । রাম পম্পাদর্শন করিয়া সীতাবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন । পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়া তাঁহার মনকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিতে লাগিল, এবং তিনি প্রিয়তমা জানকীর বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন । স্থিরবুদ্ধি লক্ষ্মণ শোকবিহ্বল রামকে বিপদে ধৈর্য্যধারণ করিতে, এবং যাহাতে পাণিষ্ঠ রাবণের দণ্ডবিধান করিয়া তাঁহারা দেবী জানকীকে উদ্ধার করিতে পারেন তাহারই উপায় চিন্তা করিতে বলিলেন । রাম লক্ষ্মণের বাক্যে সংযতচিত্ত হইয়া ঋষামুকপর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।

পম্পার অনতিদূরেই ঋষামুক পর্ব্বত অবস্থিত ছিল । কপিরাজ স্তম্ভীষ পর্ব্বতের সন্নিধানে সঞ্চরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি অস্ত্রধারী রামলক্ষ্মণকে সহসা সেই দিকে আসিতে দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে আগমন করিয়া মস্ত্রিগণের নিকট আপনার ভয়কারণ বিবৃত করিলেন । অনন্তর সকলের পরামর্শে হনুমান নামে এক বুদ্ধিমান বানর এই বীরযুগলের গতিবিধি ও

বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত ভিক্ষুবশে তাঁহাদের সন্নিহিত হইলেন এবং বিনীতবচনে স্তম্ভুরকণ্ঠে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উপযুক্তপরি প্রশ্ন করিলেও রামলক্ষণকে নিরুত্তর দেখিয়া হনুমান আপনার ও স্ত্রীবাণী বানরগণের পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন স্ত্রীবাণী বানরগণের অধিপতি ও পরম ধার্মিক। ছোষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর বাণী তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তিনি হুঃখিতমনে সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন। হনুমান তাঁহারই নিয়োগে বীরদ্বয়ের নিকট আগমন করিয়াছেন; স্ত্রীবাণী তাঁহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। অপ্রতিহতগতি হনুমান তাঁহারই প্রিয়কামনায় ভিক্ষুরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া ধ্যামুক হইতে তাঁহাদের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছেন।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষণ উভয়েই যারপর মাই আনন্দিত হইলেন। যাহাকে তাঁহারা অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই মহাবল স্ত্রীবাণী তাঁহাদের সহিত সখ্যস্থাপন করিতে সমুৎসুক, ইহা শ্রবণমাত্র তাঁহাদের আনন্দের আর পরিমীমা রহিল না। রামচন্দ্র হনুমানের স্তম্ভুরকণ্ঠ, ব্যাকরণশুদ্ধ, স্বরাক্ষর, সরল ও মধুর বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং লক্ষণকে হনুমানের সহিত আলাপ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সুধীর লক্ষণ হনুমানকে প্রত্যুত্তরে আপনাদের সমস্ত পরিচয়ই প্রদান করিলেন, এবং কবন্ধের বাক্যে মহাত্মা স্ত্রীবাণীর সহিত সখ্যস্থাপন করিতেই যে তাঁহারা সেই স্থানে আগমন করিয়াছেন তাহাও প্রকাশিত করিয়া বলিলেন। হুঃখিতা রাবণ সীতাদেবীকে একাকিনী পাইয়া অপহরণ করিয়াছে, রামলক্ষণ তাহার বাসস্থান অবগত নহেন। মহামতি স্ত্রীবাণীর কোন স্থান অপরিজ্ঞাত নহে, তিনি জানকীর অনুসন্ধান করিয়া দিয়া শোকার্ত ক্রমের শোকাপনোদন করিলেও করিতে পারেন। রামলক্ষণ একপে

সেই কপিরাঙ্কেরই শরণাপন্ন হইতেছেন। সৌভাগ্যক্রমেই তাঁহারা মহাবীর হনুমানের দর্শন পাইলেন।

হনুমান লক্ষণের নিকট তাঁহাদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সমুচিত আশা ও উৎসাহ প্রদান করিলেন, এবং বীরকেশরী সূগ্রীবের অশেষ গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইতে অভিলাষী হইয়া তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে আরোপণ পূর্বক ঋষামুক পর্বতে উপনীত হইলেন। হনুমানের মুখে রাম লক্ষণের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া সূগ্রীব পুলকিতমনে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “রাম, হনুমানের নিকট তোমার গুণগ্রাম প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ; সকলের উপর তোমার বাৎসল্য আছে। আমি বানর; তুমি আমার সহিত বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এই আমার সম্মান। এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীস্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিলাম, গ্রহণ কর এবং অটল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও।” (৪৮)

রাম আনন্দিত মনে সূগ্রীবের হস্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময়ে হনুমান দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন পূর্বক পুষ্পদ্বারা তাহা অর্চনা করিলেন, এবং বন্ধুদ্বয়ের মধ্যস্থলে তাহা রক্ষা করিলেন। রাম ও সূগ্রীব উভয়ে সেই প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া প্রীতিভরে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূগ্রীব শালবৃক্ষের এক পত্রবহুল কুসুমিত শাখা ভগ্ন করিয়া তদুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন ও নানাপ্রকার সুখ দ্রুতের কথা কহিতে লাগিলেন। সীতা আকাশ বা রসাতলেই থাকুন, সূগ্রীব তাঁহাকে আনয়ন করিয়া রামের হস্তে সমর্পণ করিবেন। রামচন্দ্র বিম্বাদ ও শোক পরিত্যাগ করেন। সূগ্রীব বাহা প্রতিজ্ঞা

করিলেন, কদাচই তাহার অল্পথা হইবে না। সীতাহরণের কথা শুনিয়া সুগ্রীবের সহসা একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। একদিন সুগ্রীব প্রভৃতি পাঁচটি বানর পরস্পরোপরি উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে এক নিশাচর একটা রমণীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আকাশপথে পলায়ন করিতেছিল। সেই নারী হৃদয়বিদারী আর্তনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেছিলেন, এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণকে গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা উত্তরীয় ও কতকগুলি অলঙ্কার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুগ্রীব সেই দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে রক্ষা করিয়াছেন ; সম্ভবতঃ সেই দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরই রাবণ এবং সেই রোরুদ্যমানা রমণীই সীতা হইবেন। এই বলিয়া সুগ্রীব একটা গুহা হইতে উত্তরীয় ও অলঙ্কারগুলি আনয়ন করিলেন। রাম তৎসমুদয় দেখিয়াই সীতার বলিয়া চিনিতে পারিলেন ; তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে আচ্ছন্ন হইয়া গেল ; তিনি সীতাকে স্মরণ করিয়া রোদন এবং সেই অলঙ্কারগুলি বারম্বার হৃদয়ে স্থাপন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন ; রাম তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া অনর্গল অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে কহিলেন, “লক্ষ্মণ, দেখ, রাক্ষস-কর্তৃক অপহৃত হইবার কালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ হইতে এই অলঙ্কারগুলি ফেলিয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, নচেৎ এই গুলি কদাচই পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকিত না।” তখন লক্ষ্মণ কহিলেন “আর্য্য, আমি কেয়ূর জানি না, কুণ্ডলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম করিতাম এই জন্ত এই দুই নুপুরকেই জানি।” (৪১৬)

রামকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া সুগ্রীব স্তম্ভুর বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন, বলিলেন শোকবিহ্বল হইলে কোন ফলোদয় হইবে না ; মনীষগণের পৌরুষ আশ্রয় করিয়া কার্য্যোদ্ধার করাই কর্তব্য।

সুগ্রীবও বিপদাপন্ন হইয়াছেন, বালী তাঁহার রাজ্য ও জ্ঞী গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার মিত্রবর্গকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন। সুগ্রীবের হৃৎকণ্ড ও শোকের অবধি নাই, কিন্তু তথাপি তিনি কখনও শোকে বিহ্বল হন নাই, বরং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অন্ত্রায় প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের বাক্যে শোক পরিহার পূর্বক কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ক্রিয়ৎক্ষণপরে বলিলেন “সুগ্রীব তোমার অমুনয়ে এই আমি প্রকৃতিস্ত হইলাম। এইরূপ বিপদকালে ঈদৃশ বজ্রলাভ নিতান্তই দুর্ঘট। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ ও সেই ছুরাচার রাক্ষসের বধসাধন, এই দুইটি বিষয়ে তোমায় সবিশেষ যত্ন করিতে হইবে। অতঃপর আমিই বা তোমায় কি করিব, তুমি অকপটে তাহাও বল।” (৪:৭) রাম যাহার সহায় তাহার আর অভাব কি ? রামের সাহায্যে সুগ্রীব স্বরাজ্য কেন, দেবরাজ্যও আয়ত্ত করিতে পারিবেন। সুগ্রীব এই বলিয়া বালীর সহিত আপনার বৈরিতার কারণ ও তদবধি যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই রামকে বলিতে লাগিলেন। তিনি অগ্রজের বিক্রম ও পৌরুষ কীর্তন করিলেন, বলিলেন বালীর স্ত্রায় বীর জগতে কোথাও বিদ্যমান নাই। সুগ্রীব তৎকর্তৃক পরাস্ত ও পুত্রকলত্রবিরহিত হইয়া ধ্বাংস পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক হৃৎকণ্ড ও মনঃকণ্ঠে কালযাপন করিতেছেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বন্ধুকে বিপজ্জাল ও বালীত্রাস হইতে সর্বাপ্রাণে মুক্ত না করিলে, সুগ্রীব কিরূপেই বা রামের উপকার করিতে সমর্থ হইবেন ?

রাম সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বালীবধে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সপ্ততাল ভেদ করিয়া স্বীয় বাহুবলে বজ্র প্রত্যয় সমুৎপাদন করিলেন। তদর্শনে সুগ্রীব ও অন্তান্ত বানরগণ বিস্মিত হইয়া রামের বলবীৰ্য্যের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বালীকে সংহার

করিয়া স্ত্রীবকে কিঙ্করা রাজ্য প্রদান না করিলে স্ত্রীব সীতাদেবনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইবেন না ইহা বিবেচনা করিয়া রঘুবীর রামচন্দ্র সর্বাঙ্গে তাঁহাকে রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং সেই দিনই তাঁহাকে বালীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন । রামের বাক্যে স্ত্রীব অতিশয় প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কিঙ্করায় যাত্রা করিলেন, এবং পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ বালীকে ঘোররবে আহ্বান করিতে লাগিলেন । মহাবীর বালী স্ত্রীবের সিংহনাদ শ্রবণমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহির্গত হইলেন, এবং আহ্বানকারী ভ্রাতার সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় রামচন্দ্র ধনুর্ধারণপূর্বক বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন ; তিনি ভ্রাতৃযুগলকে তুল্যাকার ও অভিন্নরূপ দেখিয়া তাঁহাদের প্রভেদ বুঝিতে সক্ষম হইলেন না এবং মিত্রবধভয়ে শরমোচনও করিলেন না ।

কিরংক্ষণ যুদ্ধ হইলে স্ত্রীব প্রবল বালীর নিকট পরাস্ত হইলেন, এবং রাম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন না বুঝিয়া ঋষ্যমুকাতিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন । বালীর প্রহারে তাঁহার দেহ জর্জরিত অবসন্ন ও রক্তাক্ত হইয়াছিল, তিনি অতিকষ্টে এক গহনবনে প্রবেশপূর্বক লুকায়িত হইলেন ; বালীও মূনির শাপ স্মরণ করিয়া আর অগ্রসর হইলেন না । এদিকে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহিত, অনতিবিলম্বেই স্ত্রীবের নিকট উপস্থিত হইলেন । স্ত্রীব লজ্জা ও অপমানে ত্রিস্রমাণ হইয়া অভিমান ভরে রামের প্রতি মর্মভেদী কঠোর বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । রাম তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে কহিলেন, সখে, ক্রোধ করিও না । আমি যে কারণে শরত্যাগ করি নাই শ্রবণ কর । তোমরা উভয়েই তুল্যরূপ ছিলে, আমি তোমাদের সৌসাদৃশ্যে একান্ত মোহিত ও

অত্যন্ত শক্তিত হইয়া প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করি নাই। পাছে আমাদের মূলে আঘাত হয়, আমার মনে এই সন্দেহই হইয়াছিল। * * * সখে, অধিক আর কি বলিব, আমি লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত, তোমারই আশ্রয়ে আছি; এই অরণ্যমধ্যে তুমিই আমাদের গতি। এক্ষণে পুনর্ব্বার গিয়া নির্ভয়ে স্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তুমি এই মুহূর্ত্তেই দেখিবে বালী আমার একমাত্র শরে নিরস্ত হইয়া ভূতলে লুপ্তিত হইতেছে।” (৪।১২) এই বলিয়া রামচন্দ্র স্ত্রীকে চিহ্নিত করিবার জন্ত তাঁহার কণ্ঠে এক কুসুমিত নাগপুস্পী লতা বন্ধন করিয়া দিলেন।

অনন্তর সকলে পুনর্ব্বার কিষ্কিন্দায় উপনীত হইলেন। স্ত্রীক সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া বালীকে আবার যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বালী স্ত্রীকে পুনরাগত দেখিয়া ক্রোধকষায়িতলোচনে মহাবেগে গৃহ হইতে বহির্গমন করিতে লাগিলেন। তারা বালীর মহিষী; তিনি অতিশয় পতিপ্রণয়িনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্ত্রীক কিয়ৎক্ষণ পূর্বে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, আবার তিনি কিষ্কিন্দায় আসিয়া বালীর সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার মনে কেমন এক প্রকার বিষয় ও আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কিন্তু একটা কথা সহসা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া গেল। একদিন যুবরাজ অঙ্গদ চরমুখে দশরথতনয় রামলক্ষ্মণের সহিত স্ত্রীকের মিত্রতার কথা শ্রবণ করিয়া জননীকে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণ উভয়েই বীর পুরুষ; হয়ত তাঁহাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্ত্রীক বালীর সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছেন। রাম স্ত্রীকের সহায় থাকিলে বালীর অমঙ্গল ঘটিতে পারে, এই বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমতী তারা গমনোদ্যত স্বামীর পথরোধ করিলেন এবং তাঁহাকে সেই দিন যুদ্ধ না করিয়া গৃহেই অবস্থান

করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, তারা আপনায় সমস্ত আশঙ্কাই বালীর নিকট নিবেদন করিলেন। বালী তেজস্বী পুরুষ, ভয় কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, সুতরাং তিনি তারার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রামভীতি সঙ্কে তিনি বলিলেন “রাম ধর্মজ্ঞ ও কর্তব্যপরায়ণ, পাপকর্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন?” তারাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া বালী ক্রোধাবিষ্টমনে পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং স্নগ্ৰীবকে দেখিয়াই তাঁহার সহিত ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বালীর প্রাণান্তকর প্রহারে স্নগ্ৰীব অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। রাম ধনুর্ধার ধারণ পূর্বক এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি বন্ধুকে অবসন্ন দেখিয়া বালীর প্রতি এক ভূজঙ্গভীষণ শর মোচন করিলেন। শর গর্জনে করিতে করিতে বিদ্যুৎসেগে বালীর দেহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি দেহ প্রসারণ পূর্বক, ছিন্নমূল বৃক্ষের শ্রায়, ভূতলে পতিত হইলেন। মর্ম্বঘাতী শরে আহত হইয়া বালী দারুণ যন্ত্রনা ভোগ এবং অতিশয় কষ্ট সহকারে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষণের সহিত বহুমানপূর্বক মৃদুপদসঞ্চারে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। বালী রামকে দেখিবামাত্র তাঁহার প্রতি কঠোর বাক্যসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বালী রামকে ধর্মপরায়ণ ও বীর বলিয়াই জানিতেন; কিন্তু তিনি যে এতাদৃশ অধার্মিক ও কাপুরুষ, তাহা বালীর স্বপ্নের অগোচর! রাম সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া নীচপ্রবৃত্তি ক্ষত্রিয়ধর্মের শ্রায় বালীকে অসাবধান অবস্থায় সংহার করিয়াছেন, এতদ্বারা তাঁহার অপযশ জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। বালী রামের কোনই অনিষ্টসাধন করেন নাই; তবে অকারণবৈরিতার বশবর্তী হইয়া তিনি এই ধর্মবিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন কেন? রাম নিশ্চয়ই ধর্মধ্বজি, দুরাচার ও পাপনিরত। তিনি উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিতচিত্ত, ও

রাজকাৰ্য্যের নিতান্তই অল্পযুক্ত । সীতাকে উদ্ধার করাই যদি তাঁহার অভিপ্ৰেত ছিল, তাহা হইলে বালীকে বলিলেই তিনি দুৰ্দ্ধৃত্ত রাবণের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া রামের হস্তে জানকীকে অনাস্থাসেই সমৰ্পণ করিতে পারিতেন । এইরূপে অনেককাল রামের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া বালী অবশেষে নিরস্ত হইলেন । তখন রামচন্দ্র বালীকে ধীরে ধীরে অনেক হিতবাক্য কহিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন বালী সমুচিত বিবেচনা না করিয়াই রামের নিন্দা করিতেছেন । প্রথমতঃ তাঁহার স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সূগ্ৰীব রামের মিত্র ; রাম সূগ্ৰীবের নিকট বালী বধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা রামের একান্তই কর্তব্য । দ্বিতীয়তঃ, বালী সনাতন ধৰ্ম্ম উল্লঙ্ঘনপূৰ্ব্বক ভ্রাতৃজায়া ক্রমাকে গ্রহণ করিয়াছেন । মহাত্মা সূগ্ৰীব জীবিত আছেন ; তাঁহার পত্নী শাস্ত্রানুসারে বালীর পুত্রবধু ও কন্তাস্থানীয়া ; তাঁহাকে অধিকার করিয়া বালী মহাপাতকগ্রস্ত হইয়াছেন । অধাৰ্ম্মিক রাজার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায় । এই নিমিত্তই রামচন্দ্র বালীর সমুচিত দণ্ডবিধান করিলেন । কিঙ্কিণী রাজ্য ইক্ষাকু-বংশীয় রাজগণের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যের দণ্ড-পুরস্কার তাঁহারাই করিয়া থাকেন । সত্য বটে ধৰ্ম্মবৎসল ভরত এক্ষণে সমস্ত ভূবিভাগের অধীশ্বর ; কিন্তু তাহা হইলেও, রামচন্দ্রেরও ধৰ্ম্ম লষ্টকে নিগ্রহ করিবার ক্ষমতা আছে । মনু কহিয়াছেন, মনুষ্যেরা পাপাচরণপূৰ্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় ও পুণ্যশীল সাধুর জ্ঞান স্বৰ্গে গমন করিয়া থাকে । কিন্তু যে রাজা পাপীকে দণ্ড না দিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন, তিনি দারুণ পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন । অতএব রামচন্দ্র ধৰ্ম্মানুসারেই বালীর বধসাধন করিয়াছেন ।

রামচন্দ্র ধৰ্ম্মলষ্ট বালীকে বধ করিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়াছেন, ইহা জ্ঞানসঙ্গত হইলেও কাপুরুষের জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে কোন ব্যক্তির

প্রতি শরনিক্ষেপ করা যে কোনমতেই পৌরুষের কার্য্য নহে, তাহা তিনি অবশ্যই মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সরলভাবে আপনার দোষস্বীকার না করিয়া কূটযুক্তি পথ অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার দোষক্ষালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বালীকে বলিলেন “বীর, আমি তোমার প্রচ্ছন্ন বধসাধন করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি, এবং তজ্জন্ত শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে থাকিয়া বাস্তুরাপাশ প্রভৃতি নানাবিধ কূটউপায় দ্বারা মৃগকে ধরিয়া থাকে। মৃগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, অস্ত্রের সহিত বিবাদ করুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমাত্র দোষ নাই। দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতিরাও অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকেন; তুমি শাখামৃগ, বানর; বৃদ্ধ কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। বীর, রাজা প্রজাগণের দ্বলভ ধর্ম্ম রক্ষা করেন, শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং উহাদের জীবনও তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত। রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। স্মতরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলা উচিত নহে।” (৪১৮)

এই যুক্তি পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ রামচন্দ্রের বালীবধরূপ কার্য্যটির উচিত্যানোচিত্য আপনারাই বিচার করিতে সমর্থ হইবেন। এস্থলে তৎসম্বন্ধে অধিক বলা নিম্প্রয়োজন। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রামচন্দ্র ঈদৃশ ঘৃণিত যুক্তিপথ অবলম্বন না করিলেই ভাল করিতেন। অত্যাশ কার্য্য করিয়া তাহা স্বীকার করাই তাঁহার ত্রায় মহাপুরুষগণের একান্ত কর্তব্য।

মুহূর্ত্তমধ্যে বালীবধসংবাদ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পাড়ল। মহিষী তারা এই নিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আলুলায়িতকেশে উন্মাদিনীর ত্রায় যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সহচরীগণে পরিবৃত্ত ও

বালীর পার্শ্বে ধূলিতে অবলুপ্তিত হইয়া করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন । সেই বিলাপ শ্রবণে ভ্রাতৃহস্তা স্ত্রীবেরও নিশ্চয় হৃদয় বিচলিত হইল । যুবরাজ অঙ্গদ অনাথের ত্রায় রোদন করিতে করিতে অশ্রু-জলে ধরাতল অভিষিক্ত করিলেন । রামলক্ষণও সেইস্থলে নির্দিকার-চিত্তে অবস্থান করিতে সক্ষম হইলেন না । এদিকে কণ্ঠাগতপ্রাণ বালী স্ত্রীকে নিকটে আহ্বান করিয়া স্নেহে কহিতে লাগিলেন “স্ত্রী, আমি পাপবশাৎ অবশ্রম্ভাবী বুদ্ধিমোহে বলপূর্বক আকৃষ্ট হইতেছিলাম, স্ত্রতরাং তুমি আমার অপরাধ লইও না । আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ্য ও রাজ্যস্থখ ভাগ্যে বুদ্ধি যুগপৎ নির্দীষ্ট হয় নাই, নচেৎ ইহার কেন এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিবে ? যাহাহউক, তুমি আজ এই বনবাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব ।” (৪১২২) এই বলিয়া তিনি সজলনয়নে প্রাণাধিক অঙ্গদ ও মন্দভাগিনী তারাকে স্ত্রীবের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং অঙ্গদকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদানান্তর রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অনন্তনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন ।

বালীর মৃত্যুতে কিক্কিানগরী শোকাচ্ছন্ন হইল । বালীর দেহ শিবিকা দ্বারা বাহিত হইয়া চন্দনকাষ্ঠরচিত চিতামধ্যে সংস্থাপিত হইল, এইরূপে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে, স্ত্রীবে কিক্কিকার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন । রাম পিত্রাজ্ঞাপালনাত্ম-রোধে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন না । কুমার অঙ্গদ রামের আদেশে ষোড়শরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন । তখন বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে যুদ্ধযাত্রা করা নিষিদ্ধ ; এই নিমিত্ত রামচন্দ্র স্ত্রীকে নিজ রাজপ্রাসাদেই বর্ষাযাপন করিতে অমুগতি প্রদান করিলেন, আর স্বয়ং সেই স্ত্রীর্ষ প্রাবৃট্‌কাল গুহাকন্দরশোভী মনো-হর পর্বতপৃষ্ঠেই অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন । কিন্তু তিনি

কপিরাজকে কার্তিক মাসের প্রারম্ভেই রাবণবধের সমুচিত উদ্যোগ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন ।

রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রাশ্রবণ পর্বতে প্রত্যাগমন করিলেন । শ্রাবণের অবিরল আসারপাত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা এক সুপ্রশস্ত সুদৃষ্ট গুহা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । বর্ষাকালে ধরণীর এক অপূর্ব শোভা হইল । নদীসকল কর্দমময় জলে পরিপূর্ণ ও উচ্ছলিত ; তাহাতে হংসচক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ মহানন্দে অনবরত ক্রীড়া করিতেছে । আকাশ পর্বতপ্রমাণ মেঘে নিরন্তর আচ্ছন্ন ; তাহা হইতে অবিরলধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছে । কখনও ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জনে গুহা সকল প্রতিধ্বনিত হইতেছে । রজনী অন্ধকারময়ী ; দামিনী মুহুমূহ উদ্ভাসিত হইতেছে । ক্ষণপ্রভার চঞ্চল আলোকে শশৈলকাননা ধরিত্রী প্রতিমূর্ত্তে ভীষণ হইতে ভীষণতর রূপ পরিগ্রহ করিতেছে । ভৈরবসকল গম্ভীররবে রজনীর ভীষণতা বিমোহিত করিতেছে । নয়ূরসকল কেকারবে দিম্বাগুল পরিপূর্ণ করিতেছে । কদম্ব ও কেতকী পুষ্পসকল বিকশিত হইয়া চতুর্দিকে মনোহর গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে ; জম্বুবৃক্ষে ভ্রমরকুম্ব রসালফল সকল লম্বমান রহিয়াছে । কোথাও সুপক্ক আম্রফলসকল বায়ুবেগে চতুর্দিকে বিকশিত হইতেছে, কোথাও মাতঙ্গগণ নিব্বরশব্দে আকুল হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে ; আর কোথাও বা বানরেরা যারপর নাই জ্বষ্ট হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লক্ষ্যপ্রদান করিতেছে । অবিরল বৃষ্টিপাতে নদী, হ্রদ, তড়াগ, সরোবর ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি জলাশয়সকল জলময় হইল ; তৎকালে লোকে গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরগমনের অভিলাষ করিল না । রাজগণ যুদ্ধযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল । হরিণ হরিণীদল প্রাশস্ত শ্রামল ক্ষেত্রে আর পরিদৃষ্ট হইল না । রামলক্ষ্মণ গুহামধ্যেই সতত আবদ্ধ রহিলেন । রাম অতিশয় কষ্টেই সেই দাক্ষণ

বর্ষাকাল বাপন করিলেন । সীতার বিরহে তিনি অনবরত অশ্রুধারা মোচন করিতে লাগিলেন । মেঘগর্জনে শ্রবণে তিনি ত্রিয়মাণ হইতেন ; বৃষ্টির ঝঙ্কারে তাঁহার মনে সীতাসংক্রান্ত কত পুরাতন স্মৃতিই জাগ্রত হইত ! ময়ূরের কেকারবে তিনি বিমনাশ্রমণ হইতেন ; নীরব নিশীথে ভেকের গম্ভীর কোলাহলে তাঁহার মন উদাস হইয়া পড়িত । কখন কখন সীতার ছুরবস্থা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইত ; কখন তিনি বালকের স্তায় রোদন করিতেন ; কখন কখন অনন্তমনে সীতাকেই ধ্যান করিতেন, এবং কখনও বা সীতা-লাভবাসনায় অধীর হইয়া সমুৎসুকচিত্তে বর্ষাশেষ প্রতীক্ষা করিতেন । সুধীর লক্ষণ এই হুঃসময়ে নানাবিধউপায়ে অগ্রজকে স্থস্থিরচিত্ত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ।

ক্রমে বর্ষা তিরোহিত এবং শরৎ সমাগত হইল । ধরিত্রী হাস্য-ময়ী, আকাশ সুপ্রসন্ন ও বৃক্ষলতা ফলপুষ্পে সুশোভিত হইল । সর্বস্থল পরিষ্কৃত, পথ কর্দমশূন্য, জল সুনির্মল এবং জলাশয় সকল কুমুদকল্লারে প্রফুল্ল হইল । বৃক্ষলতা, পুষ্পফল, বন উপবন, গিরি নদী, পশু পক্ষী, কীটপতঙ্গ এবং নরনারী সকলেরই মধ্য হইতে যেন এক দিব্য আনন্দ পরিষ্ফুট হইতে লাগিল । রাম এই আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিলেন, কিন্তু সীতার বিরহে তাহা এক ঘোর বিষাদে পরিণত হইয়া গেল ! সৈন্তসংগ্রহের সময় অতীত প্রায় হইল ; সুগ্রীব কিঙ্কিদ্ধানগরীতে ক্রমা তারা প্রভৃতি রমণীগণে পরিবৃত্ত হইয়া আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন আছেন ; বাঁহার কুপায় রাজ্যাত্তী লাভ করিলেন, সেই হুঃস্থ বজ্র দশা একটিবারও চিন্তা করিলেন না । স্মতরাং রাম তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও শোকসন্তপ্ত হইয়া লক্ষণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন ।

লক্ষণ ক্রোধে প্রজ্বলিতহতাশনের স্তায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া

সকলের গনে সজ্জাস সমুৎপাদন পূর্বক ধনুর্কীর্ণ হস্তে কিঙ্কিঙ্কার পুর-
 দ্বারে উপনীত হইলেন। বানরেজ্ঞা তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে ইতস্ততঃ
 পলায়ন করিল। যুবরাজ অদ্ভুত লক্ষণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভীতমনে
 তাঁহার সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিতে
 বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন। লক্ষণের আদেশে যুবরাজ অন্তঃপুরে
 প্রবেশ করিয়া সুগ্রীবকে তাঁহার আগমন সংবাদ জানাইলেন। সুগ্রীব
 মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ান ছিলেন; লক্ষণ ক্রুদ্ধমনে
 পুরদ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন সহসা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র
 তিনি অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন এবং তাঁহাকে অনতিবিলম্বে
 অন্তঃপুরে আনয়ন করিতে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিমতী তারাকে প্রেরণ করি-
 লেন। প্রিয়দর্শনা তারা মদবিহ্বললোচনে স্থলিতগমনে লক্ষণের
 নিকট উপস্থিত হইলেন। লক্ষণ দূর হইতেই কাকীীর রব ও নৃপু-
 ঞ্জনি শ্রবণ করিয়া তটস্থ হইলেন, এবং স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যবশতঃ
 ক্রোধ পরিহার পূর্বক অবনতমুখে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।
 তারা স্তম্ভুর প্রিয়বাক্যে লক্ষণের ক্রোধ অপনয়ন করিলেন, বলিলেন
 সুগ্রীব তাঁহাদের মিত্র, সূতরাং ভ্রাতার ছায় সন্মানের যোগ্য। ভ্রাতা
 অপরাধী হইলেও তৎপ্রতি ক্রোধপ্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে।
 সত্য বটে সুগ্রীব মোহবশতঃ বিষয়স্থখে নিমগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু
 তাহা হইলেও তিনি রামের উপকার ক্ষণকালের নিমিত্তও বিস্মৃত হন
 নাই; সীতা সমুদ্রার ও রাবণবধে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা
 পালন করিতে তিনি সর্বদাই সমুৎসুক। ইতঃপূর্বেই তিনি সৈন্তসংগ-
 হের আদেশ প্রচার করিয়াছেন, আর কিয়দ্বিবসমধ্যেই সৈন্তসকল
 সমবেত হইবে। লক্ষণ ক্রোধ পরিহার পূর্বক তারার সহিত অন্তঃ-
 পুরে প্রবেশ করুন, এবং সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপ-
 নার মনোগতভাব ব্যক্ত করুন।

লক্ষণ তারার সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীবকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে বিলাসমগ্ন দেখিয়া যার পর নাই তিরস্কার করিলেন । রাম বালীর বধসাধন করিয়া স্ত্রীবকে রাজ্যাদী প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে স্ত্রীব অকৃতজ্ঞের ভ্রাতৃ উপকার বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে অবস্থান করিতেছেন । বর্ষা শেষ হইয়া, শরৎ সমাগত হইয়াছে । যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত ; রাম সীতাপ্রদোষে অবসন্ন হইতেছেন, এক্ষণে স্ত্রীবের প্রত্যাশার সময় আসিয়াছে । স্ত্রীব যদি আপন প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর না হন তাহা হইলে বালী যে পথে গিয়াছেন, তাঁহাকেও সেই পথে গমন করিতে হইবে । লক্ষণের ঈদৃশ কঠোর বাক্যে স্ত্রীব অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং বিনয়বচনে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন । লক্ষণও ক্রোধবশতঃ মিত্রের প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বীতক্রোধ হইয়া সমুচিত সন্মানপ্রদর্শনদ্বারা স্ত্রীবের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন । অনন্তর কপিরাজ, হনুমৎপ্রমুখ মন্ত্ৰীগণের পরামর্শে, চতুর্দিক্ হইতে বানরসৈন্যসংগ্রহের আদেশ প্রচার করিলেন । দূতেরা তদ্রূপে তৎক্ষণাৎ নানাদিকে প্রস্থান করিল ।

স্ত্রীব লক্ষণের সহিত শিবিকারোহণে প্রস্রবণ পূর্ব্বতে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন । রাম বন্ধুর যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া অতিশয় ছট্ হইলেন । কিয়দ্দিবস মধ্যে ধূলিজাল উড়ডীন করিয়া বানরসকল কিঙ্কিঙ্কায় সমবেত হইল । স্ত্রীব সীতার অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে নানা দিকে প্রেরণ করিলেন । কোন দল পূর্ব্বদিকে, কোন দল পশ্চিম দিকে, কোন দল উত্তর দিকে এবং কোন দল বা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল । এই শেবোক্তদলের মধ্যে বীরবর হনুমান, যুবরাজ অঙ্গদ, মন্ত্রী জাম্ববান প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরগণ বিদ্যমান ছিলেন । সীতাসংবাদ আনয়নার্থ স্ত্রীব বানরগণকে একমাসকাল মাত্র নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ;

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সকলে প্রত্যাগত না হইলে তাহাদের যে গুরুতর দণ্ডবিধান হইবে তাহাও তিনি প্রচারিত করিয়া দিলেন।

বানরগণের গ্রহান দিবস হইতে গণনায় ক্রমশঃ মাস পূর্ণ হইয়া আসিল। তখন বানরেরা সীতার কোথাও উদ্দেশ না পাইয়া হতাশ-হৃদয়ে কিঙ্কিঙ্কায় প্রত্যাগত হইতে লাগিল। মহাবীর বিনত পূর্বদিক্ হইতে, শতবলি উত্তর দিক্ হইতে এবং সূসেন সসৈন্তে ভীতমনে পশ্চিম দিক্ হইতে আগমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্রবণশৈলে রাম ও সূগ্রী-বের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদের ব্যর্থ অনুসন্ধান ফলজ্ঞাপন করিলেন। হনুমান ও অঙ্গদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বানরগণ তখনও প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া রাম সীতার উদ্দেশ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইলেন না।

অঙ্গদপ্রভৃতি বানরগণ দক্ষিণদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সীতার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তাঁহারা নানাস্থলে নানাপ্রকার বিপজ্জালে জড়িত হইলেন, অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইলেন না। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে সীতার সন্ধানপ্রাপ্তিসম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া তাঁহারা রাম ও সূগ্রীবের ভয়ে সমুদ্রতটে প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণ বিসর্জন করিবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং তদনুসারে সকলে এক স্থানে সমবেত হইলেন। সমুদ্রতটস্থ এক পর্বতোপরি সম্পাতি নামে এক বিহগরাজ বাস করিতেন। তিনি জটায়ুর ভ্রাতা। সম্পাতি বানরগণকে আপনার ভক্ষ্য মনে করিয়া মহোল্লাসে তাঁহাদের সমীপস্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট রাবণহস্তে ভ্রাতা জটায়ুর মৃত্যু ও সেই রাক্ষসকর্তৃক সীতার অপহরণ, এই দুই অগ্রিয় সমাচার শ্রবণ করিয়া অতিশয় হুঃখিত হইলেন। সম্পাতির নিকট বানরগণ সীতা ও রাবণের সংবাদ

পাইলেন। রাবণ সমুদ্রের পরপারবর্তী লঙ্কাদ্বীপে অবস্থান করিতেছে। সেই পামর সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া লঙ্কাতেই রাখিয়াছে। বানরগণ সাগর লঙ্ঘন করিলেই সীতার দর্শন পাইবেন। এই শুভ ও প্রিয় সংবাদ শ্রবণে বানরগণ হর্ষে আগ্রত হইলেন; তাঁহাদের মধ্য হইতে এক তুমুল কিলকিলাধ্বনি সমুখিত হইল। প্রধান প্রধান বানরগণ সাগরলঙ্ঘনের সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তৎসাধনে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। অবশেষে মহাবীর হনুমান আপনার অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সাগরলঙ্ঘনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সকলেই তাঁহার সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করিল। অনন্তর মহাবল পবনকুমার সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া এক উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং ভীমরূপ ধারণ করিয়া বীরদর্পে মহাতেজে আকাশমার্গে লক্ষপ্রদান করিলেন। জলচর, স্থলচর ও শূন্যচরেরা তাঁহার হুকারে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। তাঁহার গমনবেগবশাৎ এক প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইল এবং সমুদ্রের জলরাশিও সংকুচিত হইতে লাগিল। বানরগণ বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই মহাবীর পবনকুমার কুজ্বাটসমাচ্ছন্ন অনন্ত সাগরের অঙ্গাঠ সীমান্তরালে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন !



দশম অধ্যায় ।

সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কাদ্বীপ । লঙ্কা দেখিতে পরম রমণীয়, যেন প্রকৃতি-দেবীর একমাত্র লীলাভূমি । লঙ্কা মনোহর বন উপবন, শৈলকানন, গিরিশৃঙ্গা, নদনদী, প্রান্তরক্ষেত্র ও উদ্যান সরোবরে সমলঙ্কৃত । ত্রিকূটনামা এক পর্বতোপরি লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত, তাহার চতুর্দিকে গভীর দুর্লভ্য রাক্ষসরক্ষিত পরিখা । নগরী কনকময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত এবং অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ ও পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে পরিশোভিত । সর্বত্রই প্রাসাদ ; স্থানে স্থানে স্বর্ণস্তম্ভ ও স্বর্ণজাল ; কোনস্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোথাও অষ্টতল গৃহ এবং ইতস্ততঃ পতাকা ও লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ । নগরী পর্বতোপরি অবস্থিত ছিল, সুতরাং দূর হইতে বোধ হইত যেন উহা গগনে উড্ডীন হইতেছে । উহার স্থানে স্থানে শতরী ও শূলান্ত্র, এবং চতুর্দিকে ভীমদর্শন রাক্ষসসৈন্য । এই নগরীর মধ্যে নানাস্থলে উদ্যান, কৃত্রিম কানন, ও কমলশোভিত স্বচ্ছ সরোবর । কোথাও পান গৃহ, কোথাও গুল্মাগার, কোথাও চিত্রশালা, কোথাও ক্রীড়াভূমি, কোথাও বিন্দর-জনক ভূমধ্যস্থ গৃহ এবং কোথাও বা চৈত্যাভূমি । (দুর্জয় রাবণ এই মনোহর লঙ্কার অধীশ্বর । রাবণ বিশ্বশ্রবানামা এক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং নিকষানামী এক রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । ইহার অপর দুই ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ ; কুম্ভকর্ণ ভীমকায়, বিকটদর্শন ও রাবণের তুল্যই পামর ছিল ; কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ বিভীষণ জিতেন্দ্রিয়, সদাচারসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন । তিনি রাবণের পাপানুষ্ঠান দর্শনে মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন এবং সর্বদাই

সাহসপূর্বক তৎকৃত অন্ডায় কার্যমাত্রেয়ই ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। ইন্দ্রজিৎনামা রাবণের এক দুর্ভীষ পুত্র ছিল; কিন্তু সে দুরাশ্রাও পিতা অপেক্ষা কোন বিষয়েই নিকটতর ছিল না।

রাবণ যথেষ্টাচারী ইন্দ্রিয়পরবশ ও ভোগলালসার পরিপূর্ণ ছিল। সে কেবল পার্থিব সুখৈশ্বর্যবৃদ্ধির জন্তই বহুকাল তপস্তা করিয়াছিল। এই দুর্ভীষ সনাতন ধর্ম উল্লঙ্ঘন পূর্বক কত শত অবলা নারীকে যে হরণ করিয়া আপনার অন্তঃপুরবাসিনী করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। মন্দোদরী ইহার প্রধানা মহিষী; মন্দোদরী বুদ্ধিমতী হইয়াও পাপাসক্ত স্বামীকে ধর্মপথে আনয়ন করিতে সক্ষম হন নাই। শূর্ণগথা রাবণের ভগিনী তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ভগিনীও ভ্রাতার অমুরুপিনী ছিলেন। এই পাপীয়সী কামপরবশ হইয়া বনবাসী রাম-লক্ষ্মণকে পঞ্চবটীতে প্রার্থনা করিলে, মহামতি লক্ষ্মণ ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। লঙ্কাতে আসিয়া শূর্ণগথাই রাবণকে সীতাহরণে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। পাঠকপাঠিকাগণ এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তৃত-রূপে ইতঃপূর্বেই অবগত আছেন। রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া লঙ্কাতে আনয়ন করিল, এবং জ্যোতির্লুপ্ত পতঙ্গের ভায়, তাঁহার অলৌকিকরূপে একান্ত বিমোহিত হইল। বাস্তবিকই সীতাদেবী অতিশয় রূপবতী ছিলেন। সর্বাদ্বন্দ্বকারী রমণী জগতে দুর্লভ না হইতে পারে, কিন্তু সীতার তুলনা সহজে কোথাও পাওয়া যায় না। সীতা স্বভাবতই দেবতার ভায় সৌন্দর্যশালিনী, তাহাতে আবার যৌবন সীমার অন্তর্ভুক্তিনী। কেবল এই দুইটা গুণের একত্র সমাবেশ হইলেই যে কেহ মুল্লারীশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, কিন্তু সীতার সৌন্দর্য্যে ইহা ব্যতীত আরও কিছু বিদ্যমান ছিল, যদ্বারা তিনি জগতে অতুলনীয় বলিয়া কীর্তিত হইরাছেন। সীতার সৌন্দর্য্যে চাক্ষুস্যের লেশমাত্র ছিল না; দৃষ্টি সরল স্থির ও প্রশান্ত; মুখমণ্ডল

অলৌকিক প্রতিভাপ্রদীপ্ত এবং নয়নযুগল হইতে পবিত্রতা যেন দীপ্তিরূপেই নিরত করিত হইতেছে। সহসা তাঁহাকে দেখিলে মনো-
মধ্যে বিস্ময়সঞ্চিত ভীতির সঞ্চার হইত, বোধ হইত যেন তিনি
স্বাভাবিক তেজে বহ্নির স্থায় প্রদীপ্ত হইতেছেন। সীতার সন্নিকটে
থাকিলে মানবের অসাধুভাব ভাব সকল লজ্জিত হইত, মন পৃথিবীর
স্ফাকারজনক কৰ্দমপূরীষপরিপূর্ণ জঘন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া কোন্
এক দেবরাজ্যে বিচরণ করিত এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও স্তুতিসহকারে
কেবল অর্চনা করিতেই ইচ্ছা হইত। সীতাদেবী অলৌকিক সরলতা
ও পবিত্রতাগুণে সাক্ষাৎ জগন্মাতার স্থায় প্রতীকমান হইতেন, এবং
অতিশয় পাপাশ্রাও তাঁহার সন্নিধানে হৃৎকম্প অনুভব করিত।
ইহাই সীতাদেবীর সৌন্দর্য্যের প্রধান বিশেষত্ব, এবং এই বিশেষত্বই
তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। রাবণ
ভগিনীর মুখে সীতার বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিবার
মানস করিল; কিন্তু সর্বপ্রথমে বৈরনির্যাতনই এই অপহরণের
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাবণ ব্রাহ্মণবেশে পঞ্চবটীর নিরঞ্জন কুটীরে
সীতাকে দর্শন করিবারাজ তাঁহাকে স্নানরীশ্রেষ্ঠ বলিয়া বুদ্ধিতে পারিল।
রাবণের অন্তঃপুরে কতশত সুরূপা রমণী বিদ্যমান আছে, কিন্তু
অলৌকিক সৌন্দর্য্যপ্রভার কেহই সীতার সমতুল্য নহে। নীচাশয়
রাবণ সীতাদেবীকে দেখিয়াই তদাসক্তচিত্ত হইল বটে, কিন্তু সে
প্রবল ও দুর্বৃত্ত হইলেও তাঁহার সন্মুখে হৃদয়মধ্যে কেমন একপ্রকার
ভীতি অনুভব করিল।

(সীতা অবলা নারী; তাঁহাকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী রাবণের সাহসিক
হৃদয় সন্ত্রস্ত হইল কেন?)

রাবণ অবলা সীতাদেবীকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হয় নাই;
ভীত হইলে সে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে সমর্থ হইবে

কেন ? কিন্তু সেই পাপমতি রাক্ষস সীতার অন্তর্নিহিত অলৌকিক পবিত্রতা ও পুণ্যভেদে মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত দেখিয়া সহসা হৃৎকম্প অনুভব করিয়াছিল । পাপ পুণ্যের নিকট সমুচিত হইয়াছিল, অসাধুতা সাধুতার নিকট পরাজয় মানিয়াছিল এবং পাশববল নৈতিক বলের নিকট নিবীৰ্য্য হইয়াছিল ! কিন্তু এই জড়জগতের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে প্রবল পাশবশক্তি দুর্ব্বলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল, সবল অবলাকে আক্রমণ করিল, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিল ! সীতা অপহৃত হইলেন বটে, কিন্তু পাপ কি পুণ্যের উপর জয়লাভ করিতে সমর্থ হইল ? ধর্ম্ম কি অধর্ম্মের নিকট পরাভব মানিল ? কদাচই নহে । রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতে আনয়ন করিয়া কত প্রলোভন দেখাইল, কত ভয় প্রদর্শন করিল ; কিন্তু অবলা অসহায় সীতা শত্রুপুরেই প্রবল রাবণকে তুচ্ছ করিয়া অশ্রুপূর্ণ আরক্তলোচনে দৃষ্টা সিংহীর ভ্রায় গর্জন করিতে করিতে বলিলেন “দেখ, এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে ; তুই বধ বা বন্ধন কর, আমি ইহা আর রক্ষা করিব না এবং জগতে অসতীরূপ অপবাদও রাখিতে পারিব না ; আমি ধর্ম্মশীল রামের পতিব্রতা ধর্ম্মগম্ভী, তুই পাপী হইয়া কখনই আমার স্পর্শ করিতে পারিবি না ।” (৩।৫৬)

পাপ পুণ্যভেদের সন্মুখে একটি পদও অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না !

বাস্তবিক রাবণ অবলা সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লঙ্কাতে আনয়ন করিল বটে, কিন্তু তাহার পাপবাসনা সীতার ধর্ম্মবলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল । ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা অর্থাৎ বাহ্য কিছুতে সাম্রাজ্য নারীর হৃদয় সহসা বিচলিত হইয়া উঠে, রাবণ তৎসমুদয়ই সীতাকে প্রদান করিতে অস্বীকার করিল, কিন্তু তাহাতে সীতার মন প্রলোভিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর ভীষণ

ভাব ধারণ করিতে লাগিল। রাবণ সীতার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া ক্ষুধার্ত সিংহের স্তায় অতিশয় ক্ষুণ্ণিত হইল। সে সীতাকে দেখিয়া অতিশয় বিমুগ্ধ হইয়াছিল; সীতার সহিত অনন্তকাল বাপন করিলেও তাহার বাসনা যেন অভৃষ্ট থাকিবে। রাবণ কতশত রমণীকে বলপূর্বক আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু কেহই সীতার স্তায় প্রতিকুল ছিল না। সীতার অনন্তসাধারণ ঈদৃশ মনোভাব দেখিয়া দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষস বুঝিতে পারিল যে, রাঘববনিতা সামান্য নারী নহেন, পরন্তু তিনি সিংহীর স্তায় তেজোগর্ভিতা ও একান্ত পতিপরায়ণা; সুতরাং তাঁহাকে অনায়াসে বশতাপন্ন করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে রাবণের আশা এই যে, ছলে কৌশলে কালক্রমে তাঁহাকে বণ্যকরিণীর স্তায় বশবর্ত্তিনী করিলেও করা যাইতে পারে।

রাবণ কামমুগ্ধ হইয়াছিল; ইচ্ছা করিলে কি দুর্বৃত্ত রাক্ষস অবলা সীতার উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারিত না?

প্রবল দুর্বলকে নিপীড়িত করিতে পারে ইহা সত্য বটে, কিন্তু পাশবল যে ধর্মবলের নিকট একেবারে সামর্থ্যশূন্য হইয়া যায়, ইহার উদাহরণ জগতে বিরল নহে। প্রবলপরাক্রান্ত দুর্দান্ত নরপতি অসহায় ধর্মবীরের একটা কেশও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; ঘাতকের শানিত ক্রপাণ তাহার কম্পমান ক্ষীণমুষ্টি হইতে খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যায়, এবং কৃতান্তসদৃশ প্রবল উৎপীড়কেরা একটা ক্ষীণপ্রাণ দুর্বল মনুষ্যের চতুর্দিকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান থাকে! জগতে এদৃশ অতি বিচিত্র! সত্য বটে, দুর্বল মনুষ্য কখন কখন প্রবলের অত্যাচারে অভিভূত হয়, রক্তমাংসময় ক্ষণভঙ্গুর দেহ শত্রুর উৎপীড়নে কখন কখন কাতর হইয়া পড়ে, কিন্তু পুণ্যতেজকে সহসা পরাভূত করিতে পারে, জগতে ঈদৃশী কোন শক্তিই বিদ্যমান নাই। তেজস্বী গুরু আপনার বিশ্বাস ও ধর্মরক্ষার নিমিত্ত এই অনিত্য

অসার জীবনকেও তুচ্ছ করেন, উৎপীড়নের অসারতা প্রদর্শনার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক সহাস্তবদনে প্রজ্জলিত হতাশনকেও আলিঙ্গন করেন, এবং ঘাতকের নিষ্কাশিত খড়্গতলে আপনার মস্তক পাতিয়া দিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না ! ধন, মান, ঐশ্বর্য্য এবং জীবনও যদি বিনষ্ট হয় হউক, কিন্তু ধর্ম্ম যাহাতে জয়যুক্ত হন, ধর্ম্মবীর প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করেন । ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখিতে অসমর্থ হইলে, তিনি অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিয়া থাকেন ; যেহেতু ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন এবং সেই অবলম্বন একবার বিনষ্ট হইলে আর এই স্থগিত জীবনধারণের প্রয়োজন কি ? রাবণের পাশবিক শক্তি ধর্ম্মপ্রাণা জানকীর আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট সঙ্কুচিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত দুর্ব্বৃত্ত ইচ্ছা করিলেও ভীতিপ্রযুক্ত তাঁহার উপর বল-প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় নাই । রাবণ যখনই সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া ধনরত্নাদির প্রলোভন এবং কখন কখন ভয়প্রদর্শন দ্বারাও তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পাইত, তখনই সীতাদেবী দম্ভসহকারে তাহার ও আপনার মধ্যে একটি তৃণ ব্যবধান রাখিয়া দিতেন । হুরাওয়া রাবণের এরূপ সাহস ছিল না যে, সে সেই তৃণখণ্ড উল্লম্বন করিয়া সীতার একটি কেশও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় ! ধর্ম্মই সীতাকে রক্ষা করিতেছিলেন, স্মৃতরাং অধর্ম্মের সাধ্য কি যে সে ধর্ম্মরক্ষিতা সীতার অভিমুখে একটিপদও অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় ? ইহা ব্যতীত, রাবণ বৃষ্টিতে পারিয়াছিল যে সীতা বড়ই তেজস্বিনী ; তাঁহার প্রকৃতি সামান্তা নারীর জ্ঞায় নহে । ধর্ম্মকে বিসর্জন করিবার পূর্বে সীতা নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জন করিবেন । সীতা মৃত্যুভয়ে ভীতা নহেন, বরং ঈদৃশী হুরবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেই সর্ব্বদা প্রস্তুত । সীতার এইরূপ মনোভাব বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে যদি রাবণ তাঁহার উপর বলপ্রয়োগ করে তাহা হইলে তিনি

যে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবেন ইহা সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল । সীতাকেই রাজমহিষী করিয়া তৎসহবাসে অনন্তকাল যাপন করা রাবণের হৃদমণীয় অভিলাষ । সীতা মরিলে সে অভিলাষ চরিতার্থ হয় না ; তাই বুদ্ধিমান রাবণ জীবৎ আত্মসংযম করিয়া সীতাকে একবৎসর সময় প্রদান করিলেন । সত্বৎসরের মধ্যে সীতা যদি রাবণের প্রস্তাবে সন্মত না হন, তাহা হইলে রাক্ষসীরা তাঁহাকে রাবণের প্রাতর্ভোজনের জন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া কেলিবে ।

সীতাকে একবৎসর সময় প্রদান করিবার নিগূঢ় উদ্দেশ্য কি ?

রাবণ মনে করিয়াছিল যে পতিপ্রাণা সীতা সদ্য সদ্য স্বামিবিরহিত হইয়া তৎশোকে অতিশয় অভিভূত হইয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই তাহাকে এখন প্রত্যাখ্যান করিতেছেন ; কিন্তু এই শোকোচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি রামকে ক্রমে ক্রমে বিস্থত হইতে আরম্ভ করিবেন । সীতা স্বীয় উদ্ধারের আর কোন আশা না দেখিয়া এবং ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণ কর্তৃক নিয়ত উৎপীড়িত হইয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া, অবশেষে রাবণের বশতা স্বীকার করিবেন ; তাহা হইলেই রাবণের হৃদয়ত বাসনাও পরিতৃপ্ত হইবে । রাবণ কতশত অপহৃতা নারীর সহিত জৈদৃশ সময়পাশে বদ্ধ হইয়া সফলকাম হইয়াছে ; সুতরাং সীতারও সহিত একবৎসর সময় করিয়া সে যে লক্ষ্মনোরথ হইবে না তাহা কে বলিল ? রাবণ পূর্বসংস্থার ও অভিজ্ঞতাবলেই সীতাকে একবৎসর সময় প্রদান করিল । রাবণের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে সীতাদেবীর অধিক বিলম্ব হইল না ; কিন্তু সেই ছুরাকাজ্ঞ রাক্ষস রাঘববনিতাকে চিনিতে পারিল না । সীতা অশোককাননে প্রেরিত হইলেন, এবং কুকুরীপরিবৃত হরিণীর স্তায়, রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন । বিকটাকার নিষ্ঠুর রাক্ষসীরা রাবণের উপদেশানুসারে তাঁহাকে কখনও

বুঝাইয়া, কখনও প্রলোভন দেখাইয়া, এবং কখনও বা ভয় প্রদর্শন করিয়া, লঙ্কেশ্বরের অসাধু প্রস্তাবে সম্মত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার কিছুতেই কৃতকার্য হইল না ।

রাবণ সীতার সহিত সময়পাশে বদ্ধ হইয়াছিল; যাঁহার সহিত সময় করা যায়, সময় অতিক্রান্ত না হইলে তাঁহার সহিত সময়নিবদ্ধ বিষয়ের কোন উল্লেখ বা অবতারণা করা একান্তই নিষিদ্ধ ও নীতিবিগর্হিত । কিন্তু রাবণ হুর্নীতিপরায়ণ; সে স্বার্থসিদ্ধির জন্তই সীতার সহিত সময় করিয়াছিল; পতঙ্গ যেমন বহির্শিখায়, সেইরূপ সে সীতার রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল; সীতালাভচিন্তায় সে নিতান্ত আকুল । নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই রাবণ যদি সীতাকে আপনার ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সুদীর্ঘ সম্বৎসরকাল অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ দুষিত নীতির অনুবর্তী হইয়াই রাবণ অশোককাননেও মন্দভাগিনী জানকীর নিকট মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দারুণ ক্লেশের কারণ হইত । রাবণকে আসিতে দেখিলেই সীতাদেবী আপনার কাষায়বসনদ্বারা কথঞ্চিৎ লজ্জাবরণ পূর্বক সজলনয়নে মৃত্তিকোপরি অবস্থান করিয়া থাকিতেন; রাবণকে পশ্চাৎ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন; রাবণের কোন কথারই উত্তর প্রদান করিতেন না, এবং যখন হুর্স্বভের বাক্যে অতিশয় মৰ্ম্মাহত হইতেন, তখন রোষাক্রমেই সেই রাক্ষসাদমকে অতিশয় তিরস্কার করিতেন । রাবণ সীতার বাক্যে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত; কিন্তু সে সীতার প্রতি অতিশয় আসক্তচিত্ত ছিল বলিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া লইত ।

এইরূপে সীতা রক্ষোগৃহে প্রায় দশমাস কাল অতিবাহিত করিলেন । আর দুইমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে । সীতা পতিবিরহে দিন দিন ক্লশ ও অস্থিচর্খসার হইতেছেন । তাঁহার মুখশ্রী বিলুপ্ত ও অঙ্গ শূলি-

ধুসরিত হইয়াছে; তিনি আহাননিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং দিবারাত্র রামেরই অনুধ্যান করিতেছেন। সীতা কি আর ইহজীবনে রামের দর্শন পাইবেন? রাম কি জীবিত আছেন? হয়ত তিনি সীতা-শোকে অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও হয়ত জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়াছেন। তবে সীতার আর বাঁচিয়া ফল কি? যাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিলে সীতা চতুর্দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেন, সেই প্রাণনাথ আৰ্য্যপুত্রের বিরহে মন্দভাগিনী কিরূপে এতদিন জীবিত আছে? সীতার হৃদয় পাষণময়; সীতা পূর্বজন্মে অবশ্যই অনেক পাপানুষ্ঠান করিয়াছিল; সীতা পাপীয়সী, তাই তাহার মৃত্যু হয় না, তাই তাহার যন্ত্রণারও শেষ নাই! রামচন্দ্র কি সীতার উদ্দেশ্য পাইয়াছেন; তিনি কি সীতার দ্রবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন? রামচন্দ্র মহাবীর; রাম শত্রুকে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহাকে সবংশে ধ্বংস করিতেন। সীতা রাজর্ষি জনকের দুহিতা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, এবং মহাবীর রামচন্দ্রের বনিতা। সীতার ভাগ্যে কি শেষে ইহাই নির্দিষ্ট ছিল? সীতা জাগ্রত আছেন, না স্বপ্ন দেখিতেছেন? সীতার জীবন কি স্বপ্নময়? সীতার কি বুদ্ধিব্রংশ ঘটিয়াছে? সীতা কি উন্মাদিনী? সীতা জীবিত আছে না মরিয়াছে? সীতা এখন কোথায়? লঙ্কাপুরীতে তাহাকে কে আনিল? দুর্বৃত্ত রাবণ স্বামীর ক্রোড় হইতে সীতাকে আচ্ছিন্ন করিল কেন? সীতা রাবণের কি অপরাধ করিয়াছেন? সীতার জীবনে আর কোন সুখ নাই; সীতার পক্ষে মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু মৃত্যু হয় কই? সীতা তবে আত্মহত্যা করিবে। আত্মহত্যা না মহাপাপ? মহাপাপ হউক, অমূল্য সতীত্বরত্ন বিনষ্ট হওয়া অপেক্ষা সীতার আত্মহত্যা করা ভাল। কিন্তু উপায় কই? হরস্ত চেড়ীগণ তাহাকে সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে; সীতার মরিবার অবকাশ কই? হায়, সীতার মরিবারও অবসর নাই! সীতা এসংসারে

বড়ই মন্দভাগিনী। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সীতা রাবণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায় না দেখিয়া কখন কখন কাতরভাবে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেন, কখনও উন্মাদিনীর ন্যায় লক্ষিতা হইতেন, এবং কখনও বা বিবাদে নীরব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। ইহার উপর চেড়ীগণ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিত এবং পামর রাবণও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার সুকোমল মনকে সন্তপ্ত করিত। সীতার প্রাণ বড়ই কঠিন, তাই এত যন্ত্রণাতেও তাহা বিনষ্ট হইল না।

একদিন নিশাবসানকালে সীতাদেবী ধূলিধূসরিতদেহে হুশিস্তার নিদ্রাশূন্ত হইয়া ভূমিতলে উপবিষ্ট আছেন, এবং চেড়ীগণ সাবধানে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছে, এমন সময়ে পক্ষিগণের আকস্মিক কলরবে সেই অশোক কানন পারিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রজনী প্রভাত হইলে, পক্ষিগণ প্রতিদিন যেরূপ মঙ্গলময় আনন্দকোলাহল করিয়া থাকে, ইহা তাদৃশ কোলাহল বলিয়া বোধ হইল না। কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্বক লক্ষ্য করিলে, যে কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিত যে বিহঙ্গমকুল কোনও কারণে সজ্ঞাসিত হইয়া অসময়ে জাগরিত হইয়াছে। যাহাহউক, সীতাদেবী অথবা চেড়ীগণের মধ্যে কেহই এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি লক্ষ্য করিল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন পত্রবহুল পরস্পর-সংশ্লিষ্ট বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া একটা অদ্ভুত জীব নিঃশব্দপদসঞ্চারে যেদিকে সীতা অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। পক্ষিসকল সেই অদ্ভুতজীবদর্শনে সজ্ঞস্ত হইয়াই কুলার পরিত্যাগ পূর্বক ভীতম্বরে চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ উড়ডীন হইতেছিল। যাহাহউক, সেই অদ্ভুত জীব ক্রমে ক্রমে একটা শাখা-পল্লববহুল উন্নত শিশিপাবৃক্ষের সমীপবর্তী হইয়া তত্ক্ষণি আরোহণ করিল, এবং সেই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। সীতাদেবীর প্রতি অনিমেষলোচনে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

এই অদ্ভুত জীব কে, তাহা প্রশ্ন করিবার পূর্বেই পাঠকপাঠিকাগণ নিঃসন্দেহই তাঁহাকে চিনিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইনি সেই প্রভুভক্ত মহাবীর পবনকুমার। এই মহাবীর স্বতেজে সাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কাতে উপস্থিত হইয়া নিশাযোগে পুরীমধ্যে সীতাস্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ছদ্মবেশে রাবণের প্রাসাদের সর্ব্বস্থলেই অনুসন্ধান করিলেন; লঙ্কেশ্বরের অন্তঃপুরে নিদ্রামগ্না সুবেশা সুরূপা কতশত রমণী দেখিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহাকেও সীতা বলিয়া চিনিতে সমর্থ হইলেন না। রাঘবপত্নী বিলাসিনীর ত্রায় নিশ্চিন্তমনে রাবণগৃহে নিদ্রা যাইবেন কেন? রামময়প্রাণা জানকী পতিশোকে নিশ্চয়ই ক্লশা হইয়া দীনার ত্রায় কোথাও অবস্থান করিতেছেন। হনুমান মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া বিরহবিধুরা শোকমলিনা সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাদৃশলক্ষণাক্রান্তা একটী রমণীরও দর্শন না পাইয়া অতিশয় হতাশ হইতে লাগিলেন। তবে কি হনুমানের সাগরলঙ্ঘন-শ্রম ব্যর্থ হইল? সীতা কি এতদিন রামের শোকে প্রণত্যাগ করিয়াছেন? হনুমান সীতার অনুসন্ধান না করিয়া কোন্ মুখে কিঙ্কিঙ্কার প্রত্যাগমন করিবেন? রাম সীতা ব্যতিরেকে নিশ্চয়ই অধিকদিন জীবিত থাকিবেন না। রাম মরিলে, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবও তাঁহার পথানুসরণ করিবেন। হনুমানের তবে আর বাঁচিয়া ফল কি? হনুমান স্বদেশে আর প্রত্যাগমন করিবেন না; তিনি লঙ্কার মধ্যেই কোনও নির্জন স্থানে তপস্যা করিয়া দেহ বিসর্জন করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মহাবীর হনুমান হুঃখিতচিত্তে এক প্রাচীরোপরি উপবিষ্ট হইলেন। সেখান হইতে অনতিদূরে এক নিবিড় কানন অবলোকন করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বিহঙ্গম সকলকে সন্ধানিত করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতে করিতে এক শিশুপা বৃক্ষমূলে একটী রমণীকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তখন হনুমান সোঃস্বকচিত্তে সকলের

অজ্ঞাতসারে সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সেই নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ।

হনুমান দেখিলেন “ঐ নারী রাক্ষসীগণে পরিবৃত ; উপবাসে যার পর নাই ক্লশ ও দীন । তিনি পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ হৃৎখনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন । তিনি গুরুপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ত্রায় নির্মল ; তাঁহার কাস্তি ধুমজালজড়িত অগ্নিশিখার ত্রায় উজ্জল ; সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কার-শূন্য ও মললিপ্ত । পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিনবস্ত্র । তাঁহার হৃৎখসস্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে ; শোকভরে যেন কাহাকে নিরন্তর হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিতেছেন । তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহই নাই, কেবলই রাক্ষসী ; তৎকালে তিনি যুথলষ্ট কুকুরপরিবৃত কুরঙ্গীর ত্রায় দৃষ্ট হইতেছেন । তাঁহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ত্রায় একমাত্র বেণী লম্বিত । * * * তিনি ব্রতপরায়ণা তাপসীর ত্রায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং সন্দেহাত্মক স্মৃতির ত্রায়, পতিত সমৃদ্ধির ত্রায়, স্থলিত শ্রদ্ধার ত্রায়, নিকাম আশার ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায় ও অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্ত্তির ন্যায় যারপর নাই শোচনীয় হইয়া বিরাজ করিতেছেন ।” (৫১১৫)

হনুমান এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া ইহাঁকেই রাঘববনিভা সীতাদেবী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন । রামচন্দ্র সীতার যে যে লক্ষণ ও বসন ভূষণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, হনুমান তৎসমুদয়ই মিলাইয়া দেখিলেন । জানকী সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহই রহিল না । সীতার অলৌকিক পতিপ্রেম ও তত্ত্ববাৎসল্যের কথা শ্রবণ করিয়া হনুমানের নয়নযুগল হইতে অবিরলধারায় অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল । তিনি আরও চিন্তা করিলেন “জানকী রামলক্ষ্মণের বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই বোধ হয় বর্ষার প্রাদুর্ভাবে জাহ্নবীর

ন্যায়, স্থির ও গভীর ভাবে কালযাপন করিতেছেন। ইহার আভিজাত্য কুলশীল ও বয়স রামেরই অনুরূপ ; সুতরাং ইহারা যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ইহা উচিতই হইতেছে।” (৫।১৬) হনুমান প্রচুর থাকিয়া ভীমদর্শন রাক্ষসীগণকে দেখিতে লাগিলেন এবং সীতার বিবাদমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

মহাবীর হনুমান সকলের অলক্ষিত হইয়া সেই দিবস সেই অশোককাননেই যাপন করিলেন এবং সীতার সহিত কিরূপে কথোপকথন করিবেন তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। আবার রজনী সমাগত হইল। ধবলজ্যোতি কুমুদবান্ধব নির্মল নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, শস্ত্রশ্রামল ক্ষেত্র, সুধা-ধবলিত প্রাসাদ ও যাবতীয় পদার্থোপরি শুভ্র জ্যোৎস্নাজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পদার্থনিচয় জ্যোৎস্নান্নাত হইয়া এক অপূর্ণ শোভা ধারণ করিল। অদূরে পৌরবর্গের আনন্দকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আর সীতাদেবী রাক্ষসীগণে পরিবৃত্ত হইয়া হুঃখিত মনে সেই অশোক কাননেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমান সেই শিংশপা বৃক্ষের নিবিড় শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া সেই নিশাও অতিবাহিত করিলেন। শরীরী অন্নমাত্র অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিয়া উঠিল। চতুর্দিক্ হইতে মঙ্গল বাদ্য ও সুললিত গীতধ্বনি উদ্ভিত হইল, বোধ হইল যেন ধরণীর মৃতদেহে ধীরে ধীরে জীবন সঞ্চার হইতেছে ! হনুমান চিন্তাকুলমনে সেই শিংশপা বৃক্ষের চূড়ে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সহসা ভুমূল ভূষণরব তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি বিস্মিতমনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাশেবে সীতার দর্শনাভিলাষে বহুসংখ্য রূপবতী রমণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অশোক কাননে সমুপস্থিত !

জ্ঞানকী মহালীর রাবণকে দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং উরুযুগলে উদর ও করদ্বয়ে স্তনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্বক জলধারা-কুললোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন । তিনি একান্ত দীন ও শোকে বার পর নাই কাতর ; রাবণের মূহ্যকামনাই তাঁহার এক মাত্র ব্রত । শোক তাপে তাঁহার শরীর শুষ্ক ও ক্লশ ; তিনি নিয়তই ধ্যানে নিমগ্ন এবং একাকিনী অনবরত রোদন করিতেছেন । রাবণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত হইল । তিনি সজলনয়নে অসহায়ার স্তন চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ।

রাবণ জ্ঞানকীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মধুরবচনে নানারূপ প্রলোভন প্রদর্শন পূর্বক কহিতে লাগিল “জ্ঞানকি, তুমি আমাকে দেখিবামাত্র সঙ্কুচিত হইতে ছ কেন ? আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর । তুমি অনিচ্ছুক, এই জন্ত আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না । দেবি, আমি হইতে কদাচ তোমার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিবে না, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছু মাত্র ভীত হইও না । একবেণীধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, মলিন বস্ত্র পরিধান ও ধ্যান তোমার সঙ্গত হইতেছে না । তুমি আমার প্রতি অমুরক্ত হইয়া ভোগসুখে আসক্ত হও । তুমি বুদ্ধিমোহ দূর কর । আমার অন্তঃপুরে অনেকানেক সুরূপা রমণী আছে, তুমি তাহাদের অধীশ্বরী হইয়া থাক । আমি স্ববিক্রমে যে সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমুদয় এবং সমগ্র রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি ; তোমার প্রীতির জন্ত এই গ্রামনগরপরিপূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়া তোমার পিতাকে রাজা করিতেছি ; তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া থাক । আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠে, জিভুবনে এমন আর কেহই নাই । দেবি, রাম তপস্ভা, বল, বিক্রম ও ধনে আমার তুল্য নয় এবং তাহার বশও আমার সদৃশ হইবে না । অতএব তুমি সমুদ্রতীর-

বস্ত্রী সুরমা কাননে আমার সহিত বাস করিতে সম্মত হও ।

(৫।২০)

উগ্রস্বভাব রাবণের ঈদৃশ অপমানস্থচক ঘৃণিত বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠেঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । রামচিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরুক রহিয়াছে ; তিনি একটি তৃণ ব্যবধান রাখিয়া রাবণকে কাতরকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন “রাক্ষসাদিনাথ, তুমি আমায় অভিলাষ করিও না, স্বভার্য্যায় অনুরক্ত হও ; পাণাস্বার পক্ষে মুক্তিপদার্থের জ্ঞায় তুমি আমাকে সুলভ বোধ করিও না ।” বলিতে বলিতে জানকীর মনে দারুণ ঘৃণা উপস্থিত হইল ; তিনি সহসা ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । তিনি রাবণকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন এবং পরুষবাক্যে কহিতে লাগিলেন “দেখ, আমি অস্ত্রের সহধর্ম্মিণী ও সাধ্বী, তুই আমাকে সামান্তা ভোগ্যা জ্ঞী বোধ করিস্ না । ধর্ম্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর এবং সংব্রত-চারী হ । রাক্ষস, নিজের জ্ঞায় পরের জ্ঞীকেও রক্ষা করা উচিত । যখন তোমার বুদ্ধি এইরূপ বিপরীত ও ভ্রষ্ট, তখন বোধ হয় এই মহানগরীতে কোন সজ্জন নাই, থাকিলেও তুই তাঁহাদিগের কোনরূপ সংশ্রব রাখিস্ না । রাবণ, প্রভা যেমন সূর্য্যের, আমিও সেইরূপ রামের ; স্মৃত্যং তুই আমাকে ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি না । তুই এক্ষণে এই ছুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দে । যদি লঙ্কার শ্রী রক্ষার ইচ্ছা থাকে, যদি স্ববংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর । দেখ, তুই যদি আমাকে লইয়া তাঁহার হস্তে দিস্, তবেই তোমার মঙ্গল, নচেৎ ঘোর বিপদ । সেই লোকাধিপতি রামের হস্তে কিছুতেই তোমার নিস্তার নাই । তুই অচিরাৎ বহ্নিনির্ঘোষের জ্ঞায় রামের ভীষণ ধনুঃধার শুনিতে পাইবি; অচিরাৎ তাঁহার নামাঙ্কিত শরজাল, জলন্ত

উরগের স্ত্রায়, মহাবেগে এই লঙ্কায় আসিয়া পড়িবে এবং অচিরে তুই সবাক্ষবে বিনষ্ট হইবি। সেই নরবীর, ভ্রাতার সহিত, মৃগগ্রহণার্থ অরণ্যে গিয়াছিলেন, তুই কাপুরুষের স্ত্রায় তাঁহার শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপহরণ করিয়াছিস্ ; এই কার্য্য অত্যন্ত ঘৃণিত। যখন রামের সহিত তোর বৈরপ্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন তোর সহায়সম্পদ অকিঞ্চিৎকর হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে, তুই কৈলাসেই যা আর পাতালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার নাই।” (৫।২১)

জানকীর এই বাক্যে রাবণ অতিশয় কুপিত হইল ; কিন্তু হর্ষভ্রাম্যে কামমোহে অভিভূত হইয়া সীতার প্রতি রোষ প্রদর্শন করিতে পারিল না। রাবণ বলিল “জানকি, পুরুষ স্ত্রীলোককে যেরূপ সমাদর করে, সে সেই পরিমাণে তাহার প্রিয়পাত্র হয় ; কিন্তু আমি তোমাকে যতটুকু সমাদর করিয়াছি, তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিয়াছ। যেমন স্ননিপুণ সারথি বিপথগামী অশ্বকে নিরোধ করিয়া রাখে, সেই রূপ এক আসক্তিই তোমার প্রতি সমস্ত ক্রোধ একেবারে বিনষ্ট করিতেছে। সুন্দরি, তুমি আমার উপর অকারণ বীতরাগ হইয়াছ। তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্তু উৎকট আসক্তিই আমাকে এই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছে। তুমি যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ড প্রদান করা কর্তব্য।” (৫।২২)

এই কথা বলিতে বলিতে রাবণ রোষাবিষ্ট হইল। সীতা রাবণকে তাহার পত্নীগণসমক্ষেই যথেষ্ট অবমানিত করিয়াছেন ; তাই হর্ষভ্রাম্যে রোষাক্রমে পুনর্বার কহিতে লাগিল “দেখ, আমি আমার কথাপ্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব ; কিন্তু ইহার পরেই তোমাকে আমার পর্য্যঙ্কোপরি আরোহণ করিতে হইবে। যদি এই নির্দিষ্ট কালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিনী না হও,

তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে নিশ্চয়ই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।” (৫।২২)

জানকী ভীত হইলেন না। তিনি পাতিব্রত্যাভেজে ও পতির বীর্য্যগর্বে কহিতে লাগিলেন “নীচ, এই নগরীর মধ্যে তোর শুভা-
কাজ্জকী কেহই বিদ্যমান নাই। আমি ধর্ম্মশীল রামের ধর্ম্মপত্নী, তুই
ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই আমাকে মনেও কামনা করিতে পারে
না। পামর, তুই এক্ষণে আমার যে সকল পাপকথা কহিলি, বল
কোথায় গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবি? * * * তুই আমাকে
কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস, তোর ঐ বিকৃত ত্রুর চক্ষু ভূতলে কেন স্থলিত
হইল না? আমি রামের ধর্ম্মপত্নী এবং রাজ্য দশরথের পুত্রবধু,
আমাকে অব্যাচ্য কহিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইল না? দেখ,
তুই আমাকে হরণ ও গোপন করিয়া কদাচই রাখিতে পারিবি না;
যতদূর করিয়াছিস, তোর মৃত্যুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে।” (৫।২২)

রাবণ আর সহ্য করিতে পারিল না। হুরায়া ক্রোধে ভীষণ মূর্ত্তি
ধারণ করিল। সকলে সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত হইল। রাবণকে
সীতার বধসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া ধান্যামালিনী নাম্নী তাহার এক
পত্নী মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তাহাকে জীবধরূপ ঘৃণিত কার্য্য হইতে বিরত
করিল এবং বচনচাতুর্য্যে স্বামীর মন প্রীত করিয়া তাহাকে অন্যত্র
লইয়া গেল। রাবণ পত্নীগণের সহিত সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার
পূর্বে, সীতার বশীকরণ সম্বন্ধে চেড়ীগণকে নানা প্রকার উপদেশ
প্রদান করিল। রাবণ প্রস্থান করিলে, হুরস্ত রাক্ষসীরা জানকীকে
নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিতে লাগিল; কেহ সাঙ্ঘন্যবাক্যে,
কেহ প্রলোভন প্রদর্শন দ্বারা, কেহ রাবণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া, এবং
কেহ কেহ বা ভয়প্রদর্শন ও কটুবাণ্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সীতাকে
বশীভূত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সীতাদেবী তাহাদের বাক্যে

কর্ণপাত করিলেন না, এবং তাহাদের ভয়প্রদর্শনেও কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। জানকী তাঁহার জীবন রক্ষার নিমিত্ত আর যত্নবতী নহেন; রাক্ষসীরা তাঁহাকে বধ বা ভক্ষণ করুক, সীতা কিছুতেই তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না।

সীতা আর কাহারও ভয়ে ভীত নহেন। তিনি রাক্ষসীগণের সম্মুখেই লঙ্কার প্রতি অভিশাপ প্রদান ও রাবণের প্রতি বথেষ্ট তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসীরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কেহ কেহ রাবণের নিকট গমন করিল, কেহ কেহ বা সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিল। সীতা শোকে বিহ্বল হইয়া শিশুপা বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুষ্পত শাখা অবলম্বন পূর্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে আপনার শোচনীয় দশা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর হুই মাসকাল মাত্র অবশিষ্ট আছে; রাবণ হুই মাস কাল পরেই সীতার বিনাশ সাধন করিবে। হুরাঙ্গী সীতাকে নানা প্রকারে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। সীতার জীবন বড় হুঃখময় হইয়াছে। রাম নিশ্চয়ই সীতার অবস্থা পরিজ্ঞাত নহেন, অথবা তিনি সীতাকে চিরকালের জন্য মনোরাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়াছেন; সুতরাং সীতার উদ্ধারের আর কোন আশা নাই। সীতা রামের বনিতা; সীতা রাক্ষসহস্তে অবমানিত ও উৎপীড়িত হইতেছেন। রামের দর্শনলাভের আশাতেই সীতা এতাবৎকাল জীবনধারণ করিতেছিলেন; কিন্তু সে আশা এখন সুদূরপরাহত। সীতার মৃত্যু বুঝি সন্নিকট হইয়াছে; তবে মৃত্যুই হউক। অমূল্য সতীত্বরত্ন বিনষ্ট হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শতগুণে শ্রেষ্ঠতর। রাক্ষসহস্তে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা আত্মহত্যাই সীতার পক্ষে মঙ্গলজনক। আত্মহত্যা মহাপাপ বটে; কিন্তু যেখানে সতীত্বরত্ন হারাইবার আশঙ্কা, সেখানে আত্মহত্যাই মুক্তির একমাত্র উপায়। সীতা তবে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। সীতা জীবনে যে এত কষ্টভোগ করিলেন, তজ্জন্ত

তিনি দুঃখিত নহেন; তাঁহার দুঃখ এই যে, মৃত্যুকালে তিনি একবার স্বামীর চরণযুগল দর্শন করিতে পাইলেন না। ঐহিক জন্ম তিনি এত অপমান ও যন্ত্রণা সহ করিয়াও কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া রহিলেন, হায় মৃত্যুকালে তাঁহাকে একবার দর্শন করা সীতার ভাগ্যে ঘটিল না! সীতার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। সহসা সীতার মনে পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইল; তাঁহার শুভ্র গওস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল। স্বামী, জনক, জননী, স্বশ্রু ও অন্যান্য গুরুজনকে তিনি উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, এবং সুস্থিরচিত্ত হইয়া আত্মহত্যাসাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সীতা অনেক চিন্তা করিয়াও কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইলেন না। সীতার নিমিত্ত জগতে একখণ্ড রজ্জুও বিদ্যমান নাই! সীতার ত্রায় মন্দভাগিনী আর কে আছে? সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল; সীতার নিমিত্ত একখণ্ড রজ্জু নাই বটে, কিন্তু তাঁহার পৃষ্ঠলব্ধিত সুদীর্ঘ বেণী আছে। পাতিব্রতাই একবেণীধারণের উদ্দেশ্য; সেই বেণীই আজ সীতার পাতিব্রত রক্ষা করিবে; সীতাদেবী আপনার বেণীর সাহায্যেই আজ অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিবেন! এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং শোকাকুলমনে রাম লক্ষ্মণ ও আত্মকুল স্মরণ করিতে করিতে আত্মহত্যাসাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সহাবীর হনুমান অশোককাননে রাবণের আগমন অবধি সীতার আত্মহত্যার নিমিত্ত এই ভীষণ সঙ্কল্প পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই প্রচ্ছন্নভাবে অবলোকন করিতেছিলেন। সীতার পাতিব্রতাত্যেজদর্শনে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল এবং সীতার দুঃখে তাঁহার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। জানকীকে আত্মহত্যা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। সীতা প্রাণত্যাগ করিলে হনুমানের সাগরলঙ্ঘন

প্রভৃতি কষ্টসাধ্য কর্মসকল একেবারে বিফল হইবে, এবং রামলক্ষ্মণ ও সুগ্ৰীব প্রভৃতি বানরকুল দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হইবেন। সীতার সহিত অনতিবিলম্বে কোনও প্রকারে একবার সাক্ষাৎ করা নিতান্তই আবশ্যক হইতেছে, তাহা না করিলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু হনুমান যে রামের চর সে বিষয়ে তিনি জানকীর প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন কিরূপে? সীতা হনুমানকে কোন মায়াবী রাক্ষস মনে করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু তাহা হইলে হনুমানের কার্য্যসিদ্ধিপথে বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। মনে মনে এইরূপ নানা প্রকার বিতর্ক করিয়া হনুমান সীতার সহিত সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করিতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের শ্রায় সংস্কৃত কথা কহিলে পাছে সীতা তাঁহাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া ভীত হন, এই আশঙ্কায় তিনি সীতার সহিত অর্থসঙ্গত মানুষী বাক্যেই আলাপ করিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ অবধারণ পূর্বক হনুমান সীতার নিকটস্থ হইয়া মৃদু মধুরবাক্যে তাঁহার ও রামের পূর্ববৃত্তান্ত কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্তই রামচন্দ্রের নিয়োগে দ্রুতর সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করিলেন।

মর্ত্যুকামা দেবী জানকী সহসা এই সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অলকসঙ্কুল মুখকমল উত্তোলন পূর্বক উজ্জ্বলদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রামের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে যারপরনাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে সভয়ে দেখিলেন যে, ভীমকায় বিকটাকার এক বানর শুভ্রবসন পরিধান পূর্বক বৃক্ষশাখায় আরুঢ় রহিয়াছে! সীতাদেবী হনুমানকে কোন মায়াবী রাক্ষস মনে করিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং ভয়হৃৎকন্ডরে অক্ষুট চীৎকার করিয়া চমকিত হইলেন। তদদর্শনে

হনুমান সীতার সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সীতাদেবী তাঁহার কথায় সহজে প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারিলেন না । তখন মহাবীর পবনকুমার সীতার মনে বিশ্বাস সমুৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহার হরণ অবধি নিজের সাগরলঙ্ঘন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করিলেন এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের আকারপ্রকারও বর্ণিত করিতে লাগিলেন । সীতাদেবী হনুমানের বাক্যে আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; তিনি তাঁহার নিকট রামলক্ষ্মণের কুশলসংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । অনন্তর জানকী আত্মসংঘম করিয়া হনুমানের নিকট রামলক্ষ্মণ সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজ ছুরবস্ত্রার সমগ্র দুঃখময় ইতিহাস কীর্তন করিলেন এবং রামলক্ষ্মণ যে অনাথিনীকে ভুলিয়া আছেন ও তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত এতকাল বিলম্ব করিতেছেন, ইহা চিন্তা করিয়া অজস্র বাষ্পবারি বিমোচন করিলেন । আর দুইমাস কালমাত্র অবশিষ্ট আছে ; যদি ইহার মধ্যেই সীতার উদ্ধার না হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন । সীতার বিলাপশ্রবণে হনুমান তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার সমুদ্ধারার্থ ও পাপাত্মা রাবণের দণ্ডবিধানার্থ যে যুদ্ধোদ্যম হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিলেন, এবং তৎবিরহে রামও যে কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিলেন । সীতাদেবী প্রিয়তমের কষ্টের কথা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর হনুমান সীতার হস্তে রামপ্রদত্ত একটী স্বর্ণাঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন ; ঐ অঙ্গুরীয়কে রামনাম অঙ্কিত ছিল ; সীতা তাহা দেখিবামাত্রই রামের বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং সাদরে তাহা গ্রহণপূর্বক অবিতৃপ্তলোচনে পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন । সীতাকে যারপরনাই কাতর দেখিয়া মহাবল হনুমান তাঁহাকে স্বপৃষ্ঠেই আরোপণ পূর্বক রামসন্নিধানে লইয়া বাইতে ইচ্ছা

প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু সীতাদেবী তাহাতে সন্মত হইলেন না। সীতা ভীকৃষ্ণভাবা নারী ; হনুমানের সাগরলঙ্ঘনের সময় হরত তিনি তাঁহার পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া সাগরগর্ভে নিপতিত হইতে পারেন ; অথবা রাক্ষসগণ হনুমানকে সীতাসহ পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। রাক্ষসগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধারম্ভ হইলে, সীতার রক্ষণার্থ হনুমানকে অতিশয় ব্যস্ত হইতে হইবে, এবং তদবস্থায় যুদ্ধে জয়লাভ করাও তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুষ্কর কার্য্য হইয়া উঠিবে ; অথবা সীতাদেবীই পুনর্বার রাক্ষসকবলে পতিত হইতে পারেন ; তাহা হইলে বিষম অনর্থও ঘটবার সম্ভাবনা। ইহা ব্যতীত হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করা সম্বন্ধে সীতার প্রধান আপত্তি এই যে, তিনি কদাচ পরপুরুষ স্পর্শ করেন না। এই নিमित্তই তিনি বলিলেন “বীর, আমি পতিভাক্তর অনুরোধে রাম ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক নহি। হুরায়া রাবণ বলপূর্ব্বক আমাকে তাহার অঙ্গস্পর্শ করাইয়াছিল, কিন্তু আমি কি করিব ? তৎকালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা ছিলাম। এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যান, তবেই তাঁহার উচিত কার্য্য করা হইবে।” (৫।৩৭) হনুমান সীতার ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় হ্রষ্ট হইলেন এবং এই বাক্য যে মহাত্মা রামের সহধর্ম্মিণীরই উপযুক্ত, তাহা নির্দেশ করিয়া সীতার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুক্ষণ কথোপকথনের পর হনুমান সীতাদেবীকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন, এবং রামের প্রত্যয়সমুৎপাদনার্থ তাঁহার নিকট কোন অভিজ্ঞান যাত্রা করিলেন। সীতাদেবী তাঁহাদের বনবাস সময়ে সংঘটিত কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া পিতৃগৃহে বিবাহকালে জনকপ্রদত্ত এক উৎকৃষ্ট চূড়ামণি আপনার মস্তক হইতে

উন্মোচন পূর্বক তাহা হনুমানের হস্তে প্রদান করিলেন এবং তৎকালে ইহাও বলিলেন “দূত, এই অভিজ্ঞান রামের অবিজ্ঞাত নহে ; তিনি ইহা দেখিবামাত্র আমাকে, আমার জননীকে ও রাজা দশরথকে স্মরণ করিবেন।” হনুমান সেই অভিজ্ঞানচূড়ামণি গ্রহণ পূর্বক সযত্নে তাহা রক্ষা করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনা সীতাদেবীকে সাস্থনা ও ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ।

হনুমান অশোককাননে বিচরণ করিতে করিতে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মা পরিত্যাগ করিবার পূর্বে একবার রাবণের বলাবল পরীক্ষা করিয়া যাইতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল । তদুদ্দেশ্যে তিনি সেই মনোহর অশোককাননকে ভগ্ন ও হতশ্রী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । রাক্ষসেরা তাঁহার ভীমমূর্তি দর্শন করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল । মুহূর্ত্তমধ্যে এই ভয়ঙ্কর উৎপাতসংবাদ রাবণের কর্ণগোচর হইল । রাবণ বানরকে ধৃত বা নিহত করিতে অনুচরগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিল । তৎক্ষণাৎ তাহারা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া হনুমানের সহিত অশোককাননে যুদ্ধ আরম্ভ করিল । হনুমান তাহাদের শরজাল নিবারণ করিয়া অক্লেশেই তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন । রাবণ বানরের দুঃসাহস দর্শনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তৎবিক্রমে প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু তাহারাও তৎকর্তৃক বমসদনে প্রেরিত হইল । অনন্তর যুদ্ধ-বিশারদ রাবণকুমার অক্ষ রোষভরে হনুমানের বিক্রমে ধাবমান হইল ; হনুমান তাহার শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অতিশয় ক্লিষ্ট হইলেন । ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিয়ৎক্ষণ জয়পরাজয় কিছুই স্থিরীকৃত হইল না ; পরিশেষে মহাবীর পবনকুমার তাহাকেও অনুচরবর্গের সহিত সংহার করিলেন এবং এক প্রাচীরোপরি উপবিষ্ট হইয়া মুহুমুহুঃ

সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কুমার অক্ষের বধসংবাদ শ্রবণে রাবণ রোষে চিন্তাগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে তৎক্ষণাৎ বানরবধে প্রেরণ করিল। হনুমান ইন্দ্রজিৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পাশবদ্ধ হইলেন এবং চরস্ত রাক্ষসগণকর্তৃক নানাপ্রকারে তাড়িত হইয়া আপনাকে রাবণ-সমীপে সমানীত হইতে দিলেন। রাবণের সহিত একবার সাক্ষাৎকার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাবণ হনুমানকে দেখিবামাত্র তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। হনুমান নির্ভীকচিত্তে রাবণকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া লঙ্কায় তাঁহার আগমনকারণ যথাযথ বর্ণনা করিলেন, এবং রামের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া সীতাদেবীকে অনতিবিলম্বে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। রাবণ হনুমানের বাক্যে অতিশয় কুপিত হইল। হনুমান কিছুতেই ভীত হইবার পাত্র নহেন; তিনিও রাবণের পাপাচারের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাকে সভামধ্যেই তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমানের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিল; কিন্তু মহামতি বিভীষণ রাক্ষসরাজের ক্রোধ প্রশমিত করিয়া দূতের অবধ্যতা প্রতিপাদন করিলেন, এবং হনুমানকে কোনওরূপে বিকৃতান্দ করিয়া লঙ্কা হইতে দূরীভূত করিতে পরামর্শ দিলেন। রাবণ তদনুসারে হনুমানের পুচ্ছ দগ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিল। মহাবীর হনুমানের সুদীর্ঘ পুচ্ছটি তৈলসিক্ত ছিন্নবস্ত্রে সংবৃত হইলে, রাক্ষসেরা তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবামাত্র, হনুমান এক-লক্ষ গৃহচূড়ে আরোহণ করিয়া তাহাতে সেই অগ্নি প্রদান করিলেন এবং ক্ষিপ্ৰতাসহকারে গৃহ হইতে গৃহান্তরে লক্ষ প্রদান পূর্বক মুহূর্ত-মধ্যে সেই সুশোভনা লঙ্কাপুরীকে অগ্নিমালায় সুসজ্জিত করিলেন। আনন্দনিমগ্না সেই মহানগরী অবিলম্বে হাহাকাণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া গেল

এবং ক্ষণকালমধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া শ্মশানতুলা ভীষণ আকার ধারণ করিল ।

মহাবীর হনুমান এইরূপ মহোৎসাহে লক্ষা দগ্ধ করিয়া সীতার নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহাকে অশোক-কাননে নিরাপদ দেখিয়া জট হইলেন ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক অনতিবিলম্বে পুনর্ব্বার সাগর লঙ্ঘন করিলেন । অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ দূর হইতে মহাবীর পবনকুমারের হুকার শব্দ শ্রবণ পূর্বক কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে আর সন্দেহ করিলেন না । হনুমান তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবামাত্র প্রধান প্রধান বানরগণ তাঁহার মুখে আত্মপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া উল্লাসে নিমগ্ন হইলেন, এবং হর্ষব্যাঞ্জক সিংহনাদ ও কিলকিলা-শব্দে দিম্বাঙল পরিপূর্ণ করিলেন । বানরগণ আনন্দে বাহুজ্ঞানশূন্ত হইয়া নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকে নিমগ্ন হইল এবং মহারাজ স্ত্রীবের সুরক্ষিত এক মধুবনে প্রবেশ পূর্বক তথায় যথেষ্ট মধুপান করিতে লাগিল ।

এদিকে হনুমান ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণের প্রত্যাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্ত্রীবে তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন না । যথাসময়ে তাঁহারা কাননশোভিত প্রস্রবণশৈলে উপনীত হইলে, মহাবীর পবনকুমার সোৎকণ্ঠ রামলক্ষণ ও স্ত্রীবের সম্বন্ধে সীতাসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন । সাগরলঙ্ঘন অবধি সীতাদর্শন ও লক্ষাদাহন পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন । সীতার দীনদশা, সীতার একান্ত পতিপরায়ণতা, রাবণের সহিত সীতার ব্যবহার, রাবণের উৎপীড়ন, সীতার বস্ত্রণা, সীতার সহিত রাবণের সময়, রামলক্ষণের ওদাসীনে সীতার বিলাপ, প্রাণবিসর্জ্জনে সীতার স্কন্ধ ইত্যাদি সমস্ত কথাই তিনি রানের নিকট বিবৃত করিলেন ।

রাম তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন। অনন্তর হনুমান সীতাশ্রদত্ত অভিজ্ঞানচূড়ামণি রামহস্তে অর্পণ করিবামাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা চিনিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে আবেগপূর্ণ-হৃদয়ে বক্ষঃস্থলে তাহা বারম্বার স্থাপন করিতে লাগিলেন, এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

অত্যল্পকালমধ্যে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইল। অগণিত বানরসৈন্য নভোমণ্ডলে ধূলিজাল উড়ান করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দিনমধ্যে রামচন্দ্র সসৈন্তে সাগরোপকূলে উপস্থিত হইলেন এবং সাগর সমুদ্রীর্ণ হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বানরগণের মধ্যে কেবল মহাবীর হনুমানই সাগরলঙ্ঘনে সক্ষম ; কিন্তু এই অসংখ্য বানর লইয়া রামচন্দ্র কিরূপে লঙ্কায় উপনীত হইবেন সেই চিন্তায় আকুল হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে স্বদ্ধাবার স্থাপন করিয়া বিষমমনে সেই সমুদ্রতটেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে লঙ্কাভিমুখে রামের সসৈন্তে আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, দুর্জয় রাবণ অতিশয় চিন্তাকুল হইল। সে অনতিবিলম্বে সমস্ত জ্ঞাতি বন্ধু ও পারিষদকে সভামণ্ডপে একত্রিত করিয়া তাহাদের সহিত উপস্থিত বিপদে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণীত করিতে লাগিল। অনেকেই রাবণের ত্রায় পাপাত্মা ও বীর্য্যমদে গর্জিত ছিল, স্মরণ্য তাহারা লঙ্কেশ্বরকে সুপরামর্শ দিতে অক্ষম হইল। কেবলমাত্র ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণই অগ্রজ রাবণের হিতকামনায় কতকগুলি সূত্রপদেশ প্রদান করিলেন ; কিন্তু দুরাত্মা তাঁহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে যথেষ্ট অবমানিত করিল। বিভীষণের অপরাধ এই যে, তিনি রাবণকে রামহস্তে সীতাসমর্পণ করিয়া স্বরাজ্য রক্ষাকরিতে অমুরোধ করিয়াছিলেন। বাহা হউক, সীতা

হইতেই যে রাবণের সর্বনাশসাধন হইবে ইহা বুঝিতে পারিয়া মহামতি বিভীষণ দুঃশীল ভ্রাতার সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ পূর্বক সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া রামেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । রাম বিভীষণ সম্বন্ধে সকল কথাই অবগত হইয়া তাঁহার সহিত পবিত্র মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন । বিভীষণও রামের সম্যক্ সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । তদনন্তর সাগর সমুত্তীর্ণ হওনের চেষ্টা হইতে লাগিল । সেনাপতি মল বানরগণের সাহায্যে বৃক্ষপ্রস্তর দ্বারা সাগর বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্তদিবসের মধ্যেই তাহা সূক্ষ্ম করিলেন । সেই সুরচিত বিস্তৃত সেতু অনন্ত নীলাম্বরীশি মধ্যে লম্বমান হইয়া গগনতলে ছায়াপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । রামচন্দ্র বানর-সৈন্যসমভিব্যাহারে সেই সেতুসংযোগে সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কা-ভূমিতে পদার্পণ করিলেন, এবং নানাস্থলে স্কন্ধাবার স্থাপন ও অপূর্ব ব্যূহরচনা করিয়া লঙ্কাপুরী অবরোধ করিলেন । বানরগণ মুহুমুহুঃ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের অয়োদ্ধাসধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতে লাগিল ।



একাদশ অধ্যায় ।

সীতাদেবী রক্ষোগৃহে অবরুদ্ধ ও দুরন্ত চেড়ীগণে নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিয়াও সেখানে নিতান্ত সহায়শূন্য ছিলেন না। সীতার অলৌকিক চরিত্রগুণে অনেকেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। ত্রিজটানাম্নী রাবণের এক বিশ্বস্তা পরিচারিকা প্রকাশে সীতাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিলেও অন্তরে তাঁহার অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষিনী ছিল। ত্রিজটা গোপনে সীতার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিত, এবং সেই পতিবিরোগবিধুরাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিত। একদিন সে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া সীতার সমক্ষেই চেড়ীগণকে বলিয়াছিল যে, সীতাহরণপাপেই রাবণের স্বর্ণলঙ্কা অবিলম্বে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এবং সীতাকে তাঁহার বিজয়ী স্বামী উদ্ধার করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইবেন; অতএব যাহারা নিজ নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের এখন হইতেই সীতার অনুগত হওয়া কর্তব্য। বিষাদময়ী জানকী ত্রিজটার এই স্বপ্নসংবাদে হুটু হইয়া ব্রীড়াবনতবদনে বলিয়াছিলেন “ত্রিজটে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি তোমাদিগকে অবশ্যই রক্ষা করিব।” (৫১২৭) আর এক দিন ত্রিজটা সীতাকে বলিয়াছিল “দেবি, তুমি চরিত্রগুণে আমার প্রীতিকর এবং স্বভাবগুণে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ।” (৬১৪৮) সুতরাং এতদ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই নির্বাকবপুসী লঙ্কাতেও সীতাদেবী ত্রিজটার আশ্রয় রাক্ষসীসহবাসে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন।

সরমা সীতার অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষিনী সখী ছিলেন। রাবণ সরমাকে সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিল। সরমা এই

নিমিত্ত নিয়তই সীতাসন্নিধানে অবস্থান করিতেন । রাঘববনিতা তাঁহাকেই বিশ্বাস করিয়া আপনার দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতেন । সরমার হৃদয় জীজনোচিত কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল ; সীতার দুঃখে সরমা অশ্রুমোচন করিতেন । রামচন্দ্রের সসৈন্তে লঙ্কায় আগমন অবধি রাবণ কিরূপ মন্ত্ৰণা করিতেছে, সরমা তাহা অবগত হইয়া সীতাকে জ্ঞাপন করিতেন, এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রকুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতেন । দেবী সরমা মন্দভাগিনী সীতার অন্ধকারময় জীবনের একমাত্র আলোকস্বরূপ ছিলেন । সীতা এই প্রিয়সখীর সহবাসে ক্ষণকালের নিমিত্তও আপনার দুঃখজালা বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইতেন ।

ধর্মপরায়ণ বিভীষণ সীতাদেবীর কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষা ছিলেন, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । রামহস্তে সীতাপ্রত্যর্পণরূপ হিতবাক্য বলিয়াই তিনি রাবণকর্তৃক যৎপরোনাস্তি অবমানিত হইয়াছিলেন ; সেই কারণে তিনি রাবণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া রামের আশ্রয় গ্রহণ করেন । বিভীষণের কলানাম্নী এক কন্যাও সীতার অতিশয় হিতৈষিণী ছিলেন ।

রাবণের পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ সীতার পক্ষ হইয়া রাবণকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেন । রাবণের মাতামহ বৃদ্ধ মালাবান ও অবিক্র্য প্রভৃতি রাক্ষসগণ দুঃখিনী সীতাকে স্বামীর নিকট প্রেরণ করিতে অনেক অনুরোধ করিতেন ; কিন্তু দুঃখীরা রাবণ তাঁহাদের হিতকর বাক্যে কিছুতেই কর্ণপাত করিত না । মৃত্যু ঘেন কেশ্যাকর্ষণ করিয়াই তাহাকে রামের সহিত যুদ্ধে প্রবর্তিত করিতে লাগিল । রাবণ রামের সৈন্তবল ও বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল, কিন্তু সেই পাপাত্মা সেনাপতি ও মন্দবুদ্ধি মন্ত্রিগণ কর্তৃক সমুৎসাহিত হইয়া রামের সহিত সন্ধিস্থাপনের কোন চেষ্টাই করিল না । রামচন্দ্র যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে রাবণের নিকট

যুবরাজ অঙ্গদকে একবার প্রেরণ করিলেন। অঙ্গদ রাবণকে রামহস্তে সীতাসমর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন ; কিন্তু রাবণ তাঁহার হিতবাক্যে অতিশয় ক্রুষ্ট হইল। যুদ্ধ অনিবার্য দেখিয়া রামচন্দ্র স্ত্রীবিপ্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে হুর্ভেদ্য বাহ রচনা করিয়া লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিলেন।

রাবণ অতিশয় বীর ও যুদ্ধনীতিবিশারদ। বিনা যুদ্ধে বাহাতে সীতাকে বশবর্ত্তিনী অথবা রামকে পরাজিত করিতে পারা যায়, রাবণ তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সীতা একবার রাবণের অনুরাগত হইলে, রাম রোধে ও কোভে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র পলায়ন করিবে। কিন্তু সীতা স্বামীর তেজোগর্বে সর্বদাই দৃষ্টা ; রাবণ মনে করিল, রাম বিনষ্ট না হইলে, অথবা রাম বিনষ্ট হইয়াছেন এইরূপ বিশ্বাস না হইলে, সীতা কখনই রাবণকে আত্মসমর্পণ করিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিয়া হুঁষ্ট রাক্ষস বিদ্যাঙ্জিহ্বনামা এক অনুচরকে আহ্বান করাইয়া তাহাকে মায়াবলে রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত করিতে আদেশ করিল। মুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত হইলে রাবণ তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে করিতে অশোক-কাননে উপস্থিত হইয়া সীতার নিকট সৌপ্তিকযুদ্ধে রামের বিনাশ-সংবাদ জ্ঞাপন করিল, এবং সীতার বিশ্বাস সমুৎপাদনের নিমিত্ত সেই মায়ামুণ্ড ও শরাসন আনয়ন করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখা করিল। সীতা বুদ্ধিমোহে সেই ছিন্নমুণ্ডকে রামেরই মুণ্ড মনে করিয়া হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং বহুপ্রকারে নিজ অদৃষ্টের নিন্দা ও রামের জন্ত বিলাপ করিয়া উন্মাদিনীর ভাষা রাবণকে বলিতে লাগিলেন “রাবণ, তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভক্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দাও, এবং কল্যাণের কার্য্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক এবং

তঁাহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তঁাহার অনুগমন করিব ।” (৬৩২)

সীতা এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক দ্বাররক্ষক আসিয়া রাবণকে বলিল যে, সেনাপতি ও অমাত্যগণ রাজদর্শনাভিলাষে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । রাবণ তৎক্ষণাৎ অশোককানন পরিত্যাগ করিল । সে চলিয়া গেলে, সরমাদেবী সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া মারামুণ্ডরহস্য বিবৃত করিলেন এবং সীতাকে মধুরবচনে সান্ত্বনা করিলেন । সেই সময়ে জলদগন্তীর ভেয়ীরবের সহিত বানর ও রাক্ষস সৈন্তের ভীষণ সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইল । তখন সীতাদেবী বুঝিতে পারিলেন যে, উভয় সৈন্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রামের আরম্ভ হইতেছে । জানকী মধুরভাষিনী সরমা কর্তৃক আশ্বস্ত হইয়া ক্রতস্ত-হৃদয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ।

অতঃপর বানর ও রাক্ষসগণের ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল । জয় পরাজয় উভয়দলকেই আশ্রয় করিতে লাগিল । একদিন কুমার ইন্দ্রজিৎ রামের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল । সহস্র সহস্র বানর ও রাক্ষসের শোণিতে রণস্থল কর্দমময় হইল । বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল । রাবণ মহানন্দে পুত্রকে আলিঙ্গন করিল এবং তৎক্ষণাৎ সীতাকে রথে আরোপণ করিয়া একবার রণস্থলী দর্শন করাইতে ত্রিজটীর প্রতি আদেশ করিল । ত্রিজটা সীতাকে লইয়া শূন্ত হইতে নাগপাশবদ্ধ রামলক্ষণকে দেখাইতে লাগিল । সীতাদেবী তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিয়া বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পারিপূর্ণ করিলেন ; কিন্তু সহৃদয়া ত্রিজটা তাঁহাকে শোকাপনোদন করিতে উপদেশ দিলেন । রামলক্ষণ প্রাণত্যাগ করেন নাই বুঝিতে পারিয়া সীতা আশ্বস্ত হইলেন এবং অশোককাননে পুনর্বার আনীত

হইলেন । মায়ামুণ্ডপ্রদর্শনের ত্রায় এইবারও রাবণের যত্ন বিফল হইল ।

বানরসৈন্তগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ, ত্রিশিরা, মহোদর, অতিকায়, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ প্রভৃতি রাবণের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ একে একে বিনষ্ট হইল ; লক্ষা বীরশূন্য হইল । কেবলমাত্র রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা করিয়া কখন জয়লাভ এবং কখনও বা পরাজয় স্বীকার করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিত । বানরগণ একবার জয়শ্রীলাভ করিয়া মহোৎসাহে লঙ্কায় অগ্নি প্রদান করিল ; লক্ষা আবার দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইল । রাবণ সহায়শূন্য হইয়া লঙ্কার অবশুস্তাবী পতন আশঙ্কা করিল ; কিন্তু সে তথাপি নিরাশ হইল না । রাবণ যেরূপ মায়ামুণ্ড প্রদর্শন করিয়া সীতাকে বশবর্ত্তিনী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, সেইরূপ ইন্দ্রজিৎও রামলক্ষ্মণকে ভগ্নোৎসাহ করিবার নিমিত্ত একদিন যুদ্ধস্থলে রথোপরি এক রোরুদ্যমানা মায়াসীতা প্রদর্শন পূর্বক খড়্গাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিল । হনুমান স্বচক্ষে এই হৃদয়বিদারী দৃশ্য অবলোকন করিয়া সজলনয়নে সীতাবধরূপ দুঃসংবাদ রামকে জ্ঞাপন করিলেন । রামলক্ষ্মণ এবং সূগ্রীবাদি বানরগণ শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । তখন মহামতি বিভীষণ এই আকস্মিক শোকোচ্ছ্বাস-দর্শনে তাহার কারণ অবগত হইলেন এবং প্রকৃত রহস্ত বিবৃত করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন ।

ইন্দ্রজিৎকে হুর্দ্বৈ ও হুর্জয় দোখয়া একদিন বিভীষণ, মহাবীর লক্ষ্মণ হনুমান ও অগণ্য বানরসৈন্ত সমভিষাহারে, তাহার নিকুন্ডিলা যজ্ঞস্থলে গোপনে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার সমস্ত যজ্ঞদ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিলেন । ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞক্রিয়া আরম্ভ করিতেছিল, এমন সময়ে লক্ষ্মণ তাহার উপর প্রথর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ইন্দ্রজিৎ মৃত্যু আসন্ন

দেখিয়া বীরের ভায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। ইন্দ্রজিৎ লক্ষণ কর্তৃক বজ্রস্থলে নিহত হইয়াছে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র রাবণ মুচ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল, এবং কিরংকণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া শোকে উন্মত্তবৎ ভীষণ রূপ ধারণ করিল। তাহার গর্জিত হৃদয় ভয় হইয়া পড়িল, ও হুৎপিও যেন ছিন্ন হইয়া গেল। রাবণ সমস্ত জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল এবং কাল-রূপিনী সীতাই যে সমস্ত অনর্থপাতের মূল তাহা এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। রাবণ তৎক্ষণাৎ খড়্গোত্তোলন করিয়া সীতার বিনাশার্থ ধাবমান হইল; তাহার সংহারমূর্ত্তিদর্শনে সকলে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। সীতা দূর হইতেই রাবণকে ভীমবেশে আসিতে দেখিয়া নিজমৃত্যু অবধারণ করিলেন, এবং হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা প্রেমময় জীবিতনাথের পদারবিন্দ স্মরণ করিয়া রাবণের খড়্গাঘাত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা রাবণের পত্নীগণ শোকাবলম্বনে ও আলুলায়িতকেশে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্ত্রীবধরূপ পাপ-ময় স্থগিত কার্য্যান্তর্য্যাসন হইতে বিরত করিল। রাবণ শোকে বিহ্বল হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল এবং তদন্তেই যুদ্ধ যাত্রা করিয়া রামের সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বহুকণ যুদ্ধ হইলে, লক্ষণ রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইয়া ধরাশয়্যায় শয়ন করিলেন। রামচন্দ্র প্রাণপ্রতিম ভ্রাতাকে গতাস্থ মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; বানরসকল শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল; মুহূর্ত্তমধ্যে সেই রণস্থল হাহাকার ও বিলাপধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এ দিকে রাবণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল।

লক্ষণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া লুপ্তসংজ্ঞ হইলে, হনুমান সূচিকিৎসকগণের পরামর্শে তাহার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে ঔষধ

আনয়ন করিলেন । লক্ষণ সেই ঔষধের গুণে অচিরে সুস্থ হইলেন । বানরগণের জয়োল্লাসে পুনর্বার সেই লঙ্কাপুরী কম্পিত হইতে লাগিল । রামের বিজয়িনী শক্তি কিছুতেই বিধ্বস্ত হইল না দেখিয়া রাবণ অতিশয় চিন্তাকুল হইল । রাবণ পুনর্বার অমিততেজঃ যুদ্ধস্থলে উপনীত হইল এবং সেইদিনই পৃথিবীকে অরাম বা অরাবণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল । রামরাবণের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ও বিচিত্র রণনৈপুণ্য দর্শন করিতে দেবতা সিদ্ধ চারণ ও অঙ্গরোগণ আগমন করিলেন । সুররাজ ইন্দ্র ত্রিলোকপুত্র্য রামচন্দ্রকে ভূমিতলে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অমুকম্পাপরবশ হইলেন এবং তদগুণেই রামের নিকট স্বীয় অপূর্ব রথ প্রেরণ করিলেন । রামচন্দ্র দেবরাজের প্রসন্নতায় হৃষ্ট হইয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন এবং সারথিকে রাবণাভিমুখে রথচালনা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন । সেই বীরযুগলের অপূর্ব রণবেশ, ভীষণ ধমুঠকার, ও কৃতান্তসদৃশ সংহারমূর্ত্তি দর্শনে জীবজন্তুসকল ভয়ে নিষ্পন্দ হইল । অনন্তর উভয়ের মধ্যে ঘোরতর দৈর্য যুদ্ধ আরম্ভ হইল । বিজয়লক্ষ্মী কাহার পক্ষ আশ্রয় করিবেন ইহা স্থির করিতে অক্ষম হইয়াই যেন একবার রামের এবং একবার রাবণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ইতঃপূর্বেই মহর্ষি অগস্ত্য যুদ্ধদর্শনার্থ লঙ্কাতে আগমন করিয়া রাবণবধের নিমিত্ত রামচন্দ্রকে আদিত্যহৃদয় নামক সনাতন স্তোত্র শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সুতরাং রাঘব রাবণবধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া মহোৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলেও, জয়পরাজয় কিছুই স্থিরীকৃত হইল না । অবশেষে রামচন্দ্র ক্রোধে হতাশনের স্তায় প্রজ্বলিত হইয়া রাবণের প্রতি এক ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । সেই অস্ত্রাঘাতেই রাবণ গতানু হইয়া রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল ।

রাবণ নিহত হইবামাত্র এক মহান্ আনন্দকোলাহলে দিগ্ভঙ্গল

পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অমরবৃন্দ রামচন্দ্রের জরথ্বনি করিতে করিতে তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে ছন্দুভিধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সিদ্ধ চারণ ও অঙ্গরোগণ বিজয়ী রাঘবেয় জ্ঞতিবাদ করিতে লাগিলেন। বানরগণের মধ্য হইতে এক তুমুল কিলকিলাধ্বনি সমুথিত হইল। অধর্ম্মাচারী রাবণের নিধনমাত্রে দিক্‌সকল যেন প্রসন্ন হইয়া গেল; গন্ধবহ মধুগন্ধে সর্ব্বস্থল পরিপূরিত করিল; সূর্য্যমণ্ডল যেন প্রভাসম্পন্ন হইল এবং স্থাবরজঙ্গম যেন রামের বিজয়িনী শক্তির সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। বিভীষণ পাপাচারী রাবণকে ধরাশায়ী দেখিয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন; রাবণের পত্নীগণ ভর্তৃশোকে কাতর হইয়া উন্মাদিনীবেশে রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে রণস্থলে আগমন করিল। করুণহৃদয় রামচন্দ্র বিভীষণকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে রাবণের প্রেতকৃত্য সমাপন ও নারীগণকে সাঙ্ঘনা করিতে উপদেশ দিলেন। রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে মহাবীর রাবণের শৌর্য্যবীৰ্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। রাবণের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, লক্ষ্মণ রামের আদেশে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এতদিনে দ্রুত শত্রুর সমুচ্ছেদ হইল। এতদিনে রামচন্দ্র সফল-কাম হইলেন। সীতাসমুদ্ধারার্থ সূগ্রীব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহাও পূর্ণ হইল। রাবণবধে সকলেই হর্ষ ও আনন্দে নিমগ্ন হইল। রামচন্দ্র, সূগ্রীব বিভীষণ ও প্রধান প্রধান বানরগণকে আলিঙ্গন করিয়া, হৃদয়ত আনন্দ প্রকটিত করিলেন। অতঃপর তিনি মহাবীর হনুমানকে অশোককাননে সীতার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে ও তাঁহাকে রাবণবধসংবাদ জ্ঞাপন করিতে লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রেরণ করিলেন। হনুমানকে গমনোদ্যত দেখিয়া তিনি বলিলেন 'বীর, তুমি জ্ঞানকীকে এই প্রিয় সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর

লইয়া আইস।” সীতাদেবী মলিনবেশে দীনচিন্তে অশোককাননে রাক্ষসীপরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে হনুমান তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া রামলক্ষণের কুশলবার্তা ও ছুরাঙ্গা রাবণের বধসংবাদ অবগত করাইলেন। দেবী জানকী হনুমানের মুখে এই প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে ক্রিয়ৎক্ষণ বাঙ্গনিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্ষণকাল পরে তিনি বলিলেন “বৎস, তুমি আমার যে কথা শুনাইলে, ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন দেয় বস্তু দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া সুখী হইতে পারি, পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। সুবর্ণ বিবিধ রত্ন বা ত্রৈলোক্যরাজ্যও এই সুসংবাদের প্রতিদান হইতে পারে না।” (৬।১০৪)

হনুমান সীতার বাক্যে আনন্দিত হইয়া তৎপ্রীতিকামনায় সীতার ক্লেশদাত্রী হরস্ত রাক্ষসীগণকে বধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দীনা দীনবৎসলা জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়া তাঁহাকে সেই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। সীতা বলিলেন “বীর, যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশু, যাহারা অস্ত্রের আদেশে কার্য্য করে, সেই সমস্ত আজ্ঞানুবর্তিনী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্ব্ব দুষ্কৃতিনিবন্ধন এইরূপ লাঞ্ছনা সহিতেছি। বলিতে কি, আমি স্বকার্য্যেরই ফলভোগ করিতেছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমার আর বলিও না। আমার এইটি দৈবী গতি। এক্ষণে আমি ইহাদিগকে, নিতান্ত অক্ষম ও দুর্ব্বলের জ্ঞায়, ক্ষমা করিতেছি। ইহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে আমার তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। এখন সে বিনষ্ট হইয়াছে, স্তবরাং ইহারাও আর আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে না। যাহারা অস্ত্রের প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রত্যপ-

কর করেন না ; ফলতঃ এইরূপ আচার রক্ষা করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য ; চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ । আর্থ্য বান্ধি পানী ও বধাহঁকে ও তত্কাচারীর ভুল্য দয়া করিবেন । ধরিতে গেলে সকলে অপরাধ করিয়া থাকে, সুতরাং সর্বত্র ক্ষমা করা উচিত । পরহিংসাতে যাহাদের মূখ, যাহারা ক্রুরপ্রকৃতি ও দুরাশ্রা, পাপাচরণ দেখিলেও তাহাদিগকে দণ্ড করিবে না ।” (৬।১১৪)

হনুমান সীতার ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিতমনে কহিলেন ‘দেবি, বখিলাম তুমি রামের গুণবতী ধর্মপত্নী এবং সর্বোৎকৃষ্ট তাঁহার অমুরূপা, এখন আমার অমুমতি কর, আমি তাঁহার নিকট প্রস্থান করি ।’ তখন জানকী বলিলেন “সৌম্য, আমি ভক্তবৎসল ভর্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করি ।” মহামতি হনুমান তাঁহার মনে হর্ষোৎপাদন পূর্বক কহিলেন “দেবি, আজই তুমি রামলক্ষণকে দেখিতে পাইবে । তিনি এখন নিঃশত্রু ও স্থিরমিত্র ; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রকে দেখেন, তুমিও আজ সেইরূপ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে ।” এই বলিয়া হনুমান জানকীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক রামসান্নিধানে উপনীত হইলেন ।

রাম হনুমানের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সহসা অতিশয় চিন্তিত হইলেন । তাঁহার নয়নযুগল বাষ্পপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিভীষণকে কহিলেন “রাক্ষসরাজ, জানকীকে দ্বান করাইয়া এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া এই স্থানে শীঘ্রই আনয়ন কর ।” বিভীষণ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক স্বীয় পুরন্দ্রী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন, পরে স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক কহিলেন “দেবি তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া যানে আরোহণ কর ; তোমার মঙ্গল হউক, রাম তোমার দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ।”

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতার আশ্রমের পরিসীমা রহিল

না। বহুদিনের পর আজ সীতাদেবী ভর্তৃসন্দর্শনে গমন করিতেছেন, তাঁহার আর বজ্রালঙ্কারের প্রয়োজন কি ? কিন্তু বিভীষণ তাঁহাকে ভর্তৃনিদেশ পালন করিতেই অমুরোধ করিলেন ; পতিব্রতা রাঘবগন্থীও পতিভক্তিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তিনি অবিলম্বে শুদ্ধ-
মাতা হইয়া মহামূল্য বজ্রালঙ্কার ধারণ পূর্বক শিবিকার আরোহণ করিলেন। (সীতাদেবীর হৃদয়ক্ষেত্র আজ নানাভাবে লীলা-
ভূমি। গামর রাবণের হস্ত হইতে তিনি যে কখনও মুক্তিলাভ করি-
বেন এবং আর কখনও যে তিনি স্বামিমুখ দর্শন করিতে পাইবেন তাহা
তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু সীতাদেবী আজ সত্যসত্যই
সেই প্রেমময় জীবিতনাথের সন্দর্শনেই গমন করিতেছেন। ইহা ত
অভাগিনী সীতার দুঃখময়জীবনে সুখস্বপ্নমাত্র নহে ? সীতা আনন্দাশ্রু
বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবতাগণকে
উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। সীতা এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্ন, ইত্য-
বসরে শিবিকা রামসন্নিধানে উপনীত হইল। বিভীষণ অগ্রসর হইয়া
রামকে সীতার আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাম জানিয়াও
যেন কিছুই জানেন না, তিনি সীতার শিবিকাটি সন্নিহিত হইতে
দেখিয়াই ধ্যানমগ্ন হইলেন। আজ তাঁহার হৃদয় ঘোর অশান্তিপূর্ণ।
একদিকে ক্ষত্রিয়তেজ ও ক্ষত্রিয় অভিমান, অপরদিকে দাম্পত্যপ্রেম
ও প্রিয়জনসমাগম; একদিকে সীতার রাক্ষসগৃহবাস, অপরদিকে
সীতার নির্দোষিতা ; একদিকে লোকাপবাদ, অপরদিকে হৃদয়ত অত্যাচার
বিশ্বাস ; একদিকে মাধুর্য্য, অপরদিকে ভীষণতা ; এবিধ নানা
ভাবে তুমুল আলোচনে তাঁহার হৃদয় অতিশয় অভিভূত হইয়া
পড়িল। রামচন্দ্র নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া বিভীষণ
তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন “বীর, দেবী জানকী
উপস্থিত।” ঐ রাক্ষসগৃহপ্রবাসিনীর আগমনবার্তা অবগত হইবামাত্র

রামচন্দ্র আবার হৃদয়মধ্যে যুগপৎ হর্ষ, রোষ ও হুঃখ অনুভব করিলেন। তিনি ঋণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন “রাক্ষসরাজ, জানকী শীঘ্রই আমার নিকট আগমন করুন।” এই বলিয়া তিনি পুনর্বার চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ধর্ম্যজ্ঞ বিভীষণ রামের আদেশ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসন্নিহিত সমস্ত লোককে সেইস্থান হইতে অপসারিত করিতে ভৃত্যগণের উপর আদেশ প্রচার করিলেন। বানর তল্লুক ও রাক্ষসগণ দলে দলে উদ্ভিত হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বায়ুবেগক্লুভিত সমুদ্রের গভীর গর্জনের শ্রাব্য একটা তুমুল কলরব সমুদ্ভিত হইল। সহসা রামের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সৈন্তগণের অপসারণ ও তর্লিবন্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে বিভীষণকে তিরস্কার পূর্বক কহিতে লাগিলেন “তুমি কি জ্ঞাত আমার উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত লোককে কষ্টে দিতেছ? ইহারা আমারই আত্মীয় স্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার জ্বীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ লোকাপসারণও জ্বীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজাডম্বর মাত্র; চরিত্রই জ্বীলোকের আবরণ। অধিকন্তু বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে জ্বীলোককে দেখিতে পাওয়া দুষ্টীয় নহে। এক্ষণে এই সীতা বিগ্না; ইনি অতিশয় কষ্টে পড়িয়াছেন। এসময়ে, বিশেষতঃ আমার নিকটে, ইহাকে দেখিতে পাওয়া দোষাবহ হইতে পারে না। অতএব, তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আশুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে দশন করুক।” (৬।১১৫)

বিভীষণের মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ এবং হনুমানও রামের এই আদেশশ্রবণে অতিশয় বিস্মিত ও হুঃখিত হইলেন। বানর ও রাক্ষসসমাজ নীরব ও নিষ্পন্দ; মহামতি বিভীষণ সীতাসমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন; কোশেয়বসনা সীতাদেবী বজ্জায় যেন স্বদেহে মিশাইয়া বাইতেছেন; বিভীষণ তাঁহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ; লোকে অনিমিষলোচনে সীতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ; রামচন্দ্র সমুদ্রের জ্বায় প্রশান্ত ও গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট । সীতাদেবী ধীরে ধীরে স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুখাবরণ উত্তোলন করিলেন এবং বিশ্বয় হর্ষ ও স্নেহভরে ভক্তার পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ প্রশান্ত মুখমণ্ডল অবলোকন করিলেন । সীতার দৃষ্টি স্থির ও সরল ; ক্রমে ক্রমে চক্ষুদ্বিটি বিস্ফারিত হইল ; সহসা তাহা হইতে এক দিবা আলোক নিঃসৃত হইয়া তাঁহার নির্মল মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত করিল ! সীতা স্বামিসন্নিধানে মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া গেলেন ; সীতা যেন আর এই শোকতাপময় বিচ্ছেদবিরহপরিপূর্ণ সংসারে বিদ্যমান নাই ; সীতা যেন স্বামী সহ বিচরণ করিতে করিতে কোন্ এক দেবরাজ্যে আসিয়াছেন, সেখানে পাপ নাই, অশান্তি নাই ; সেখানে মন্দারকুসুম নিরত প্রস্ফুটিত, পবিত্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ; সেখানে রাম অথবা সীতা কেহই যেন রক্তমাংসময় শরীর ধারণ করিয়া নাই ; সেখানে যেন অপ্সরোকণ্ঠে তাঁহাদেরই জয়গীতি উচ্চারিত হইতেছে ! সীতা যাহাকে শয়নে জাগরণে চিন্তা করিতেন, যাহার নামামৃত পান করিয়াই তিনি এতাবৎকাল জীবিত আছেন, দেখে দেখে অন্তরিত হইলেও যাহা হইতে তিনি মুহূর্ত্তকের জন্তও কদাপি বিচ্ছিন্ন হন নাই এবং যাহাকে তিনি তাঁহার একমাত্র দেবতা জ্ঞান করেন, সেই ইহকালের গতি, পরকালের মুক্তি, প্রাণবল্লভ হৃদয়স্বামীকে সীতাদেবী বহুকালের পর কেবলমাত্র একটাবার নয়ন-গোচর করিয়া ক্লণকালের জন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ! তিনি স্বামীর দিকে অনিমিষলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া কিয়ৎকাল চিত্তা-র্পিভার জ্বায় দগ্ধায়মান রহিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার চেতনাসঞ্চার হইল । সীতা দেখিলেন যে তিনি বাস্তবিক কোন দিব্যধামে বিদ্যমান নাই, পরন্তু রাক্ষসগৃহ হইতে সমানীত হইয়া রণস্থলে রাক্ষস ও

বানরসৈন্যগণের মধ্যে স্বামীর সম্মুখে দণ্ডারমান রহিয়াছেন ! সীতা সহসা লজ্জার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন । রামচন্দ্র বিনয়াবনত জানকীকে পার্শ্বে দণ্ডারমান দেখিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন “ভদ্রে, আমি সংগ্রামে শত্রুগণ করিয়া এই তোমার আনিলাম । পৌরুষে বতদূর করিতে হয়, আমি তাহাই করিলাম । এক্ষণে আমার ক্রোধের উপশম হইল এবং আমি অপমানেরও প্রতিশোধ লইলাম । আজ সকলে আমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিল, আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি প্রতিজ্ঞা সমুত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভু । চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমার যে অপহরণ করিয়াছিল, ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহা কালন করিলাম । আজ মহাবীর হনুমানের সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন প্রভৃতি গৌরবের কার্য্য, স্ত্রীদিবের যত্ন চেষ্টা বিক্রমপ্রদর্শন ও সংপরামর্শদান, এবং মহামতি বিভীষণেরও সমস্ত পরিশ্রমই সফল হইয়াছে ।” রামের বাক্য শুনিতে শুনিতে সীতাদেবীর নয়নযুগল আবার বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এবং শিশিরসিক্ত কমলদলের ত্রায় অশ্রুজলে পরিব্যাপ্ত হইল । রাম ঐ নীলকুণ্ডিতকেশা কমললোচনার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া অস্তিশর কাতর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সহসা আত্মসংযম করিয়া আবার সর্বসমক্ষেই নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বলিতে লাগিলেন :—

“অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মানধন মনুষ্যের বাহা কর্তব্য, আমি রাবণের বধসাধনপূর্বক তাহা করিয়াছি । * * * তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যে সূর্য্যদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জন্ত নহে । আমি স্বীয় চরিত্ররক্ষা, সর্বব্যাপী নিন্দাপরিহার এবং আপনার প্রখ্যাতবংশের নীচত্ব অপবাদ কালনের উদ্দেশে এই কার্য্য করিয়াছি । এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে । তুমি আমার সম্মুখে

দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল সেটরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। অতএব আজ তোমার কহিতেছি, তুমি যেদিকে ইচ্ছা গমন কর, আমি আর তোমার চাই না। যে জ্ঞী পরগৃহবাসিনী, কোন্ সংকুলজাত তেজস্বী পুরুষ ভালবাসার পাত্র বলিরা তাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে? তুমি রাবণকর্তৃক অপহৃত হইয়াছিলে, সে তোমাকে ছুঁচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সংকুলের পরিচর দিয়া কিরূপে তোমায় পুনর্গ্রহণ করিব? যে কারণে তোমার উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, আমার তাহা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তোমাতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথার ইচ্ছা বাও” * * * (৬।১১৬)

যদি সেই সময়ে সহসা সীতার মস্তকে অশনিপাত হইত, সীতা কিছুতেই বিস্মিত হইতেন না। সীতা প্রিয়তম জীবিতনাথের এই রোমহর্ষণ কঠোরবাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সীতার স্মৃৎস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সেই সময়ে পৃথিবী যদি দ্বিধা হইত, তাহা হইলে অভাগিনী তন্মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া এই দারুণ অপমান ও লজ্জা হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেন। লজ্জায় যেন তিনি স্বদেহে মিলাইয়া গেলেন। তিনি বাম্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন, পরে বজ্রাঞ্চলে মুখচক্ষু মুছিয়া মূহ ও গদগদবাক্যে রামকে বলিলেন “যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ জ্ঞীলোককে রুদ্ধকথা বলে, সেইরূপ তুমিও আমাকে ঐতিকটু অবাচ্য রুদ্ধকথা কহিতেছ! তুমি আমার ষেরূপ বুঝিয়াছ, আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচপ্রকৃতি জ্ঞীলোকের গতি দেখিয়া জ্ঞীজাতিকে আশঙ্কা করিতেছ, ইহা একান্ত অহুচিত; যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি, তবে তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। দেখ, অসাবধান

অবস্থায় আমার যে অজস্পর্শ দোষ ঘটয়াছিল, তদ্বিবরে আমি কি করিব, তাহাতে দৈবই অপরাধী। যেটুকু আমার অধীন, সেই হৃদয় তোমাতে ছিল; আর যেটুকু পরের অধীন হইতে পারে, সেই দেহ সম্বন্ধে আমি কি করিব? আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমার না জনিয়া থাক, তবে ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি! তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্ত যখন হনুমানকে লঙ্কার প্রেরণ করিয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শ্রবণকরাও নাই? আমি এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে তুমি আপনার জীবনকে সঙ্কটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না, এবং তোমার সুহৃদগণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন্, তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচলোকের ভাষা আমাকে অপরসাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত অভিন্ন ভাবিতেছ, কিন্তু আমার জানকী নাম কেবল জনকের যজ্ঞসম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে। পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিতে পারিলে না; বাল্যে যে উদ্দেশ্যে আমার পাণিপিড়ন করিয়াছ, তাহাও মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে!” (৬।১১৭)

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাম্পগদগদস্বরে হৃৎধিত ও চিস্তিত লব্ধগকে কহিলেন “লব্ধগ, তুমি আমার চিত্তা প্রস্তুত করিয়া দাও; এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ। আমি মিথ্যা অপবাদ সহ করিয়া আর বাঁচিতে চাই না। ভর্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্বসমক্ষে আমার পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশ পূর্বক দেহ পাত করিব।” (৬।১১৭) লব্ধগ বাম্পা-কুললোচনে রোষভরে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আকার

প্রকারে তাঁহার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে তৎক্ষণাৎ এক চিতা প্রস্তুত করিলেন । চিতাঘি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই সাহস পূর্বক কালাস্তকযমতুল্য রামকে কোন কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না । সীতাদেবী স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাदन করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অগ্নিসমক্ষে কহিলেন “যদি রামের প্রাণ আমার মন অটল থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্বস্বতোভাবে আমার রক্ষা করুন । রাম সাক্ষী সীতাকে অসত্য জানিতেছেন, যদি আমি সত্যী হই, তবে এই লোকসাক্ষী অগ্নি সর্বস্বতোভাবে আমার রক্ষা করুন ।” এই বলিয়া জানকী চিতা প্রদক্ষিণ পূর্বক নির্ভয়ে অকাতরে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন ! আবাল-বৃদ্ধ সকলে আকুল হইয়া দেখিল সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা তপ্তকাঞ্চনভূষণা সর্বসমক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইলেন ! মহর্ষি দেবতা ও গন্ধর্বগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন ঐ বিশাললোচনা যজ্ঞে পূর্ণাহতির স্তায় অগ্নিতে পতিত হইলেন ! সমবেত জ্ঞীলোকেরা আকুলহৃদয়ে রোমাঞ্চদেহে দেখিলেন তেজোগর্জিতা জানকী মস্তপুত বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিত হইলেন ! চারিদিকে হাহাকারধ্বনি উঠিল ; জীবজন্তুসকল ভূমুলরবে আর্ন্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সকলে বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিল !

রাম জানকীর এই অলৌকিক কার্যদর্শন ও তৎকালে সকলের মুখে নানাকথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিম্বনা হইলেন এবং বাস্পাকুললোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । সহসা দৈববাণী হইল “রাম, তুমি সকলের কর্তা, ও জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে সামান্তলোকের স্তায়, জানকীর অগ্নিপ্রবেশে উপেক্ষা করিতেছ কেন ? এই সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও নিশাপা, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর । তুমি স্বয়ং বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ-

বধের নিমিত্ত মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছ, এক্ষণে সেই কার্য সাধিত হইয়াছে।” বাক্য অবসান হইতে না হইতেই, মূর্ত্তিমান অগ্নি সমবেত সৰ্ব্বজনের মনে বিশ্বাস সমুৎপাদন করিয়া জানকীকে অঙ্কে ধারণ পূৰ্ব্বক চিতা হইতে সমভূত হইলেন! জানকী তরুণস্বৰ্ণ্যপ্রভ ও স্বর্ণালঙ্কার-শোভিত; তাঁহার পরিধান রক্তাশ্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত। দীপ্ত চিত্তানলের উত্তাপেও তাঁহার মাল্য ও অলঙ্কার ম্লান হয় নাই! সৰ্ব্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সৰ্ব্বজ্ঞানমূর্ত্তীকে রামের হস্তে সমর্পণ পূৰ্ব্বক কহিলেন “রাম, এই তোমার জানকী; ইনি নিম্পাপ। এই সচ্চরিত্রা বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষুদ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদবধি বলদৃষ্ট রাবণ ইহাঁকে আনিয়াছে, তদবধি আজ পর্য্যন্ত ইনি তোমার বিরহে দীনমনে নিৰ্জ্জনে কালযাপন করিতেছিলেন। ইনি অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও রক্ষিত। ইনি এত দিন পরাধীন ছিলেন, কিন্তু তোমাতেই ইহাঁর চিত্ত, তুমিই ইহাঁর একমাত্র গতি। ঘোররূপ ঘোরবুদ্ধি রাক্ষসীরা ইহাঁকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইত এবং ইহাঁর প্রতি সৰ্ব্বদা তর্জন গর্জন করিত; কিন্তু ইহাঁর মন তোমাতেই অটল ছিল, এবং ইনি রাবণকে কখন চিন্তাও করেন নাই। ইহাঁর আন্তরিক ভাব বিশুদ্ধ, ইনি নিম্পাপ। এক্ষণে তুমি ইহাঁকে গ্রহণ কর; আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।” (৬।১১৯)

রামচন্দ্র নিজ অন্তরে সীতার বিশুদ্ধতা জানিতেন; কিন্তু সীতা বহুকাল রাবণগৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার শুদ্ধির আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলেন। রাম যদি সৰ্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে বিশুদ্ধ না করিয়া লইতেন, তবে লোকে রামকে কামুক ও মূৰ্খ বলিত। এক্ষণে সকলের সহিত রাম জানিলেন যে সীতার হৃদয় অনন্যপরায়ণ, চরিত্রদোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি স্বীয় পতিব্রত্যাতেই রক্ষিত ছিলেন।

তিনি প্রদীপ্ত বহুশিখার জ্বালা সর্বতোভাবে রাবণের অম্পৃশ্ব ছিলেন ।
 প্রভা যেমন সূর্য্য হইতে অবিচ্ছিন্ন, সেইরূপ সীতাও রাম হইতে ভিন্ন
 নহেন । পরগৃহবাসনিবন্ধন রাম তাঁহাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে
 পারেন না । মহাবল বিজয়ী রামচন্দ্র সীতাদেবীকে সাদরে গ্রহণ
 করিলেন ; অমনই আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও হ্রদুভিধ্বনি হইতে
 লাগিল । তখন শতী যেরূপ ইন্দ্রের নিকট স্মরণোচিত হন, সেইরূপ
 তেজঃপ্রদীপ্তা জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবীও রামের সহিত মিলিত হইয়া
 অপূৰ্ণ শোভা পাইতে লাগিলেন ।



দ্বাদশ অধ্যায় ।

রামচন্দ্র সীতাদেবীকে নিষ্পাপ ও শুদ্ধচারিণী জানিয়া গ্রহণ করিলে, সকলে এক মহান্ আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। জানকী বহুপ্রকার বিঘ্নবিপত্তির পর দেবকল্প স্বামীর পবিত্র চরণতলে স্থান পাইয়া হর্ষভরে ক্রিয়ংকণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইলেন এবং নিজের প্রতি প্রিয়তমের অপ্রত্যাশিত কঠোর ব্যবহার সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সুদীর্ঘকালব্যাপী কষ্টগ্নয় অসহ্য বিচ্ছেদের অবসানে দম্পতীযুগল পরস্পরে মিলিত হইয়া অশ্রুজলে সমস্ত দুঃখজ্বালা নির্বাপিত করিলেন এবং নিমল শান্তিসুখের অধিকারী হইয়া জীবন যেন সার্থক করিলেন। শোককুশা, চিন্তামলিনা, তাপসব্রতধারিণী জানকীর স্নেহময় পবিত্র চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া রামের প্রেমপূর্ণ হৃদয় উচ্ছ্বাসময় সমুদ্রের ত্রায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ক্রিয়দিনের জন্ত উভয়ের জীবনাকাশে যে বিষাদমেঘ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সহসা তাহা অন্তর্হিত হইলে আবার এক অভিনব পুণ্যজ্যোতি তাঁহাদের মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতে লাগিল। রামচন্দ্র আবার সেই বনচারী, ধনুর্ধ্বাণধারী, আনন্দময় জানকীবল্লভের ত্রায় এবং সীতাদেবীও সেই প্রফুল্লতাময়ী, অরণ্যচারিণী, বনদেবী রাঘবপত্নীর ত্রায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহারা জীবনে কখন ক্রণকালের জন্তও বিচ্ছেদবজ্রণা অনুভব করেন নাই, যেন সীতাহরণ রাঘববধ প্রভৃতি কার্যসকল তাঁহাদের নিকট অবাস্তব ঘটনা এবং স্বপ্নবৎ অস্পষ্ট ও অলীক ! ফলতঃ, তৎকালে উভয়েই হর্ষোন্মাদে নির্মল গগনবিহারী পূর্ণচন্দ্রের ত্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন

রামচন্দ্রের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইয়াছিল ; সুতরাং তিনি, অমুজ লক্ষ্মণ দেবী জানকী ও মিত্রগণের সহিত, অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইতে সমুৎসুক হইলেন । রাক্ষসরাজ বিভীষণ অনতিবিলম্বে দেব-চুল্লভ পুষ্পকরথ সুসজ্জিত করাইয়া তৎসমীপে তাহা আনয়ন করিলেন । রামচন্দ্র সৰ্ব্বাঙ্গে বহুসম্মানযোগ্যা সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলে, সুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণাদি রাক্ষসগণও তন্মধ্যে স্থান পরিগ্রহ করিলেন । সকলে আরুঢ় হইলে, রামের আজ্ঞাযাত্রা সেই সুবৃহৎ পুষ্পকরথ কিক্কিনীজাল আলোড়ন পূৰ্ব্বক মহানাদে গগনমার্গে উত্থিত হইল । রামচন্দ্র প্রিয়তমা জানকীর সহিত এক নিভৃত কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূৰ্ব্বক প্রণয়িনীকে ধরণীর বিচিত্র দৃশ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । নিম্নে যুদ্ধস্থল ; সেই যুদ্ধ স্থলের যে যে অংশে প্রধান প্রধান ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছিল, রাম অঙ্গুলি নির্দেশ পূৰ্ব্বক সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে বিমান সমুদ্রের উপরিভাগে উপস্থিত হইল । দিগন্তপ্রসারী মহাসমুদ্র বায়ুবেগে সংক্ষুভিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল ; তন্মধ্যে প্রকাণ্ড সেতু লম্বমান থাকিয়া, গগনমণ্ডলে ছায়াপথের ভ্রাম্য, পরিশোভিত হইতেছিল । সীতাদেবী বিশ্বয়বিস্ফারিতলোচনে মহাসাগরের ভীষণ ভাব ও সেই বিচিত্র সেতু দর্শন করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে সাগর অতিক্রান্ত হইলে, অস্পষ্টনীলিমাযুক্ত পূগমালাশোভিত সুদৃশ্য বেলাভূমি দৃষ্টিগোচর হইল । সীতাদেবী সমুদ্রবক্ষ হইতে তীরভূমির অপূৰ্ব্ব শোভা দেখিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন । বিমান বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া কিক্কিকাভিমুখে প্রধাবিত হইল । রামচন্দ্র প্রিয়তমা জানকীকে কত স্থলর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইতেছেন, ইত্যবসরে পুষ্পক কিক্কিকা রাজ্যে উপস্থিত হইল । তারা ও কুমা প্রভৃতি বানর রমণী-

গণের সহিত সীতার পরিচয় হইল; সীতাদেবী তাঁহাদিগকে সেই পুষ্পকরথেই অযোধ্যায় লইয়া যাইতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাঁহারাও তৎসমভিব্যাহারে গমন করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর বিমান কিঙ্কিকা পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র প্রিয়তমাকে ধ্বষ্মুক পর্ত্ত, মনোহর পম্পাসরোবর প্রভৃতি রমণীয় প্রদেশ সকল দেখাইয়া সেই সেই স্থলে তৎবিরহে কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন তাহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পূজ্যস্বভাবা শবরীর আশ্রম, কবন্ধের বধস্থল, স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী, পঞ্চবটীবনে তাঁহাদের পূর্ব আশ্রমপদ, রমণীয় পর্ণশালা, কিঙ্কিনীশকে চকিত মৃগদল, অগস্ত্যাশ্রম, শরভঙ্গাশ্রম, সুতীক্ষ্ণাশ্রম, মহর্ষি অত্রির আশ্রম ও চিত্রকূট পর্ত্ত প্রভৃতি দর্শন করিতে করিতে সীতাদেবী মনোমধ্যে অপূর্ব ভাবসকল অনুভব করিতে লাগিলেন। দূর হইতে অক্ষয় বট, চিত্রকাননা বমুনা ও পুণ্যসলিলা জাহ্নবী দর্শন পূর্ব্বক সীতাদেবী তাহাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। বিমান অনতিবিলম্বে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইল। রামলক্ষণ রথ হইতে অবতরণ করিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার নিকট অযোধ্যার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন। হনুমান রামের আদেশে অগ্রসর হইয়া নান্দীগ্রামে ভরতকে সকলের আগমনসংবাদ প্রদান করিলেন। তাপসবেশধারী ভ্রাতৃবৎসল মহাবীর ভরত অগ্রজের আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দিকে আনন্দোৎসব ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহার প্রত্যা-
 দায়ন্যার্থ অমাত্যবর্গ ও পুরবাসিগণের সহিত মহোল্লাসে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই রামসন্দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া, কেহ যানে, কেহ বাহনে এবং কেহ বা পদব্রজেই ধাবমান হইল। তাহা-

দের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উখিত হইল। রাম প্রীতমনে প্রজ্ঞাপুঞ্জকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ভরতকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র পুষ্পকরথকে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করিলেন। ভরত স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া পাদ্যঅর্ঘ্য দ্বারা অগ্রজের পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রণত লক্ষ্মণকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর তিনি সীতাদেবীকে অভিবাদন করিয়া সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতি বানরগণকে ও রাক্ষসরাজ বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। রামচন্দ্র বহুকালের পর কুমার ভরতকে অবলোকন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন পূর্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর শত্রুঘ্ন রামলক্ষ্মণকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া সীতাদেবীর পাদবন্দন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র শোকক্লেশ, বিবর্ণা জননী কোশল্যা দেবীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হর্ষ বর্দ্ধন ও চরণ বন্দন করিলেন, পরে সুমিত্রা কৈকেয়ী ও অশ্রাজ্জ মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া পুরোহিতের নিকট উপাস্ত হইলেন। নগরবাসীরা কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে স্বাগতপ্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ধর্ম্মশীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাছুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাজ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন “আর্য্য, আপনি যে রাজ্য আমার হস্তে শ্রাস্ত্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। যখন আমি মহারাজকে অযোধ্যায় পুনরাগত দেখিতেছি, তখন আজ আমার জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোষাগার, গৃহ, সৈন্ত, সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করুন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি।” (৬।১২৮)

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদগণকে যথাযোগ্য উপহার

প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। রাম প্রিয়তমা জানকীকে এক মণিমণ্ডিত, জ্যোৎস্নাধবল মুকুতাহার উপহার দিলেন, দেবী জানকী কণ্ঠ হইতে সেই হার উন্মোচন করিয়া পূর্বোপকার স্বরণপূর্বক স্বামীর সম্মতিক্রমে হনুমানকেই তাহা প্রদান করিলেন। মহাবীর হনুমান সীতাদেবীর এই প্রীতিদানে সম্মানিত হইয়া হর্ষে আগ্রত হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও বামদেব, ইহারা রামচন্দ্রের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অযোধ্যানগরী অভিষেকোৎসবে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। রাম রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, সকলে আপনাদিগকে সনাথ মনে করিল। কিয়দ্দিন পরে সুগ্রীবাদি বানরগণ ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ অমাত্যগণের সহিত রামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র হৃষ্টমনে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু মহামতি লক্ষ্মণ অগ্রজের নিয়োগে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন সুশীল ভরতই উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ধর্মবৎসল রাম অপত্যনির্কিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্য সুশৃঙ্খলে শাসিত হইতে লাগিল এবং প্রজাবর্গ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তিনি অনেক মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং লোকসাধারণের ধর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রাণপণে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, অনেকানেক ঋষি তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত নানাদিগ্দেশ হইতে তদীয় রাজসভায় সমাগত হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদের যথাবিধি পূজার্চনা করিয়া বিমল প্রীতিলাভ করিলেন। মহর্ষিগণ রাবণকুন্তকর্গাদি দুরন্ত রাক্ষসগণের, বিশেষতঃ ইন্দ্রজিতের, বধের নিমিত্ত তাঁহার অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রাজসভামধ্যে

সমাসীন ঋষিগণের মুখে রাবণাদি রাক্ষসগণের অপূর্ব জন্মবৃত্তান্ত ও পৌরুষপরাক্রমের কথা শ্রবণ পূর্বক অতিশয় বিস্মিত হইলেন । এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল । রাবণ প্রভৃতির জন্ম, তপস্যা ও দিগ্বিজয় সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্যই শেষ হইলে, মহর্ষিগণ বিদায় গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ।

তদনন্তর মহারাজ রামচন্দ্র, রাজর্ষি জনক, বয়শ্রু কাশীরাজ, মাতুল যুধাজিৎ প্রভৃতি রাজগণকে যথোচিত সম্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন । তাঁহারা প্রস্থান করিলে, তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন এবং প্রজাগণের সর্ববিধ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া প্রফুল্লমনে অশোক কাননে প্রবেশ করিলেন । অশোকবন মনোহর রাজোদ্যান ; উহা নানাবিধ সুন্দর বৃক্ষ ও পুষ্পিত লতায় সমাকীর্ণ । নানাস্থানে সুগন্ধি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত ও বৃক্ষসকল রসালফলভরে অবনত । কোথাও অপূর্ব লতাগৃহ, কোথাও তৃণাচ্ছাদিত হরিষ্রর্ণ ক্ষেত্র, কোথাও হংসসারস-নির্নাদিত কমলশোভিত স্বচ্ছ সরোবর এবং কোথাও বা সুন্দর পুষ্প-বাটিকা । রামচন্দ্র রাজকার্য্য পরিদর্শন করিয়া সাতাদেবীর সহিত এই মনোরম অশোককাননে প্রবেশ পূর্বক পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ।

সীতাদেবী এখন রাজমহিষী । সীতা ইতঃপূর্বে রত্নৈশ্বর্য্য পরি-
ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত অরণ্যে গমন করিতে অনুমাত্রও অনিচ্ছা
প্রদর্শন করেন নাই । আমরা দেখিয়াছি তিনি স্বামিসহবাসে গভীর
অরণ্যকেও কেমন মনোহর রাজোদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন ।
সীতাদেবী রাজকন্যা রাজবধু ও অতিশয় সুকুমারী হইয়াও অরণ্যের
কষ্টে একটা দিনও সামান্য কাতরতা প্রকাশ করেন নাই । স্বামি-
সহবাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অলৌকিক অনুরাগ, এই
দুইটি কারণেই তিনি হৃৎকান্দকে বলে তাহা জানিতে সমর্থ হন

নাই। সীতা যেরূপ স্নেহে রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন, অরণ্যেও সেইরূপ স্নেহে কালযাপন করিয়াছিলেন। কেবল রাক্ষসগৃহেই তাঁহাকে যাহা কিছু নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল মাত্র। সে-যাহা হউক, (সীতাদেবী এত দিনে রাজমহিষী হইলেন। সীতার কেহ সপত্না নাই; রামচন্দ্র কখন কোনও নারীর প্রতি ভ্রমক্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না; তিনি যেরূপ জিতেন্দ্রিয় ও ধর্মপরায়ণ, সেইরূপ পত্নীর প্রতি একান্ত অনুরাগবান্। তিনি সীতাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসেন এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত অবলোকন করেন। রাজমহিষী সীতাদেবী আজ যথার্থই সৌভাগ্যশালিনী। আজ স্বামীর সহিত তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী; ভ্রাতৃগণ, অমাত্যগণ, ও কত শত রাজা রামের অনুগত; রাম নিজ প্রতাপে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন; তাঁহার গৌরবের সীমা নাই; সীতাদেবীও আজ সেই গৌরবে গৌরবান্বিত; কিন্তু তিনি রাজমহিষীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কি কিছুমাত্রও অহঙ্কৃত হইয়াছেন? সীতার জীবনে কি কোন পরিবর্তন হইয়াছে? সীতার বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনোতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা যাহারা মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই এই প্রশ্নের সন্তুস্তর দিতে সক্ষম। অবস্থার পরিবর্তনে সীতার জীবনে কোনও পরিবর্তন হয় নাই। রাজপুত্রবধূ জানকী যেরূপ বিনীত ও স্বশ্রুগণের সেবা-পরায়ণ ছিলেন, রাজমহিষী সীতাদেবীও আজ তজ্জগাই বিনম্র, নিরহঙ্কার ও গুরুজনের গুরুত্বগে নিরত। সীতাদেবী পূর্নাঙ্কে দেবপূজা সমাপন করিয়া নির্বিশেষে স্বশ্রুগণের সেবা করিতেন। তিনি রাজমহিষী, স্ততরাং এক্ষণে রাজসংসারের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী কর্ত্তী। একটা সুবৃহৎ রাজসংসারকে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত করিতে হইলে, যে যে গুণের প্রয়োজন হয়, সীতাদেবীতে তৎসমুদয়ই

বিদ্যমান ছিল। তিনি সকলেরই সুখ ও মঙ্গলচিন্তা করিতেন; সামান্য পরিচারিকাও তৎকর্তৃক উপেক্ষিত হইত না। সীতা রাজমহিষী বলিয়া কখনও অহঙ্কৃত হন নাই; তবে ইহা সত্য বটে যে তিনি স্বামীর সৌভাগ্যে আপনাকে সৌভাগ্যবতী, তাঁহার বশে আপনাকে যশস্বিনী, এবং তাঁহার গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেন। ভর্তা গুরু রাজ্যভার বহন করিতেছেন, যাহাতে তিনি আপনার কর্তব্যকর্মসকল সূচারুরূপে পালন করিতে সক্ষম হন, সীতা তদ্বিষয়ে সর্বদাই যত্নবতী ছিলেন। রামচন্দ্র পূর্বাঙ্কে সমস্ত রাজকার্য্য পরিদর্শন করিয়া দিবসের শেষার্দ্ধে অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতেন। সীতাদেবী বহুমূল্য বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া প্রৌতমনে স্বামীর সহিত মিলিত হইতেন এবং নানাবিধ আনন্দপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেন।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। এক দিন রামচন্দ্র আনন্দিতমনে সীতার পাণ্ডুরবর্ণ সূত্রী মুখমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে সহসা তাঁহাকে প্রজ্ঞাবতী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন রামের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি লজ্জাবনতমুখী প্রিয়তমা দয়িতাকে একান্ত অনুরাগভরে অঙ্কে আরোপণ করিয়া দোহদপ্রদ করিলেন “প্রিয়ে, দেখিতেছি তোমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ উপস্থিত; এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি বল। আমি তোমার কি প্রিয়-সাধন করিব?” দেবী জানকী ব্রীড়ায় সঙ্কুচিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন “নাথ, এক্ষণে পবিত্র আশ্রমসকল দর্শন করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে। যে সকল ফলমূল্যশী তেজস্বী ঋষি জারুবীতটে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছেন, আমি তাঁহাদের নিকট একবার গমন করিব। আমি অন্ততঃ এক রাত্রি তাঁহাদের তপোবনে গিয়া বাস করিব, এই আমার মনোগত ইচ্ছা।” (৭।৪২)

পাঠকপাঠিকাবর্গ একবার সীতাদেবীর আশ্রমদর্শনলালসার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করুন। স্বামীর সহিত প্রায় চতুর্দশ বর্ষকাল বনবাস, অসংখ্য আশ্রমপর্যটন এবং ঋষিকৃত্রা ও ঋষিপত্নীগণের সহিত বাস ও বিচরণ করিয়াও যেন জানকীদেবী হৃদয়মধ্যে কিছু মাত্রও পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই ! তিনি রাজসংসারের সুখভোগের মধ্যেও আশ্রমশোভার স্বপ্ন দেখিতেছেন এবং উপাদেয় রাজভোগ্য খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অনিচ্ছা প্রদর্শন পূর্বক ঋষিজনপ্রিয় সেই ফল মূল ও নীবারতগুলের দিকেই সমাকৃষ্ট হইতেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা সীতাচরিত্রের এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব ; কিন্তু, হায়, এতদ্বারাই মন্দভাগিনীর সর্বনাশসাধনের উপক্রম হইল।

মহারাজ রামচন্দ্র প্রিয়তমার এই সরল আশ্রমের প্রার্থনা শ্রবণ পূর্বক অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং পরদিনই সীতা তপোবন যাত্রা করিবেন এই কথা বলিয়া হৃষ্টমনে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।



ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

মহারাজ রামচন্দ্র অপত্যনির্কির্শেষে প্রজা পালন করিতেন । তাঁহার রাজত্বকালে লোকে পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিল । তিনি সত্যপ্রিয়, ধর্মপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন । তাঁহার চরিত্র জ্যোৎস্না-ন্যাত শুভ্র অকলঙ্ক পুষ্পের ন্যায় পবিত্র ও নির্মল ছিল । যে সব গুণ থাকিলে লোকের অতিশয় প্রিয়ভাজন হওয়া যায়, সেই সমস্ত গুণই রামের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল । প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান ও দেবতার ন্যায় পূজা করিত । রামচন্দ্র সর্বদা তাহাদের হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম ও যশ উপার্জন করিতেন । রাম শুদ্ধস্বভাব ও শ্রায়বান হইলেও, একটা বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ দৌর্বল্য ছিল । লোকরঞ্জনপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রবল ছিল । রামচন্দ্র তেজস্বী পুরুষ, তাঁহার বাহুবল অপরিমেয় ; তিনি ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না এবং নিজ রাজত্বকালে অনেক দেশও জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন ; সুতরাং প্রজাসাধারণ হইতে তাঁহার কোন ভয়সম্ভাবনা ছিল না । যেখানে কোন ভয় সম্ভাবনা নাই, সেখানে প্রজাপীড়ক রাজগণ ইচ্ছা করিলে যথেষ্টাচারী হইতে পারেন এবং 'নানাপ্রকার অত্যাচারেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । কিন্তু রামচন্দ্র সেরূপ প্রকৃতির রাজা ছিলেন না ; তিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের ধর্মার্থকাম-সঙ্করে যথাসাধ্য সহায়তা করিতেন । (রাম আপনাকে কেবল রাজ্যে-রই অধীশ্বর মনে করিতেন না ; তিনি ধর্মেরও রক্ষক ছিলেন । রাজার দৃষ্টান্তই সাধারণে অনুসরণ করিয়া থাকে, এই জন্ত রাম স্বয়ং ধর্মপরায়ণ

ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন এবং রাজপরিবারবর্গেরও শুদ্ধাচারিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে সর্বদা যত্নবান থাকিতেন । রাজচরিত্রে কোন অপবাদের আশঙ্কা দেখিলে তিনি অতিশয় শঙ্কিত হইতেন, যেহেতু তদ্বারা সংসারে ধর্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইলেও হইতে পারে । রামচন্দ্রের ঈদৃশী ধর্মভীরুতা কখনই দুষণীয় নহে, বরং অতিশয় প্রশংসার্হই বটে । কিন্তু ধর্মকে জয়যুক্ত করিতে হইলে, সত্যকেও জয়যুক্ত করিতে হয় । মিথ্যা অপবাদের ভয়ে সত্য ও অভ্রান্ত বিশ্বাসের মস্তকে পদার্পণ করা কতদূর ভ্রায়সঙ্গত তাহা সকলের বিচার্য্য বিষয় । লোকরঞ্জনপ্রবৃত্তির অনুরোধে রামচন্দ্রের ভ্রায় সত্যব্রত রাজা যদি নিজ হৃদয়ত সত্য বিশ্বাসকে পরিহার করিয়া কোন গুরুতর অস্ত্রায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তবে তাহা যে তাঁহার প্রকৃতিগত বিশেষ দৌর্ব্বল্যপ্রসূত তদ্বিশয়ে আর সন্দেহ থাকে না । সত্য বটে, কোন মহদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই তিনি সেই দৌর্ব্বল্যকে প্রশ্রয় দিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহা যে দৌর্ব্বল্য তদ্বিশয়ে কাহারও অগ্র মত না থাকাই কর্তব্য । মহারাজ রামচন্দ্র সেই দৌর্ব্বল্যের বশবর্তী হইয়াই একটা গুরুতর অস্ত্রায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিলেন !

অন্তর্কল্পী সীতাদেবী ভর্তার নিকট আশ্রমবাসরূপ অভিলষিত প্রার্থনা করিলে, রামচন্দ্র আহ্লাদসহকারে তাহা পূর্ণ করিতে প্রতীশ্রুত হইলেন । তিনি সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্নানদগণের সহিত মিলিত হইলেন । অনন্তর ভদ্রনামা একব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তিনি অবগত হইলেন যে, প্রজাগণ রামচন্দ্রের বাহুবল, রাবণ বধরূপ হুঃসাধ্য কার্য্য, স্ববীর্য্যে সীতাসমুদ্ধার, অলৌকিক ধর্ম্মপরাক্রমতা এবং অত্যাৎ-কষ্ট শাসনপ্রণালীসম্বন্ধে অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু তিনি যে রাবণাপদ্ধতা পরগৃহবাসিনী সীতাকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন

এই কারণে নানাশ্রকার জন্মনা করে । তাহার। রামকর্তৃক সীতার পুনঃগ্রহণসম্বন্ধে পরস্পরে এই রূপ কথোপকথন করিয়া থাকে “জানি না, রামের হৃদয়ে সীতাসহবাস কিরূপ প্রবল । রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে এবং লঙ্কায় গিয়া তাঁহাকে অশোককাননে রক্ষা করে । সীতা রাক্ষসদিগের বশীভূত ছিলেন ; জানি না রাম কেন তাঁহাকে স্নগার চক্ষে দেখিলেন না ! রাজার যে রূপ আচরণ, প্রজারাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে ; অতঃপর জ্বর এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরাও সহিয়া থাকিব ।” (৭।৪৩)

রামের মস্তকে সহসা অশনিপাত হইল । সীতাসম্বন্ধে লোকের এইরূপ বিশ্বাস দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন । তিনি সুহৃদগণকে বিসর্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ ভরত ও লক্ষ্মণকে সমীপে আনয়ন করিতে ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন । রাম আপনাকে অতিশয় মন্দভাগ্য মনে করিয়া অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন । বিদগ্ধ-স্বাভাবা জানকীর পবিত্র চরিত্র তিনি অবগত আছেন, কিন্তু অল্পবুদ্ধি প্রজাগণ তাঁহার মহত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে ছরপণের কলঙ্ক আরোপণ করিতেছে ! হায়, এই কলঙ্ক ক্ষালিত হইবে কিরূপে ? রামের চক্ষে সমগ্র সংসার অন্ধকারময় বোধ হইল । ইহজীবনে রামের আর সুখ নাই । রামচন্দ্র-কৃষ্ণেই প্রজাপালনরূপ কঠোর ব্রত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া যথাযোগ্যরূপে প্রজাপালন করিতে হইলে পতিপ্রাণা নিরপরাধিনী সীতাকে পরিত্যাগ করা ভিন্ন আর কি উপায় বিদ্যমান আছে ? কিন্তু রাম কোন্ প্রাণেই বা সেই শুদ্ধচারিণী পত্যমুরাগিণী সাক্ষী সীতাকে বিসর্জন করিবেন ? রাম যে সেই স্নেহের প্রতিমা প্রিয়তমা জানকীকে নির্দাসিত করিয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিবেন না ! হায়, রামের মৃত্যু হইল না কেন ? জানকীকে বিসর্জন করিয়া রাম কোন্ সুখে

রাজর্ষি জনকের সহিত বাক্যালাপ করিবেন ? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাম সীতালোককে বিহ্বল হইয়া হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ।

এদিকে ভরত ও লক্ষ্মণ দূর হইতে মহারাজের এই আকস্মিক মনোভাব অবলোকন করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং একান্ত উদ্ভিগ্নহৃদয়ে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন । রাম তাঁহাদিগকে দেখিয়াই অধিকতর প্রবলবেগে অশ্রু বিসর্জনে করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে তিনি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট সীতার অপবাদ-সংক্রান্ত সমস্ত কথাই বিবৃত করিলেন । তিনি লক্ষ্মণকে সঙ্ঘোদন করিয়া কহিলেন “বৎস, মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশে আমার জন্ম, সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম । লক্ষ্মণ, তুমি ত জানই রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করি । তখন আমার মনে হইয়াছিল সীতা বহুদিন লঙ্কায় ছিলেন, আমি কিরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করি ? পরে সীতা আমার প্রত্যয়ের জন্ত তোমার ও দেবগণের সমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন । এই অবসরে, দেবতা-গণ ঋষিগণের সমক্ষে বলিলেন সীতা নিম্পাপ । আমার অন্তরাত্মাও জানিত সীতা সচ্চারিত্রা । তৎপরে আমি তাঁহাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম । কিন্তু এক্ষণে এই অপবাদ শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ।” (৭।৪৫) রামের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল । এই অকীর্্তির জন্ত তাঁহার মনে যে দারুণ সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি পুনর্বার বলিতে লাগিলেন “সীতার কথা কি, আমি অপবাদের ভয়ে নিজের প্রাণ এবং তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি । এক্ষণে আমি অকীর্্তিজনিত শোকসাগরে নিপতিত হইয়াছি ; আমি জীবনে ইহা অপেক্ষা তীব্রতর যন্ত্রণা আর কখনও ভোগ করি নাই । অতএব, ভাই,

তুমি কাল প্রভাতে স্তম্ভচালিত রথে আরোহণ পূর্বক সীতাকে লইয়া অন্তদেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার পরপারে তমসাতীরে মহাত্মা বাস্মীকির দিব্য আশ্রম আছে ; তথায় কোনও নির্জন স্থানে জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার আদেশ পালন কর ; তুমি জানকীর জন্ত আমার কোন অহুরোধ করিও না ; তুমি এই বিষয়ে নিবারণ করিলে আমি অতিশয় বিরক্ত হইব। এক্ষণে যাও, ভালমন্দ বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যদি তোমরা আমার মতস্থ হও, তবে আমার সম্মান রক্ষা কর এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস। পূর্বে সীতা গঙ্গাতীরে আশ্রমসকল দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ কর।” (৭।৪৫) এই বলিয়া রাম অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন, ভ্রাতৃগণও শোকাকুলচিত্তে অন্তঃপ্রস্থান করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দুঃখিত লক্ষ্মণ স্তম্ভকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রথে সীতার বহনোপযোগী অশ্বসকল যোজিত এবং উপবেশনার্থ তনুপরি এক সুকোমল আসন প্রস্তুত হইল। সীতাদেবী নিশ্চিন্তমনে গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বিনীতবচনে কহিলেন “দেবি, মহারাজ তোমার প্রার্থনার সন্মত হইয়াছেন। এক্ষণে, তিনি তোমায় গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমার আদেশ করিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে শীঘ্রই ঋষিসেবিত অরণ্যে লইয়া যাইব।” সীতাদেবী ভর্তার ঈদৃশ অনুগ্রহদর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রফুল্লহৃদয়ে মহামূল্য বস্ত্র ও নানারূপ রত্ন লইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন “বৎস, আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্নীদিগকে দান করিব।” লক্ষ্মণ

প্রকাশ্যে তাঁহার বাক্যে অমুমোদন করিলেন বটে, কিন্তু সেই সরল-
হৃদয়ার অবশ্রুতাবিনী দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে অতিশয়
সন্তপ্ত হইলেন। বাহা হউক তিনি সংযতচিত্ত হইয়া পূজ্য
স্বভাবা জানকীর সহিত রথে আরোহণ করিলেন। সীতাদেবী
নগরীর বহির্ভাগে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, কুসুমিত বৃক্ষলতা, বন উপবন,
উদ্যান সরোবর প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ের অপূর্ণ শোভা
সন্দর্শন করিয়া পুলকিত, এবং প্রিয়তম প্রাণনাথের অপার স্নেহ ও
করুণার কথা চিন্তা করিয়া হৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সহসা সীতার
দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার
মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষে জগৎসংসার যেন
অন্ধকারময় বোধ হইল। তাঁহার মন কি কারণে যে এত উদ্বিগ্ন
হইল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষ্মণের মুখপানে
একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পতি-
প্রাণী জানকী আৰ্য্যপুত্রের কোনরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কহিলেন
“বৎস, আমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতেছে; আমি পৃথিবী শূন্য দেখি-
তেছি; তোমার ভ্রাতা রাম ত কুশলে আছেন? শ্বশ্রুগণের ত মঙ্গল?
গ্রাম ও নগরবাসিগণের ত কোন বিপদ ঘটে নাই?” লক্ষ্মণ জানকীর
উৎকণ্ঠাদর্শনে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু জানকী
উদ্বিগ্নমনে কৃতাজলিপুটে উদ্দেশে দেবতাগণের নিকট সকলের মঙ্গল
কামনা করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাজ্যধাপন পূর্বক পর দিন মধ্যাহ্ন
সময়ে জাহ্নবীতটে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে জাহ্নবীকে দর্শন
করিয়া লক্ষ্মণ অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন; লক্ষ্মণের সংযত শোকা-
বেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; তিনি আর কোন ক্রমেই নিজ মনোভাব
গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না। সরলস্বভাবা সীতা দেবরকে

রোদন করিতে দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং কোনও গুরুতর বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া যার পর নাই বিষন্ন হইলেন । সীতা নির্বন্ধাতিশয়সহকারে লক্ষ্মণকে বারম্বার রোদনকারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্তুতর পাইলেন না । তখন তিনি বলিলেন “বৎস, এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হইও না । তুমি আমাকে গঙ্গাপার কর এবং তাপসগণকে দেখাইয়া দাও ; আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিব । পরে তাঁহাদের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব । দেখ, আমারও সেই পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে ।” (৭।৪৬)

লক্ষ্মণ অশ্রুপূর্ণলোচনে নাবিকসহিত এক নৌকা আনয়ন করিয়া দেবী জানকীর সহিত তৎসাহায্যে গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইলেন । সীতাদেবী নৌকা হইতে অবতরণ করিবামাত্র লক্ষ্মণ আর কোনমতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না । তিনি বালকের ছায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে জানকীর পাদমূলে নিপতিত হইলেন এবং “দেবি, ইতঃপূর্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন ? তুমি আমাকে ক্ষমা কর ; এই লোকবিগহিত কার্যে নিযুক্ত হওয়া আমার উচিত নহে ; তুমি আমার অপরাধ লইও না” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন । লক্ষ্মণকে এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া সীতা অতিশয় ব্যাকুল হইলেন । তিনি বলিলেন “বৎস, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । সমস্তই প্রকাশ করিয়া বল । মহারাজ ত কুশলে আছেন ? তিনি কি আমাকে কোন অপ্রিয় কথা শুনাইতে তোমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন ? তুমি আর বিলম্ব করিও না ; সমস্তই বল । নানারূপ উৎকণ্ঠায় আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে ।”

তখন লক্ষ্মণ বহুচেষ্টার পর বাষ্পগদগদকণ্ঠে কহিলেন “দেবি, মহারাজ লোকমুখে তোমার রাক্ষসগৃহবাসনিবন্ধন দারুণ অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তোমাকে গঙ্গাতীরস্থ এই আশ্রমসন্নিধানে পরিত্যাগ করিতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন । তুমি আমার সমক্ষে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ কলঙ্কভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন । তিনি তোমার বাস্তব যে কোন দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা মনে করিও না । দেবি, অদূরে মহর্ষি বান্দ্রীকর আশ্রম ; মহর্ষি আমার পিতা রাজা দশরথের পরম বন্ধু ; তুমি তাঁহারই চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া বাস কর । মহারাজ আমাকেই এই নিষ্ঠুর আদেশপালনে নিবৃত্ত করিয়াছেন ; কিন্তু ইতঃপূর্বে আমার মৃত্যু হইলে আমাকে আজ আর এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হইত না । আর্য্যো, আমি অগ্রজের বশবর্তী, আমার অপরাধ লইও না ।” লক্ষ্মণ এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ।

লক্ষ্মণের মুখে এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ়ার ভ্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে সহসা মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন । তিনি ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞাগাভ করিয়া জলধারাকুললোচনে দীনবচনে কহিতে লাগিলেন “লক্ষ্মণ, বিধাতা আমাকে হুঃখভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন । আমি কেবল হুঃখেরই মুখ দেখিতেছি । অথবা বিধাতারই বা দোষ কি ? আমি পূর্বজন্মে অনেক পাপাভূতান করিয়াছিলাম, অনেক পতিব্রতা কামিনীকে পতিবিয়োগহুঃখ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আজ শুদ্ধচারিণী ও পতিব্রতা হইয়াও স্বামিকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলাম । হায়, পূর্বে আমি রামের পার্শ্ববর্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে

বাস করিব ? হুঃখ উপস্থিত হইলে আর কাহার নিকটেই বা হুঃখের কথা কহিব ? মুনিগণ আমাকে পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাদিগকে কিই বা উত্তর প্রদান করিব ? তাঁহারা আমাকে কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী মনে করিবেন সন্দেহ নাই ! হায়, আমার গর্ভে রামের বংশধর সন্তান রহিয়াছে ; আজ তাহার বিনষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা না থাকিলে আমি তোমারই সমক্ষে এই ঘৃণিত পাপজীবন বিসর্জন করিতাম । লক্ষণ, তোমার আর অপরাধ কি ? তুমি অগ্রজের আদেশ পালন করিয়াছ ; তুমি এই হুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন কর । তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া স্বশ্রুগণের চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবে ; পরে, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিবে ‘আমি যে শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী, তাহা তুমি অবশ্যই জান । আর তুমি যে কেবল লোকনিন্দাভয়ে আমার পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাও আমি জানি । তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্তব্য ।’ লক্ষণ, তুমি সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে আরও বলিবে ‘তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ, পুরবাসিগণকেও সেইরূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর্ম্ম এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্ত্তিলাভ হইবে । মহারাজ, আমার প্রাণ যদি যায়, তজ্জন্ত আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না । কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপমণ রটিয়াছে, যাহাতে তাহা ক্ষালন হয়, তুমি তাহাই করিবে । পতিই জ্ঞীলোকের পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু । অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, জ্ঞীলোকের তাহাই কর্তব্য ।’ লক্ষণ, আমি এজন্মে স্বামীর সহবাসসুখ লাভ করিতে সমর্থ হইলাম না বটে, কিন্তু পরজন্মে যাহাতে রামই আমার

স্বামী হন এবং তাঁহার সহিত আর কখনও বিচ্ছেদ না ঘটে, আমি তজ্জন্ত অতঃপর ঘোরতর তপস্তা করিব। বৎস, রামের নিকট আমার ইহাই বক্তব্য। তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এই সমস্ত কথা বলিও।” (৭।৪৮) সীতা এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন “বৎস, আমি গর্ভিণী হইয়াছি; আজ তুমি আমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ দেখিয়া যাও।”

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। শোকে তাঁহার বাক্যক্ষুণ্ণ হইল না। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদাক্ষণ করিলেন এবং ক্রিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন “দেবি তুমি আমায় কি বলিলে! আমি যে ইহজন্মে কখনও তোমার রূপ দেখি নাই! প্রণামপ্রসঙ্গে কেবল তোমার চরণই দর্শন করিয়াছি। এখন তুমি রামবিরহিত, স্নতরাং এই বনে আমি তোমায় কিরূপে দর্শন করিব!” (৭।৪৮)

এই বলিয়া লক্ষ্মণ জানকীকে প্রণাম করিলেন এবং রোদন করিতে করিতে নোকায় আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে নোকা গঙ্গার অপর তটে সংলগ্ন হইল। যতক্ষণ সীতাদেবী দৃষ্টিগোচর হইতে-ছিলেন, ততক্ষণ লক্ষ্মণ তাঁহার দিকে সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ দোঁধিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইবামাত্র জানকী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনধ্বনিতে বৃক্ষলতা নিষ্পন্দ হইল; মৃগসকল দর্ভাঙ্গুরভক্ষণে বিরত হইয়া তাঁহার দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিল; ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিল এবং বন-স্থলী এক ভীষণ আর্তনাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।)

কতিপয় ঋষিকুমার বনमध्ये ভ্রমণ করিতে করিতে সীতার রোদন-শব্দের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইল এবং রোদ্ধদ্যমানা

জানকীকে কোন দেবকৃত্য মনে করিয়া বাস্তবিক নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত গোচর করিল । মহর্ষি ধ্যানস্থ হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং স্বরিতপদে অনাগিনী সীতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । বাস্তবিক সীতাদেবীকে দেখিয়াই স্তম্ভবাক্যে কহিলেন “বৎসে, তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা ; তুমি ত নির্ঝিল্লি আসিয়াছ ? তুমি যে আসিতেছ, আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি । তোমার আসিবার কারণও আমি জানিয়াছি । তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা তাহাও আমি জানি । তুমি যে নিম্পাপ, আমি তপোবললব্ধ চক্ষুঃপ্রভাবে তাহা জানিয়াছি । এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও । অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে । আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপোভূষ্ঠান করিতেছেন ; তাঁহারা কৃত্যম্নেহে নিয়ত তোমায় পালন করিবেন । এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অর্ঘ্য গ্রহণ কর, স্বর্গহের ত্রায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিবন্ধ হইও না ।” (৭৪৯)

জানকী মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন “তপোধন আমি আপনারই আশ্রমে থাকিব ।” এই বলিয়া সীতাদেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । বাস্তবিক তাপসীগণের সন্নিহিতে উপস্থিত হইয়া জানকীকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন । পূজ্যস্বভাব তাপসীগণ রাঘবপত্নীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অতীব পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার স্মৃতি স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন । দেবী জানকী তাঁহাদের সংকারে প্রীত হইয়া তাপসীবেশে সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন । চন্দ্রশূভ্রা হইয়া পৃথিবী যেমন অমানিশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, পতিবিরহে সীতাদেবীও সেইরূপ শোকাচ্ছন্ন হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

(রামচন্দ্র কেবল লোকাপবাদভয়েই সীতাদেবীকে অরণ্যে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহাকে হৃদয়-রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করেন নাই। রাম প্রিয়তমা জানকীর অলৌকিক গুণে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি যে শুদ্ধচারিণী ও পবিত্র-স্বভাবা তদ্বিশয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। পরম্পরের সম্বন্ধিত অমুরাগে তাঁহারা হৃদ্দেশ্য প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; রাম সীতার পতিপরায়ণতা, স্নেহীলতা ও সরলতাতে যেরূপ একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সীতাদেবীও স্বামীকে সেইরূপ আপনার একমাত্র দেবতা মনে করিয়া পূজা করিতেন। রাম প্রজারঞ্জনানুরোধে সেই করুণাপাত্রী পতিব্রতা জনকতনয়াকে বিসর্জন করিয়া শোকে বিমূঢ় হইলেন এবং নিজ অদৃষ্টলিপির বহুতর নিন্দা করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্তর্কল্পী, স্নানুমারী, পতিপ্রাণা রমণীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়া রাম হৃদয়ে কিছুতেই শাস্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু শত শত বৃশ্চিকদংশনের ত্রায় অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। এই লোকবিগর্হিত নিষ্ঠুর কার্যের জন্ত তাঁহার মনে দারুণ সম্ভাপ উপস্থিত হইল। তিনি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে কেবল অবিরলধারায় অশ্রুস্রোচন করিতে লাগিলেন এবং রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার নিমিত্ত একবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন না। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থদিনে লক্ষ্মণ শূণ্য রথ লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। রাম লক্ষ্মণের মুখে আত্মপূর্ব্বক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া

হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; তৎকালে কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্রজকে এইরূপ কাতর দেখিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন “প্রভো, যে প্রজাপালনামুরোধে আপনি এই অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, এক্ষণে সেই রাজধর্ম্মে মনোনিবেশ করুন। স্ত্রীপুত্রপরিবার সমস্তই অনিত্য; ইহাদের সহিত বিয়োগ অবশ্যস্বাভাবী; সুতরাং আপনি শোক পরিহার করুন। আপনার ভ্রাতৃ সংপুরুষেরা এইরূপ বিষয়ে কদাচ বিমোহিত হন না। আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া আর্ধ্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তজ্জন্ত শোকাকুল হইলে সেই অপবাদই আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে; সুতরাং আপনি ধৈর্য্যাবলে এই দুর্ব্বল বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন; আর সন্তপ্ত হইবেন না।”

মহারাজ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া রাজকার্য্যে পুনর্বার মনোনিবেশ করিলেন। তিনি নানাপ্রকার হিতকর কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত রহিলেন বটে, কিন্তু জানকীর সরল পবিত্র মূর্ত্তি তাঁহার অন্তর হইতে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও অন্তর্হিত হইল না! তিনি সীতাবিরহে প্রভাতকালীন শশাঙ্কের ভ্রাতৃ অতিশয় নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং আর কোন প্রকারেই হৃদয়ে প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। রামের জীবন যেন অতিশয় দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল। রাম জনকতনয়ার অলৌকিক গুণাবলী যতই স্মরণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন অতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল। বাহাহউক এক প্রজাপালন ব্যতীত রামচন্দ্রের ইহসংসারে স্থিতি করিবার আর কোনই বন্ধন রহিল না। তিনি আত্মমুখে জলাঞ্জলি দিয়া এখন কেবল রাজ্যশাসনেই চিন্তানিয়োগ করিলেন। রামচন্দ্রের স্মৃশাসনগুণে রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। লোকে সদাচারসম্পন্ন ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হইল; কেহই উচ্ছৃঙ্খল হইল না। তাঁহার প্রতাপে শত্রুবার্গ

উচ্ছিন্ন এবং মিত্রদল পরিপুষ্ট হইল । কেহই অকালমৃত্যুমুখে পতিত হইল না, এবং সর্বত্রই সুখ ও শান্তি বিরাজিত হইল । রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জন করিয়া আর ভার্য্যাস্তর গ্রহণ করিবার কোন চিন্তাও করিলেন না । তিনি জনকতনয়ার অসামান্য পাতিব্রত্যগুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার কনকময়ী প্রতিমূর্তির সহিত যজ্ঞকার্য্য সমাপন করিতেন । অভাগিনী জানকী তাঁহার প্রতি প্রিয়তমের ঈদৃশ অনু-রাগের কথা শ্রবণ করিয়া সেই তাপসীগণের আশ্রমে বিরলে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতেন ।

এইরূপে জানকী নীহারক্লিষ্ট কমলের আয়, অক্ষুট চন্দ্রলেখার আয়, ধূলিধূসরিত কনকরেখার আয়, কুজ্বাটিসমাচ্ছন্ন প্রভাতের আয়, এবং মেঘজালজড়িত শ্যামায়মান জ্যোৎস্নার আয় যারপরনাই শোচনীয় হইয়া সেই আশ্রমেই কালযাপন করিতে লাগিলেন । তিনি তাপসীর আয় বেশ ধারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্তা করিতে লাগিলেন । তিনি মনোমধ্যে নিয়তই রামের অনুধ্যান করিতেন ; রামই তাঁহার ধ্যান, রামই তাঁহার জ্ঞান, রামই তাঁহার চিন্তা ; রামচিন্তা ব্যতীত তিনি ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে সমর্থ নহেন । পতি তাঁহাকে লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তজ্জন্ত সীতা কিছুমাত্রও দুঃখিত নহেন ; সীতা যে জীবনে এত কষ্ট পাই-তেছেন, তাহা তিনি তাঁহার জন্মান্তরপাতকের ফলভোগ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন । পতিই তাঁহার দেবতা ; সীতা হৃদয়ের সেই আরাধ্য দেবতাকে আপনার মুক্তির একমাত্র কারণ মনে করিতেন, এবং হৃদয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতেন ।

সীতাদেবী রামকর্তৃক বিসর্জিত হইবার সময় অন্তর্কর্ষী ছিলেন তাহা পূর্ব্বকই উল্লিখিত হইয়াছে । ক্রমে দশমাস পরিপূর্ণ হইল । যথাসময়ে তিনি দেবকুমারকল্প যমলপুত্র প্রসব করিলেন । মহর্ষি

বান্দীকি এই আনন্দসমাচার অবগত হইয়া যারপরনাই হৃষ্ট হইলেন । সেইদিন কুনার শত্রু লবণনামা এক দুর্দান্ত রাক্ষসের বধোদ্দেশে মসৈন্ত্রে গমন করিতে করিতে বান্দীকির আশ্রমে নিশাযাপন করিতে ছিলেন । তিনি রামচন্দ্রের কুমারদ্বয়ের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চৰ্বেল্লাসে নিমগ্ন হইলেন । যে বালক অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বান্দীকির আদেশে বৃদ্ধারা তাহার দেহ কুশের অগ্রভাগদ্বারা মার্জিত করিলেন ; এই নিমিত্ত তাহার নাম কুশ হইল । কনিষ্ঠের দেহ কুশের লব অর্থাৎ অধোভাগদ্বারা মার্জিত হইল, এই নিমিত্ত বান্দীকি তাহার নাম লব রাখিলেন । সীতাদেবী পরম সুন্দর পুত্রদ্বয় লাভ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । লবকুশ ঋষিগণের যত্নে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া সীতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন । মহর্ষি বান্দীকি তাঁহাদের সর্ববিধ সংস্কার সুসম্পন্ন করিলেন । কুমারেরা বয়োবৃদ্ধিসহকারে বালক-রামের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন । তাঁহারা আকার প্রকার ও অঙ্গসৌষ্ঠবে সর্ব্বাংশে রামেরই অনুরূপ হইলেন । তাঁহারা তাপসকুমারের স্থায় বেশভূষা করিতেন বটে, কিন্তু বান্দীকি তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন ।

রামচন্দ্র সীতাসমুদ্বার করিয়া অযোধ্যার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, একদা মহর্ষি বান্দীকি দেবর্ষি নারদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অবগত হইয়াছিলেন যে, মহাত্মা রামই জগতে প্রধান পুরুষ ও সর্ব্ব-শুণোপেত রাজা । দেবর্ষির উপদেশানুসারে বান্দীকি পবিত্র রামচরিত হ্রদ্যবদ্ধ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন ; এক্ষণে সেই মহাকাব্য সম্পূর্ণ হওয়াতে, তিনি নিজ প্রিয়শিষ্য কুমার লবকুশকে তাহা অভ্যস্ত করাইলেন । একদিন লবকুশ বান্দীকির আশ্রমে সমবেত ঋষিগণের সমক্ষে রাগরাগিণীসহকারে বীণার স্থায় মধুর রবে রামায়ণ গান করিলেন ।

ঋষিগণ সেই গান শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমোহিত হইলেন । গান শ্রবণ করিতে করিতে কেহ কেহ সহসা উত্থিত হইয়া লবকুশকে এক কলশ প্রদান করিলেন; কেহ এক বঙ্কল দিলেন; কোন ঋষি কৃষ্ণাজিন, কেহ কমণ্ডলু, কেহ যজ্ঞস্থত্র, কেহ আসন, কেহ কোপীন, কেহ কুঠার এবং কেহ বা কাষ্ঠবন্ধনরজ্জু প্রদান করিলেন ! কোন ঋষি কেবলমাত্র “স্বস্তি” ও “দীর্ঘায়ুস্বস্ত” বলিয়া হস্তোত্তোলন পূর্বক প্রীতমনে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন ! সমবেত ঋষিমণ্ডলী মহর্ষি বাম্মাকিপ্রণীত সমগ্র রামায়ণ খানি সেই বালকদ্বয়ের অমৃত-কণ্ঠে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া এইরূপে আপনাপন হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকটিত করিয়াছিলেন । বাম্মাকির রামায়ণের প্রকৃত মূল্য জগতে পাওয়া যায় না । সসাগরা বহুগর্ভা ধরিত্রীও এই মহাকাব্যের বিনিময়যোগ্য মূল্য নহে ; কেবলমাত্র এই সরলহৃদয় ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিবর্গের উল্লিখিত আনন্দোচ্ছ্বাসই তাহার প্রকৃত মূল্য বলিয়া বোধ হয় !

এইরূপে মহর্ষি বাম্মাকির যত্নে লবকুশ পল্লবিত তরুণ বৃক্ষের ত্রায় দিন দিন পরিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন । ক্রমে তাঁহারা দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইলেন । একদিন মহর্ষি বাম্মাকি গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে মহারাজ রামচন্দ্রের অহুষ্ঠিত স্মৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শনার্থ সশিষ্যে উপনীত হইতে নিমন্ত্রিত হইলেন । মহর্ষি শিষ্যবর্গের সহিত যথাসময়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন । তাপসবেশধারী কুমার কুশীলবও তাঁহার সমভিযাচারে আগমন করিয়াছিলেন । বাম্মাকি কুমারদ্বয়কে সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন “বৎস, তোমরা গিয়া পবিত্র ঋষিক্ষেত্রে, বিপ্রাণয়ে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাজগণের গৃহে, রাজদ্বারে, যজ্ঞস্থানে এবং বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণের সন্নিকটে পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর । যদি মহারাজ রামচন্দ্র গীত

শ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তোমরা তথায় গিয়া গান করিও । আমি পূর্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি, তদনুসারে তোমরা প্রতিদিন শ্লোকবহুল বিংশতি সর্গনাত্র গান করিও । ধনতৃষ্ণায় অন্ননাত্রও লুপ্ত হইও না ; যাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার, ধনে তাহাদের কি হইবে ? যদি রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র, তখন বলিও আমরা বাম্বীকির শিষ্য । এই তোমাদের স্মমধুর বীণা ; তোমরা বীণাযোগে তানলয়সহকারে অক্লেশে গান করিও । দেখ, রাজা ধর্ম্মানুসারে সকলেরই পিতা । তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিবে ।”

বাম্বীকি কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া কুশীলব মুনিবালকের আশ্রয় বেশভূষা করিয়া স্মমধুর কণ্ঠে বীণাসহযোগে গান আরম্ভ করিলেন । আবালবৃদ্ধবনিতা পবিত্র রামকথা শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইল । তাহারা সেই বালকদ্বয়ের অপূর্ব বেশ ও রামের আশ্রয় অলৌকিক রূপ দেখিয়া এবং তাঁহাদের মধুময় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল । যেখানে তাঁহারা গান আরম্ভ করিতে লাগিলেন, সেই থানেই সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইল । ঋষিবর্গ ও অভ্যাগত রাজগণ তাঁহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । এদিকে এই অপূর্ব মুনিবালকদ্বয়ের কথা মহারাজ রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল । তিনি ঐবিলম্বে তাঁহাদিগকে সভামধ্যে আহ্বান করাইয়া তাঁহাদের ও কাব্যপ্রণেতা মহর্ষির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । কুশীলব বাম্বীকির উপদেশবাক্য শ্রবণ পূর্বক সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন । অনন্তর মহারাজের আদেশানুসারে তাঁহারা রামায়ণের আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিলেন । সভাস্থ সকলে নীরব ও উৎকর্ণ হইয়া অমৃতময়ী রামকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন ।

রামচন্দ্র সেই বালকদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয় মধ্যে এক অভূত-
পূৰ্ণ আশ্চর্য্য ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্নকুমার
দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল দর্শন করিয়া রাম অতিশয় ব্যাকুল হইয়া
পড়িলেন। পূজ্যস্বভাবা প্রিয়তমা জনকতনয়া সহসা তাঁহার স্মৃতি-
পথে সমুদিত হইলেন ! তিনি এই বালকদ্বয়কে জানকীরই গর্ভজাত
পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং দেহে অনাথার দুঃখপূর্ণ জীবনের
ইতিহাস শ্রবণ পূৰ্ণক অজস্র অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। রাম-
চন্দ্র হৃদয়ের আবেগ নিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সেই দিন সভাভঙ্গ
করিলেন। সভাস্থ সকলেই বালকদ্বয়কে রূপ, আকার, ইঙ্গিত ও
চেষ্টায় রামেরই তুল্য অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ।

এইরূপে কুশীলব প্রতিদিন রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন।
মহারাজ রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে অষ্টাদশ সহস্র নিষ্ক প্রদান করিতে
আদেশ করিলেন, কিন্তু বালকদ্বয় তাহা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা
বলিলেন “মহারাজ, আমরা বনবাসী, বস্ত্র ফলমূলে দিনপাত করিয়া
থাকি ; অর্থে আমাদের প্রয়োজন কি ?” রাম ইহাতে আরও বিস্মিত
হইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বান্দীকির শিষ্য বলি-
য়াই আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু রাম গীতপ্রসঙ্গে তাঁহা-
দিগকে সীতারই গর্ভজাত বলিয়া জানিতে পারিলেন। কৌশল্যা প্রভৃতি
বৃদ্ধা মহিষীগণের এবং লক্ষণেরও সেইরূপ অনুমান হইল। তখন রামচন্দ্র
কতিপয় দূতকে সভামধ্যে আহ্বান পূৰ্ণক করিলেন “তোমরা ভগবান
বান্দীকির নিকট গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী
সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাকে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে, তাহা
হইলে তিনি মহর্ষির আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন
করুন। আমার যে কলঙ্ক সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে, জানকী তাহা
ক্ষালনের জন্য কল্য প্রভাতে আসিয়া সভামধ্যে শপথ করুন। তোমরা

এই বিষয়ে মহর্ষির অভিপ্রায় এবং আত্মশুদ্ধিকর জ্ঞানকীর ইচ্ছা সম্যক বুঝিয়া শীঘ্র আমাকে সংবাদ দাও ।”

দূতেরা বাম্পীকির নিকট রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, মহর্ষি বলিলেন “দূতগণ, রামের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হউক । জ্ঞীলোকের পতিই দেবতা, সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন, জ্ঞানকী তাহাই করুন ।” দূতগণের মুখে মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম হৃষ্টমনে ঋষিবর্গ ও রাজগণকে পরদিন রাজসভায় সমাগত হইতে নিমন্ত্রণ করিলেন ।

রাত্রি প্রভাত হইলে, মহারাজ রামচন্দ্র যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন । বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন । অভ্যাগত রাজগণ নির্দিষ্ট স্থলে আসন গ্রহণ করিলেন । ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন । সূত্রীবাди বানরগণ, বিভীষণাদি রাক্ষসগণ ও জনসাধারণ সকলেই সোৎসুকচিত্তে আগ্রহপূর্ণহৃদয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন । আজ নির্বাসিতা রাজমহিষী সীতাদেবী সর্বজন-সমক্ষে শপথ করিয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিবেন ! মহারাজ রামচন্দ্র লোকাপবাদভয়ে যে রমণীশিরোমণি পতিব্রতা জনকনন্দিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ সকলের সম্মুখে তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিয়া তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিবেন । কেহ সীতাদেবীর অলৌকিক পত্ন্যমুরাপের প্রশংসা করিতেছে, কেহ রামচন্দ্রের প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয়স্বরূপিণী জ্ঞানকীর কনকময়ী প্রতিমূর্তির উল্লেখ করিতেছে, কেহবা মহারাজ রামচন্দ্রের অলোকসাধারণ প্রজারঞ্জনবৃত্তির গৌরব কীর্তন করিতেছে, এমন সময়ে প্রশান্তমূর্তি তেজঃপ্রদীপ্ত মহর্ষি বাম্পীকি দেবী জ্ঞানকীর সহিত ধীরে ধীরে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন । সভা নীরব ও নিস্তব্ধ ; কোথাও শব্দমাত্র শ্রুতি-

গোচর হইতেছে না ! বান্ধীকি অগ্রে অগ্রে যাউতেছেন ; জানকীঃ
 রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান পূর্বক কৃতাজলি হইয়া সজলনয়নে অবনত-
 মুখে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন ; তাঁহার পরিধান-
 কাষায় বসন, বেশ তাপসীর ছায়া । বদনমণ্ডল অলৌকিক পবিত্রতা-
 ব্যঞ্জক, যেন এক দিব্য জ্যোতি সর্বদা হইতে নিঃসৃত হইতেছে !
 এই কাষায়বসনা ধ্যানপরায়ণা, আশ্রমবাসিনী, কঠোরব্রতধারিণী
 স্বপদনিহিতলোচনা জ্যোতির্ময়ী জানকীদেবীকে দেখিবামাত্র সভাস্থ
 সকলে শোকে চুপে অতিমাত্র আকুল হইয়া তুমুল কোলাহল করিয়া
 উঠিল । তৎকালে কেহ রামকে, কেহ সীতাকে এবং কেহ বা উভ-
 যকেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল । মহর্ষি বান্ধীকি জানকীকে
 লইয়া জনসমূহের মধ্যে প্রবেশপূর্বক রামকে কহিলেন “রাজন্,
 এই তোমার পতিব্রতা ধর্মচারিণী সীতা । তুমি লোকাপবাদভয়ে
 আমার আশ্রমের নিকট ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে । এক্ষণে
 ইহাঁকে অনুমতি কর, ইনি তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন
 করিবেন । এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত ; আমি সত্যই
 কহিতেছি, ইহারা তোমার ঔরস পুত্র । আমি যে কখন মিথ্যা কহি-
 রাছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না । এক্ষণে আমার বাক্য বিশ্বাস কর,
 ইহারা তোমারই ঔরসপুত্র । আমি বহুকাল তপস্তা করিয়াছি, এক্ষণে
 যদি জানকীর চরিত্রগত অনুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তবে
 আমায় যেন সেই সঞ্চিত তপস্তার ফলভোগ করিতে না হয় । আমি
 জানকীকে শ্রোত্রাদিপঞ্চেন্দ্রিয় ও মনে শুদ্ধচারিণী বুঝিয়া বন হইতে
 লইয়া আসি । এক্ষণে এই পতিপরায়ণা তোমার মনে আত্মশুদ্ধির
 প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন । আমি দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী
 শুদ্ধস্বভাবা ; তুমি ইহাঁকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে
 পরিত্যাগ করিয়াছ ।” (৭১৬)

রাম বাগ্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন-
 “ভগবন্, আপনার বিশ্বাস্ত্র বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা
 বলিয়া বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতেছেন তাহাই হউক ।
 পূর্বে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল । ইনি
 তথায় শপথ করিয়াছিলেন, সেই জন্ত আমি ইহাঁকে গৃহে লইয়া-
 ছিলাম ; কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জান-
 কীকে পরিত্যাগ করিয়াছি । আমি ইহাঁকে নিষ্পাপ জানিলেও
 কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি । অতএব আপনি
 আমায় রক্ষা করুন । এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র, ইহা আমি
 জানি । এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর আমার পূর্ববৎ প্রীতি
 সঞ্চারিত হউক ।” (৭।৯৭)

এই সময়ে সহসা দিব্যগন্ধ মনোহর বায়ু বহমান হইল । বায়ুর
 স্পর্শস্থখে সভাস্থ সকলেই পুলকিত হইয়া উঠিল । সকলে নীরব ও
 নিষ্পন্দ ; এই অবসরে কাষায়বসনা সীতাদেবী কৃতাজ্জলিপুটে অধো-
 মুখে কহিলেন “আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনোমধ্যে
 স্থান না দিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন,
 আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি । যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে
 অর্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ
 হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি । আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেই
 জানি না, যদি এই কথা সত্য হয়, তবে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন,
 আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি ।” (৭।৯৭)

সীতার বাক্য অবসান হইতে না হইতেই সহসা পৃথিবী বিদীর্ণ
 হইল ! অকস্মাৎ তন্মধ্য হইতে অলৌকিক জ্যোতিরিশি সমুদ্ভূত
 হইল ! নাগসকল এক দিব্য সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিয়া
 আছে, তত্স্থপরি জ্যোতির্ময়ী ভগবতী বসুন্ধরাদেবী সমারুঢ়া ! দেবী

বসুন্ধরা বাহুপ্রসারণ পূর্বক সীতাকে গ্রহণ করিয়া সেই দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করাইবা মাত্র, অমনি তাহা ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল ! অকস্মাৎ স্বর্গে হ্রস্তুভিধ্বনি হইল ; দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং অন্তরীক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । সমাগত ঋষিবর্গ ও রাজগণ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিলেন ; স্বর্গ মর্ত্য এক তুমুল বিস্ময়কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং স্থাবরজঙ্গম যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল ! রাম পতিপ্রাণা জানকীর এই বিস্ময়জনক অন্তর্দ্বান দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ; তিনি শোকে ও অল্পতাপে অতিশয় জর্জরিত হইলেন । কুশীলব রোদনশব্দে সেই সভাস্থল পরিপূর্ণ করিলেন । তাঁহাদের কাতরকণ্ঠে বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া কেহই অশ্রুজল সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন না ।

এইরূপে আমাদের জগৎপূজ্যা সীতাদেবী সুখদুঃখময় বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে জীবন যাপন ও ইহসংসারে অলৌকিক পাতিব্রত্যরূপ অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া অনন্ত ধামে গমন করিলেন । তাঁহার জীবননাটকের শেষাঙ্কের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পবিত্র ইতিহাসও সম্পূর্ণ হইয়া আসিল । সীতার স্বর্গারোহণের পর রাম, ভ্রাতৃগণের সহিত, সংসারে আর অধিক দিন অবস্থিতি করেন নাই ; রামায়ণ সম্বন্ধে এই অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়টা পাঠকপাঠিকাবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়া আমরা তাঁহাদেরই অল্পমতিক্রমে এই স্থানেই পটক্ষেপণ করিতেছি ।

উপসংহার ।

সীতার দুঃখময় জীবন শেষ হইল ; অতঃপর তাঁহার অলৌকিক চরিত্র ও গুণাবলীর বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক ।

সীতা জগতে এক অপূৰ্ণ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ! ব্রাহ্মমুহূৰ্ত্তে নিমন্তক উষাকালে অলৌকিকরাগরঞ্জিত গগনপটে শুভ্রজ্যোতি প্রভাত-তারকা যেরূপ সুন্দর, পবিত্র ও প্রীতিপ্রদ, বাল্মীকির নহীয়সী প্রীতিভাপ্রদীপ্ত সীতাচরিত্র তদপেক্ষাও সুন্দর, পবিত্র ও প্রীতিপ্রদ ! এ চরিত্রের তুলনা কোথাও পাওয়া যায় না ; সৌন্দর্য্য ও স্নিগ্ধতায়, মাধুর্য্য ও পবিত্রতায়, গৌরব ও মহিমায় ইহা বুঝি জগতে এক ও অদ্বিতীয় ! সীতাচরিত্রের গভীরতামধ্যে নির্মাজ্জিত হইয়া আমরা দিশাহারা ও আত্মহারা হইয়া বাই, এবং তাহার অপরিমেয়তা উপলব্ধি করিয়া বিশ্বয়ে অশ্রু হইয়া থাকি ! বালিকার সরলতা ও পবিত্রতা, যুবতীর প্রেম ও কর্তব্যজ্ঞান, শ্রোতার শৈথল্য ও গান্ধীর্ঘ্য, গৃহলক্ষ্মীর ধর্ম্মপ্রাণতা ও সৌকুমার্য্য, তাপসীর সংযম ও কঠোরতা, ঋষিকন্যার মাধুর্য্য ও স্নিগ্ধতা এবং বীরাস্ত্রনার তেজ ও নির্ভীকতা সীতাচরিত্রে একাধারে সমভাবে দেদীপ্যমান । এরূপ বিভিন্ন গুণের অপূৰ্ণ সমাবেশ আর কোন নারীচরিত্রে কখন কোথাও হইয়াছে কি না জানি না ; কিন্তু এদেশে সীতার পূর্বে ও পরে যে যে অসামান্য নারী প্রাচুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বুঝি চরিত্রগান্ধীর্ঘ্যে ও গুণবৈচিত্র্যে সীতার সমকক্ষ হইতে সমর্থ হন নাই । সীতা নিজ অলৌকিক চরিত্রগৌরবে গৌরবান্বিত এবং বিনয় পুণ্যতেজে প্রদীপ্ত । প্রকৃতপক্ষে, তিনিই রমণীসাম্রাজ্ঞী ; তাই তাঁহার তুলনা নাই, অথবা তিনিই কেবল তাহার একমাত্র তুলনা !

সীতার অন্তর্নিহিত স্বভাবসিদ্ধ বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতাই তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্যের একমাত্র মূল কারণ । সীতার মন ও বুদ্ধি জন্মাবধিই নির্মল, নিকলঙ্ক ও সরল । জ্যোৎস্নামাত্র ক্ষুণ্ণমুখ শুভ্র পুষ্প যেরূপ পবিত্র ও মনোহর, সীতার সুকোমল মন স্বভাবতই তদপেক্ষাও পবিত্র ও মনোহর । সীতার মন পবিত্র, তাই সীতার বুদ্ধিও সরল ; তাই সীতার নয়নযুগল হইতে স্নিগ্ধ দীপ্ত ক্ষরিত হয়, তাই তাঁহার মুগমণ্ডলে দিব্য জ্যোতি ক্রীড়া করে ; তাই তাঁহার আত্মপর, উচ্চনীচ ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, এবং জগতে যাহা কিছু সুন্দর ও পবিত্র, তাহারই প্রীতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ । এই নিমিত্তই বালিকা সীতা পিতৃগৃহে অভ্যাগত ঋষিগণের মুখে পবিত্র আশ্রমের বিবরণ শুনিয়া বিমুগ্ধ হন, তাপসকর্ত্তাগণের সাহিত বাস ও বনে বনে বিচরণ করিয়া পুষ্পচয়ন করিতে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শাস্ত্র-স্বভাব হরিণশিশুদের সাহিত ক্রীড়া করিতে অতিশয় সমুৎসুক হন । এই নিমিত্তই, সীতা বৃক্ষলতা ভালবাসেন, পুষ্পদর্শনে প্রীত হন, পশুপক্ষি-গণকে দয়া করেন, সখীগণকে প্রীতি করেন ও দাসদাসীগণকে স্নেহ করেন । এইজন্তই সীতা মধুরভাষিনী, আনন্দদায়িনী ও চমৎকারিণী । এই কারণেই তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, এবং তাহাতে দেবরাজ্যের অস্পষ্ট ছায়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । তাঁহার হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল বলিয়াই তাহাতে কখনও অপবিত্রতার ছায়পাত হয় না, এবং পুণ্যালোক সহজেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে । এই নিমিত্তই সীতা সংকথা ও সংপ্রসঙ্গ ভালবাসেন এবং শুভ্রকেশ ঋষিবর্গ ও পূজ্যপাদ জনকের নিকট নানাবিধ হিতোপদেশ শ্রবণ করিতে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন । এই জন্তই সীতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রীতি অতিশয় অনুরাগিণী, এবং পিতৃগৃহেও অরণ্যচারিণী বনদেবীর গ্রাম শোভাময়ী । বালিকা-সীতার এই

অনন্তসাধারণ গুণাবলী সন্দর্শন করিয়াই দূরদর্শী মহর্ষিগণ সীতাসম্বন্ধে কত অভিমত প্রকাশ করিতেন, এবং রাজর্ষি জনক কোথাও তাঁহার উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া হরের ধনুর্ভঙ্গরূপ কঠোর পণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ।

সীতা মহদগুণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তিনি রাজর্ষি জনকের রাজ্যোদ্যানে লালিত পালিত হইয়াছিলেন । সীতা ধর্ম্মের বাতাসে ও সুনীতির শিশিরসিঞ্ঝনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্নিগ্ধদর্শিনী লতিকার ত্রায় পত্রপল্লবে সুশোভিত হইয়াছিলেন । রাজর্ষির উচ্চচরিত্র, ধর্ম্মাহুঁরাগ, নিস্পৃহতা ও কর্তব্য-নিষ্ঠা বালিকা-সীতার নির্মল হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া বদ্ধমূল হইয়াছিল । সীতা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাবা হইলেও জনকের অলৌকিক ধর্ম্মজীবন তাঁহার চরিত্রসংগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল । চন্দ্রকিরণে শত শত পুষ্পমুকুল যেরূপ বিকশিত হইয়া উঠে, ধর্ম্মের উজ্জল আলোকে সীতার নির্মল মনোবৃত্তিনিচয়ও বয়োবৃদ্ধিসহকারে সেইরূপ পরিস্ফুট হইয়া স্বর্গের শোভায় পরিণত হইয়াছিল ।

লাবণ্যময়ী জ্ঞানকী এখন উদ্ভিন্নযৌবনা । বালিকাসুলভ সরলতা ও যৌবনসুলভ গাভীর্য্য একত্র সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে সুরবালার ত্রায় সৌন্দর্য্যশালিনী করিল । সীতা যেন আলোকময়ী ; সীতা যেন এক অলৌকিক জ্যোতি ! উপযুক্ত পাত্রের সমর্পিত না হইলে এ আলোক মলিন হইবে, এ জ্যোতি বিলীন হইয়া যাইবে ; তাই জনকের চিন্তার পরিসীমা নাই ! সৌভাগ্যক্রমে সীতার অনুরূপ পাত্র মিলিল । পবিত্রস্বভাব রামের সহিত সীতার বিবাহ হইল । রাম সত্যপরায়ণ, শাস্ত্রপ্রকৃতি ও তেজস্বী । ষোড়শবর্ষীয় বালক হইলেও, সিংহের ত্রায় তাঁহার পরাক্রম, অচলের ত্রায় তাঁহার গাভীর্য্য, দাবানলশিখার ত্রায় তাঁহার উৎসাহ, পৃথিবীর ত্রায় তাঁহার ক্ষমা এবং মহর্ষির ত্রায় তাঁহার

সত্যনিষ্ঠা ও ধৰ্ম্মানুরাগ । চরিত্রের তেজ ও দৃঢ়তা যেন মুখমণ্ডলে সঞ্চিত রহিয়াছে ! রাজকুমার রামচন্দ্র এই অল্প বয়সেই সর্বজনপ্রিয় হইয়াছেন । ঋষিবর্গ তাঁহার পবিত্র চরিত্রগুণে একান্ত বিমুগ্ধ । তিনি স্বভাবসিদ্ধ পুণ্যতেজে প্রদীপ্ত । এই জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষের সহিত জ্যোতিষ্মারী সীতাদেবীর বিবাহ হইল । জ্যোতি জ্যোতিকে আলিঙ্গন করিল ; আলোক আলোকের সহিত মিলিত হইল ! আলোকে আলোকে সন্মিলন ! কি সুন্দর, কি পবিত্র ! এরূপ বৃষ্টি আর কখনও হয় না ! এই দিবা সন্মিলন সহজেই সুসম্পন্ন হইল, কোন পক্ষ হইতেই অল্পমাত্রও চেষ্টার প্রয়োজন হইল না । উভয়েই ধৰ্ম্মানুরাগী, উভয়েই বিশ্বদ্রব্ধাব ; উভয়েরই হৃদয় কোটিচন্দ্রসমুদ্ভাসিত ; উভয়েরই সত্য প্রীতি ও সাধুতায় বিশ্বাস ; উভয়েরই এক চিন্তা, এক আকাঙ্ক্ষা, এক চেষ্টা ; উভয়েরই এক মন, এক প্রাণ, এক হৃদয় ; উভয়েই কি এক অজ্ঞাত, অলঙ্কিত মহাজ্যোতির অভিমুখে অগ্রসর হইতে ব্যাকুল ; উভয়েই যেন এই পাপতাপময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোন এক দেবরাজ্যে বিচরণ করেন ; উভয়েই যেন দিব্যালোক-লাগা, কি এক মহতুদ্দেশ্যসাধনের জন্তই এই ধরাধানে অবতীর্ণ হইয়াছেন ! উভয়েই যেন আনন্দরাজ্যের প্রজা, জগতে আনন্দজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ! উভয়েই উভয়কে বুঝিলেন, মিলনও সম্পূর্ণ হইল । ইহারই নাম আধ্যাত্মিক মিলন ; এই মিলনই প্রকৃত বিবাহ ।

রাজর্ষি জনকের গৃহে লালিত পালিত হওয়া সাতার বেক্রপ সৌভাগ্য, রানের ভায় দুর্লভ স্বামিরত্ন লাভ করা সীতার তদপেক্ষাও অধিকতর সৌভাগ্য । পিতার স্নেহবারিসেকে যে লতা অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, স্বামীর প্রেমবারিসিঞ্জে তাহা পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া লাবণ্যময়ী হইল । ব্রহ্মনিষ্ঠ জনকের গৃহে সীতা-

চরিত্রে সে অক্ষুট জ্যোতি প্রকাশিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, দেবকল্প ভৰ্তার কৃপাশুণে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইয়া সীতাকে অলৌকিক মহিমায় উদ্ভাসিত ও স্বর্গীয় গৌরবে প্রদীপ্ত করিল। পিতৃগৃহে সীতার অন্তর্নিহিত যে আলোক বৃক্ষ লতা, পুষ্প ফল, বন উপবন, পশু পক্ষী, পিতা মাতা, দাস দাসী ও নরনারী মাত্রেয়ই উপর পতিত হইয়া সকলকে অপার্থিব শোভায় সুশোভিত করিত, এক্ষণে সেই আলোক সহস্রা ধনীভূত ও শতশুণে উজ্জ্বলীকৃত হইয়া রামের অন্তর্বাহু ওতপ্রোতরূপে আচ্ছন্ন করিল, এবং তাঁহার অভ্যন্তর দিয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডের উপর সুস্নিগ্ধ কিরণধারারূপে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। সূর্য্যপ্রভা যেন চন্দ্রমণ্ডলে নিপতিত হইয়া সুশীতল জ্যোৎস্নাজালরূপে ধরাতল আলোকিত করিল। রামকে ভালবাসিয়া সীতা যেন দেবতা হইয়া গেলেন ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন দেবরাজ্যে পরিণত হইল ! স্বর্গের দ্বার যেন উদঘাটিত হইল ! সৌন্দর্য্যধারা যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল ! আকাশ যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইল ! সীতার হৃদয়ে যেন শত বীণার ঝঙ্কার হইতে লাগিল ! সীতার দিব্য চক্ষু যেন উন্মীলিত হইল ! সীতা সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন ; প্রকৃতি যেন নববেশ ধারণ করিল ; অনন্ত পবিত্রতাসাগরে সীতা যেন নিমজ্জিত হইলেন ; অনন্ত সৌন্দর্য্যের সহিত সীতা যেন মিলিত হইলেন ; অলৌকিক জ্যোতিরিশির মধ্যে সীতা যেন সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন ! সীতার আত্মা যেন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল ; এতদিনে সীতা যেন প্রকৃতই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিলেন ! সীতার জীবন যেন বাস্তবিক ধন হইয়া গেল ! তখন সীতা বুঝিলেন যে “পিতা মাতা ও পুত্র, ইহারা কেবল পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন ; কিন্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহই নাই।” (৫৮ পৃঃ) তাই পতিই সীতার দেবতা হইলেন ;

তাই পতিই সীতার ধর্ম, পতিই সীতার স্বর্গ এবং পতিই সীতার একমাত্র মুক্তি ।

এহেন পতি আজ বনবাসে যাইতেছেন। পতি গৃহেই থাকুন আর বনেই গমন করুন, তিনিই সীতার একমাত্র গতি ; “পতির সহবাসই স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক ;” পতি ভিন্ন পতিপ্রাণার সুখ ও সুখসাধন আর কি আছে ? সুতরাং রামের যখন বনবাস আদেশ হইয়াছে, ফলে সীতারও তাহাই ঘটয়াছে ; ইহাই সীতার সরল স্বাভাবিক যুক্তি ! রাম বনবাসের ভয় দেখাইলেন, কিন্তু বুঝিলেন না যে তাঁহার সহবাসে অরণ্য সীতার পক্ষে পিতৃগৃহ অপেক্ষাও সুখকর হইবে ; প্রকৃতির প্রিয়তমা হুহিতা তাহাকে কেমন মনোহর রাজ্যোদ্যানে পরিণত করিয়া লইবেন ! রামের সহিত তপস্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গ হউক, কোনটিতে সীতা সঙ্কুচিত নহেন। অরণ্যের কষ্ট সীতার নিকট কষ্টই নহে। “আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, পথ সুশস্যার জ্বায় বোধ হইবে, তাহাতে কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব না। কুশ, কাশ, শর ও ইষীকা প্রভৃতি যে সকল কষ্টকর বৃক্ষ আছে, আমি তাহা তুল ও মৃগচর্ম্মের জ্বায় সুখস্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড়ীন হইয়া আমার আচ্ছন্ন করিবে, তাহা অত্যন্তম চন্দনের জ্বায় জ্ঞান করিব।” (৫৪ পৃঃ) অরণ্যবাস সীতার অপ্রীতিকর হইবে না ; সীতা স্বামীর সহিত অশ্রম পর্য্যটন করিতে কতবার ইচ্ছা করিয়াছেন ; স্বামীর চরণযুগল গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিহুহিতা প্রকৃতির স্বহস্তরোপিত উদ্যানে বাস করিতে কত বার সাধ করিয়াছেন ! সীতা স্বামীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কত নদ, নদী, গিরি, গুহা, বন, উপবন দর্শন করিবেন ! সীতার অরণ্যবাসে বিতৃষ্ণা নাই ; তবে রাম যদি সীতাকে সঙ্গে লইতে একান্তই আপত্তি করেন, তাহা হইলে সীতা বিষপান করিয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন।

পতিই বাহার একমাত্র সুখ, তাঁহার নিকট রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ মাত্র । সে সমস্ত ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে বিন্দুস্বরূপ নহে । ইহাকে আত্মত্যাগ বলে না ; বাহ্য প্রকৃত সুখ ও আনন্দ, তাহার বিসর্জনই প্রকৃত আত্মত্যাগ । স্বামী অপেক্ষা ধনরত্ন বাহাদের চক্ষে শ্রেষ্ঠতর, তাঁহারা ইহাকে আত্মত্যাগ বলিলেও বালতে পারেন , কিন্তু সীতাদেবী যখন নিজ আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনাবলে বনবাসে স্বামীর সঙ্গিনী হইতে অমুমতি পাইলেন, তখন আর তাঁহার ত্যাগ কি ? সুখ ত্যাগ করা দূরে থাক্, বরং অরণ্যে স্বামীর অনুসরণ করিয়া তিনি প্রকৃত সুখেরই অধিকারিনী হইলেন । পতিই সীতার সুখ, তাই সীতা পতিব্রতের অগ্রগণ্য ; তাই জগতে তাঁহার তুলনা নাই !

সীতা রামের সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বভাবতই তিনি বনবাসে স্বামীর সুখদুঃখের সমভাগিনী হইতে ব্যাকুল হইলেন । বনে মনে পর্য্যটন করিয়া সীতা ক্লান্তি অনুভব করিলেন না ; বরং এক একবার ভর্তার প্রেমময় মুখমণ্ডলের দিকে এবং এক একবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন । এইরূপে বহুদিন অরণ্যপর্য্যটন করিয়া তাঁহারা মনোহর পঞ্চবটীবনে এক কুটির নির্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে সুখে বাস করিতে লাগিলেন । পঞ্চবটী যেন প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি ; নদ নদী, বন উপরন, গিরিনির্ব্বার ও যুগ পক্ষীতে এই স্থান যেন অপূর্ব্ব শোভময় । এই মনোহর পঞ্চবটীবনে স্বামিসহবাসে ও দেবরের পরিচর্য্যায় সীতা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন । রাম যেখানে বিদ্যমান, সীতার চক্ষে তাহাই স্বর্গ ; কিন্তু এই পঞ্চবটী সীতার নিকট যেন স্বর্গ অপেক্ষাও সুখকর বোধ হইতে লাগিল । আলোকময়ী জানকী জ্যোতিষ্মান রামের সহিত একগন, একপ্রাণ, একহৃদয় হইয়া জড়-

জগতে চক্ষুচক্ষুর অগোচর কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিগেন ! জড়-
 জগতেও যে মহাজ্যোতি ও তপ্তোত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন, রাম
 ও সীতার নিখিল জ্যোতির্ময় আত্মা তন্মধ্যে নিমজ্জিত হইল ; তাই
 সীতা স্বামীর সহিত নির্ভয়ে মহোল্লাসে পর্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন
 অরণ্যে নির্ভীকচিত্তে পর্যটন করিতেন, পুষ্পরাশি চয়ন করিতেন,
 হংসসারসনিনাদিত গোদাবরীতীরে ভ্রমণ করিতেন, কমলশোভিত
 স্বচ্ছ সরোবরে অবগাহন ও স্বহস্তে কমলরাশি উত্তোলন করিতেন,
 এবং গিরিনিব্বর, বন উপবন দর্শন করিয়া বিমল আনন্দলাভ করি-
 তেন । তাই সীতা পুষ্পের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইতেন, লতিকার সহিত
 সখীত্ব করিতেন, মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেন, হরিণীর সহিত
 ভ্রমণ করিতেন, পক্ষিগণকে আহ্বান করিতেন এবং আনন্দধ্বনিতে
 বনস্থল পরিপূর্ণ করিতেন । সীতা যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা ; সীতা
 যেন মূর্ত্তিমতী কাননশ্রী ! তাই সীতাকে দেখিয়া হরিণহরিণীসকল
 ভয় ত্যাগ করে, হরিণশিশু সীতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটয়া যায়, ময়ূর
 সকল ময়ূরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সীতার করতালিশব্দে কুটীরাক্রমে
 নৃত্য করে, কত মনোহর সুকণ্ঠ পক্ষী আসিয়া প্রাঙ্গণস্থ পুষ্পিত
 বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক অমৃতধারা বর্ষণ করে, এবং রাজহংসশ্রেণী
 গ্রীবা নত করিয়া অক্ষুটস্বরে বিরাব করিতে করিতে সীতার পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ গমন করে ! তাই সীতার দর্শনমাত্রে পুষ্পমুকুল বিকশিত
 হয়, লতিকা আনন্দে ছলিতে থাকে, বৃক্ষসকল মর্ম্মরশব্দে আনন্দো-
 চ্ছ্বাস প্রকাশ করে, শিশুবৃক্ষগুলি করতালি দিয়া নাচিয়া উঠে এবং
 কাননভূমি আলোকময়ী হয় ! সীতাই যেন সকলের জীবন, সীতাই
 যেন সকলের শোভা, সীতাই যেন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অলৌকিক
 দীপ্তি ! সীতা যেন পুষ্পের সৌন্দর্য্যে, পত্রের সৌকুমার্য্যে, পল্লবের
 স্নিগ্ধতায়, লতিকার কোমলতায়, হরিণীর শান্তভাবে, কোকিলের

কৃষ্ণনে, দাড়্যাহের চীৎকারে, ময়ূরের কেকারবে, হংসের কলকণ্ঠে, কাননের কমণীয়তায়, গিরির গান্ধীর্ঘ্যে, নির্ঝরের উল্লাসে ও নদীর কুলকুলুতানে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান ! তাই এই অপূর্ণ শ্রী
• অপহৃত হইলে কানন অন্ধকারময় হইল, এবং রাম উন্মত্তের ভ্রায় বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফল, বন, উপবন, গিরি, নির্ঝর, মুগ, পক্ষী, সকলকেই সীতার সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । সীতার অভাবে সকলেই নিরানন্দ ও বিষাদে আচ্ছন্ন হইল । রাম জগৎ অন্ধকারময় দেখিলেন ; রামের জীবনালোক বেন সহসা নির্বাপিত হইয়া গেল !

পাপরাক্ষস পুণ্যময়ী দেবতাকে অপহরণ করিল । রাবণ অগ্নিকে বস্ত্রে বন্ধনের চেষ্টা করিল ; অমানিশার প্রগাঢ় তিমিরজাল আলোকময়ী প্রভাকে নির্বাপিত করিতে প্রয়াস পাইল ; অধর্ম ধর্মকে সিংহাসনচ্যুত করিতে যত্ন করিল ! কিন্তু পুণ্য পাপকেই দূরীভূত করিল ; আলোকপ্রভা অন্ধকারে আরও উজ্জ্বলীকৃত হইল এবং ধর্ম অধর্মকে নিষ্পেষিত করিল । রাবণ ধন, রত্ন, রাজ্য ও ঐশ্বর্য সমস্তই সীতার চরণতলে সমর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিল, কিন্তু পতিই যাহার ধর্ম এবং ধর্মই যাহার একমাত্র সুখসাধন, তাহার নিকট ত্রিলোকেরও ঐশ্বর্য অতিশয় ঘৃণিত ও তুচ্ছ কথা । শৈশবে ও যৌবনে সীতাচরিত্রে যে স্নিগ্ধজ্যোতি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, রাক্ষসের উৎপীড়নে তাহা প্রাথর্য্যলাভ করিয়া বহ্নিশিখার ভ্রায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ! সীতা শত্রুগৃহেও নির্ভীক ও সিংহীর ভ্রায় তেজোগর্ভিতা হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন । সীতার সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মূর্তি দর্শন করিয়া পামর রাবণেরও হৃৎকম্প হইয়াছিল । রাবণের সাধ্য ছিল না যে, সে সীতার স্থাপিত একটি তৃণখণ্ড উল্লভ্যন করিয়া তাহার একটি কেশও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় ! সীতা সেই অশোককাননে রাক্ষসীপরিবৃত হইয়া তাপসীর ভ্রায় কেবল রামেরই অনুধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন ; দেহে দেহে বিচ্ছিন্ন হইলেও ভর্তার সহিত ঋণকালের নিমিত্ত ও তিনি আত্মাতে আত্মাতে বিচ্ছিন্ন হইলেন না । রাক্ষসের সহস্র চেষ্টা বিফল হইল । সীতাদেবীও ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইলেন ।

রাক্ষসগৃহেই সীতার প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল ; রাবণ নিহত হইলে, রাম লোকপবাদভয়ে তাহার যে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ইহার তুলনায় দামান্ত্র ব্যাপার মাত্র । পাপ ও প্রলোভনের সহিত

ভীষণ সংগ্রামই প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা, এবং সেই পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হওয়াই প্রকৃত চরিত্রবল। এই চরিত্রবলের মূল ধর্ম নিহিত। সীতা ধর্মভেজে সর্বদাই প্রদীপ্ত; তাই তিনি সূর্য্যপ্রভার ত্রায় রাবণের অস্পৃশ্য ছিলেন। সীতা কায়মনোবাক্যে নিশ্চল ও বিত্ত্ব ছিলেন; পাপ তাঁহাকে কোন মতেই স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই; তাই অগ্নিও তাঁহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। অগ্নির সাধ্য কি যে, সে তেজঃপ্রদীপ্তা ধর্ম্মরক্ষিতা সীতাকে দগ্ধ করে? বিশ্বপাতার সমগ্র বিশ্বরাজ্য সাধুতা ও পবিত্রতার সহায়; তাই মৃতিমান অগ্নি সীতাকে অঙ্কে লইয়া তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে রামের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন! রামের সমস্ত সংশয় অপনীত হইল; পুণ্যজ্যোতি আবার পুণ্যজ্যোতির সহিত মিলিত হইল। স্বামী সীতাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; সীতাও পরম-দেবতার চরণতলে স্থান পাইয়া সমস্ত দুঃখজালা বিস্মৃত হইলেন। নারীজীবন যেন সার্থক হইয়া গেল!

সীতা এখন রাজমহিষী। রাজমহিষী হইয়াও সীতা অবিকৃত ও অপরিবর্তিত। এই রাজপ্রাসাদেও সাধারণের অদৃশ্য স্বর্গরাজ্য সীতাকে বেষ্টন করিয়া আছে! এই স্থূল বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য স্বর্গরাজ্য; সীতাদেবী তন্মধ্যে সমাসীনা! সীতার অশরীরী আত্মা তন্মধ্যে বিলীন হইয়া আছে! কি সুন্দর, কি মনোহর, কি পবিত্র! রাজমহিষী সীতাদেবী ঈদৃশ দিব্যধামবাসিনী হইয়াও লৌকিক কর্তব্য-পালনে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ নহেন। রাম গুরু রাজ্যভার বহন করিতেছেন; সীতা প্রিয়তমের সেই গুরু ভার লঘু করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহাতে সুচারুরূপে প্রজাপালন হয়, সীতা তজ্জন্ত সর্বদাই সমুৎসুক। কিন্তু এই রাজসংসারের বাহাডম্বর ও কৃত্রিমতা মধ্যে সীতার আত্মা যেন ক্ষুণ্ণভাষ করিত না; তাই সীতা শাস্তিময় পবিত্র আশ্রমদর্শনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে লালায়িত হইতেন; তাই অন্তর্কল্পী হইলে, স্বামীর দোহদপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি অন্ততঃ এক রাত্রির নিমিত্তও আশ্রমে বাস করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

মন্দভাগিনীর ভাগ্যচক্র আবার পরিবর্তিত হইল! রাম লোকা-পবাদভয়ে সীতাকে অরণ্যে নিক্ষেপিত করিলেন। আনন্দের মুখ্য কারণ অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জানকী জগৎসংসার অন্ধকারময়

দেখিলেন। জানকী প্রেমময় জীবিতনাথের এই নির্দয় ব্যবহারে মর্মস্পীড়িত হইলেন, কিন্তু তজ্জন্ত তাঁহার উপর কোন দোষারোপ করিলেন না। সীতা বুঝিলেন স্বামীর কিছুমাত্র দোষ নাই; বত দোষ তাঁহার অদৃষ্টের, তাঁহার জন্মান্তরপাতকের! সীতার অপবাদে রাম দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইয়াছে; এই কলঙ্ক কালনের জন্ত সীতাকে যদি প্রাণপর্যন্ত বিসর্জন করিতে হয়, তাহাতেও তিনি পরাজুখ নহেন। তাই সীতা অশ্রুপূর্ণলোচনে লক্ষ্মণকে বলিলেন “জ্ঞীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু; অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, জ্ঞীলোকের তাহাই কর্তব্য।” (২০৩ পৃঃ) সীতা দেহসম্বন্ধে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও, আত্মাতে তাঁহার সহিত অবিরুক্ত রহিলেন। এক্ষণে সীতা স্বামিসহবাসমুখ লাভ করিলেন না বটে, কিন্তু বাহাতে পরজন্মে আর তাঁহার সহিত বিপ্রয়োগ না ঘটে, তজ্জন্ত তিনি ঘোরতর তপস্যা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অন্তর্নিহিত তেজপুঞ্জ আবার সূর্য্যপ্রভার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সীতার হৃদয়মধ্যে স্বামিসম্বন্ধে যে সামান্য বাসনা লুকাইয়া ছিল, সেই প্রদীপ্ত তেজে তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল। বিশ্বসংসার এখন সীতার চক্ষে জ্যোতির্ময়, তন্মধ্যে কেবল রাম ও সীতা; সীতা সেই প্রজাবৎসল অলোকসাধারণ দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন। সীতা আজ প্রকৃতই তপস্বিনী; পরমদেবতা পরমগুরু পতির চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া সীতা এই তপস্যায় দেহপাত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

দ্বাদশ বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। লবকুশের পরিচয় পাইয়া রাম বিশুদ্ধস্বভাবা সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন; কিন্তু সাধারণের প্রত্যয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে সভামধ্যে স্বীয় চরিত্র উদ্দেশে শপথ করিতে হইবে! বাস্তবিক সীতাকে রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সীতা পরমদেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিলেন না। অলৌকিকজ্যোতির্ময়ী দেবী জানকী বাস্তবিকর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র লঘুচেতা ক্ষুদ্রমনা প্রজাবর্গ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল; সেই মুক্তিমতী পবিত্রতার উপস্থিতি মাত্রে তাহাদের হৃদয় কম্পিত ও দেহ রোমাঞ্চিত হইল। রাম সীতাকে স্বীয় চরিত্র উদ্দেশে শপথ করিতে

বলিলেন। সীতার কোন দিকে দৃষ্টি নাই; সীতা নিজ পদযুগলেই দৃষ্টিনিহিত করিয়া আছেন। চরিত্র উদ্দেশে আবার শপথ! অবলার প্রাণে আর সহ্য হইল না। সীতা ক্লতাজলিপুটে অধোমুখে কহিলেন “আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনে স্থান না দিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, যদি এই কথা সত্য বলিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।” সতীর প্রার্থনা বিফল হইল না। দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হইলেন, সহসা অলৌকিক জ্যোতিরাশি বিনির্গত হইল, জ্যোতির্ময়ী সীতাদেবী জ্যোতির মধ্যে বিলীন হইয়া সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এই জ্যোতির্ময়ী দেবতাকে আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, সকলকে সেইরূপই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। এই দেবতা ধর্মের তিল তিল জ্যোতিকণায় বিনির্গত, সে ধর্মের অপর নাম পাতিব্রত। ইহার অলৌকিক পবিত্র চরিত্র আমাদের পথে নিয়ত আকর্ষণ করুক; ইহার নিঃশল আশ্রয় স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাজাল আমাদের সমুপস্থিত প্রাণকে স্নানিত করুক; আমাদের হৃদয়ক্ষেত্র স্বর্গরাজ্যে পরিণত হউক; ইনি আমাদের মুক্তিপথের সহায় হউন; ইহার পবিত্র সঙ্ঘাতে আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ হউক! ইনি আমাদের নারীজাতির কল্যাণ করুন।

সমাপ্ত ।

বাগবাজার ষিডি লাইব্রেরী

অঙ্ক সংখ্যা

পরিগ্রহণ সংখ্যা

পরিগ্রহণের তারিখ

